নব ভারত স্রষ্টা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

বিনয় ঘোষ

প্রকাশন বিভাগ
ভারত সরকার

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়

বিদ্যাসাগর ও সমকালীন অবস্থা

উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষে অনেক মহান ব্যক্তির জন্ম হয়েছিল। এই শতাব্দীতে নবজাগ্রত সামাজিক ও ঐতিহাসিক শক্তি বিভিন্ন ধাঁচের মানুষ সৃষ্টি করছিল এবং সে যুগের বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হওয়ার জন্য তাঁদের অন্তর্নিহিত শ্রেষ্ঠ কর্মশক্তিকে জাগ্রত করে তুলছিল। যুগের তুলনায় অনেক বেশী অগ্রগামী মনোভাব নিয়ে বিদ্যাসাগর এইসব সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন। এক শত বছর আগে যে সামাজিক আদর্শ নিয়ে বিদ্যাসাগর কাজ সুরু করেছিলেন তা মাত্র সাম্প্রতিক কালে বাস্তব রূপ নিতে আরম্ভ করেছে।

অধিকাংশ লোকই নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠতে ব্যক্তি হিসাবে কোনও সাহায্য করেন না, প্রচলিত ব্যবস্থার সঙ্গে তাঁরা নিজেদের মানিয়ে নেন মাত্র। কিন্তু সমাজকে পরিবর্তনশীল পারিপার্শ্বিকের মধ্য দিয়ে অগ্রসর হতে হয়। যখন সমাজ ব্যবস্থা বদলের প্রয়োজন হয় তখন মানুষকে একক ভাবেও তার সহায়তা করতে হয়। বিরাট ব্যক্তিত্ব নিয়ে বিদ্যাসাগর যুগ সমস্যা সমাধানে আবির্ভূত হয়েছিলেন। যুগ পরিবর্তনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি এবং সেই পরিবর্তন সাধনের জন্য অবিচলিত প্রচেষ্টার গুণে বিদ্যাসাগর মহান সমাজ সংস্কারক হয়ে উঠেছিলেন।

এই সুবিখ্যাত পণ্ডিত পশ্চিমবঙ্গের এক রাঢ়ীয় কুলীন ব্রাহ্মণ বংশে জন্ম গ্রহণ করেন। এঁরা ছিলেন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার ও বংশ গৌরব ছিল এঁদের গর্বের বিষয়। পিতৃ-পিতামহের এই ঐতিহ্যের গৌরব বিদ্যাসাগরের মধ্যে পরিস্ফুট হয়েছিল। এমন কি যে

দারিদ্র্যের মধ্যে তাঁর জন্ম হয়েছিল সে দারিদ্র্যও তাঁর এই গর্ব মুছে দিতে পারেনি। সামাজিক প্রগতির কাজ সহজসিদ্ধ করার জন্য বিদ্যাসাগর তাঁর দেশের ঐতিহ্যকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেননি। মুষ্টিমেয় যে কয়েকজন গত শতাব্দীতে পশ্চিমের নতুন চিন্তাধারার সঙ্গে ভারতীয় ঐতিহ্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদের সমন্বয় সাধনের জন্য নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করেছিলেন বিদ্যাসাগর ছিলেন তাঁদের অন্যতম।

বিদ্যাসাগর তাঁর অসমাপ্ত আত্মজীবনীতে নিজের শৈশবের কিছু স্মৃতি লিখে রেখে গেছেন। তিনি লিখেছেন, "·····প্রপিতামহদেব ভুবনেশ্বর বিদ্যালঙ্কারের পাঁচ সন্তান;······বিদ্যালঙ্কার মহাশয়ের দেহাত্যয়ের পর, জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম, সংসারে কর্তৃত্ব করিতে লাগিলেন। সামান্য বিষয় উপলক্ষে, তাঁহাদের সহিত কথান্তর উপস্থিত হইয়া, ক্রমে বিলক্ষণ মনান্তর ঘটিয়া উঠিল। জ্যেষ্ঠ ও মধ্যম সহোদরের অবমাননাব্যঞ্জক বাক্য প্রয়োগে, তদীয় অন্তঃকরণ নিরতিশয় ব্যথিত হইল। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া, তিনি কতিপয় দিবস অতিবাহিত করিলেন; অবশেষে, আর এস্থানে অবস্থিতি করা, কোনও ক্রমে, বিধেয় নহে, এই সিদ্ধান্ত করিয়া, কাহাকেও কিছু না বলিয়া, এককালে, দেশত্যাগী হইলেন।"

সে সময়ে বীরসিংহ গ্রামে (পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত) উমাপতি তর্কসিদ্ধান্ত নামে এক বিদ্বান বৈয়াকরণিক ব্রাহ্মণ বাস করতেন। এই পণ্ডিতের তৃতীয় কন্যা দুর্গা দেবীকে রামজয় বিবাহ করেন। তাঁদের দুই পুত্র ও চার কন্যা জন্মগ্রহণ করে। সন্তানদের মধ্যে সর্বজ্যেষ্ঠ ঠাকুরদাস বন্দোপাধ্যায় ছিলেন বিদ্যাসাগরের পিতা।

বিদ্যাসাগরের পিতামহ তাঁর পৈতৃক গ্রাম ছেড়ে যাওয়ার অল্প কাল পরেই তাঁর পিতামহী বীরসিংহ গ্রামের নিকটে অবস্থিত তাঁর পিত্রালয়ে চলে আসেন। কিন্তু সেখানে অবস্থা অনুকূল ছিল না। তাঁর পিতা পণ্ডিত উমাপতি দেখতেন, তাঁর কন্যা ও দৌহিত্র দৌহিত্রীদের সঙ্গে তাঁর পুত্র ও পুত্রবধূ ভাল ব্যবহার করতেন না। তিনি এতে অত্যন্ত দুঃখ পেতেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে তিনি ছিলেন অসহায়। উমাপতি তাঁর বাড়ীর নিকটে কন্যার জন্য একটি কুটির নির্মাণ করে দিলেন। এই কুটিরে দুর্গা দেবী তাঁর ছয়টি সন্তান নিয়ে বাস করতে লাগলেন। দুই অগ্রজ তাঁর প্রতি যে অন্যায় ব্যবহার করেছিলেন সেই ক্ষোভে রামজয় তখন স্থান থেকে স্থানান্তরে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। একাকী ছয়টি সন্তানকে পালন করবার জন্য দুর্গা দেবীকে তখন কঠোর পরিশ্রম করতে হত।

তখনকার দিনে বাংলাদেশে অনেক অসহায় এবং দরিদ্র স্ত্রীলোককে সুতো কেটে এবং সেই সুতো তাঁতীদের কাছে বিক্রী করে জীবিকা নির্বাহ করতে হত। চরখার সামনে সন্তান পরিবেষ্টিত হয়ে বসে বিদ্যাসাগরের পিতামহী দুর্গা দেবী দিনরাত সুতো কাটতেন সামান্য কিছু আয় করার জন্য। এ ছাড়া তিনি পিতার কাছ থেকে যৎকিঞ্চিৎ সাহায্য পেতেন। পিতা ঠাকুরদাস কিভাবে এই বিষণ্ণ পরিবেশে মানুষ হয়ে উঠেছিলেন সে কথা বিদ্যাসাগর তাঁর স্মৃতি কথায় অত্যন্ত আবেগ ভরে লিখেছেন। ঠাকুরদাসের বয়স যখন ১৪/১৫ বৎসর হল তখন তিনি বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়লেন, সর্বজ্যেষ্ঠ সন্তান হিসাবে পরিবার প্রতিপালনে মাকে কোনও ভাবে সাহায্য করতে পারেন কিনা। এই উদ্দেশ্যে তিনি কলকাতা যাওয়া স্থির করলেন। উপায়ান্তর না দেখে পুত্রের এই বিপদাশঙ্কাপূর্ণ কাজে অনিচ্ছা সত্বেও দুর্গা দেবী রাজী হলেন।

ঠাকুরদাস অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন না বটে, কিন্তু তিনি ছিলেন কর্ত্তব্যপরায়ণ, পরিশ্রমী ও সৎ। বিদ্যাসাগর লিখিত স্মৃতিকথায় কলকাতায় ঠাকুরদাসের জীবন সংগ্রামের কাহিনী থেকে তাঁর উপরোক্ত গুণগুলির কথা স্পষ্টতই বোঝা যায়।

তখনকার দিনে রাজভাষা ইংরাজী সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান থাকা কোনও সাহেবী কোম্পানীতে বা কোনও সাহেবের অধীনে চাকরী পাওয়ার পক্ষে সবচেয়ে বড় যোগ্যতা ছিল। ১৮৩৪ সালে প্রকাশিত ইংরাজী-বাংলা অভিধানের ভূমিকায় রামকমল সেন লিখছেন, "১৭৭৪ সালে এখানে

(কলকাতায়) সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকে ইংরাজী ভাষা সম্বন্ধে জ্ঞান কাম্য ও প্রয়োজনীয় বলে প্রতীয়মান হল।" তখনকার দিনে ইউরোপীয় এ্যাডভোকেট অথবা এটর্নীদের করণিকেরা ছিলেন ইংরাজীর শিক্ষক। তাঁরা তাঁদের ইংরাজী শব্দ সঞ্চয়ের জন্য বেশ গর্ব অনুভব করতেন। এই শব্দগুলি তাঁরা একটি ছোট খাতায় লিখে সর্বদা নিজেদের পকেটে নিয়ে বেড়াতেন। যাঁরা "ইংরাজী ভাষায় সম্পূর্ণ দক্ষ" বলে বিবেচিত হতেন তাঁদেরও মাত্র একটি ছোট 'ওয়ার্ডবুক' ও একটি 'স্পেলিং বুক' আয়ত্ব করলেই যথেষ্ট হত। ইংরাজী শিক্ষা করার জন্য ছাত্র প্রতি চার টাকা থেকে ষোল টাকা বেতন ছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর জীবনযাত্রার মান অনুসারে এই বেতন কিছু বেশী ছিল বলে মনে করা হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যখন বিদ্যাসাগরের পিতা ঠাকুরদাস চাকরীর সন্ধানে কলকাতায় গিয়েছিলেন তখনও এই অবস্থার পরিবর্তন হয় নি।

সংস্কৃত শিক্ষার জন্য শক্তি ক্ষয় না করে ঠাকুরদাসের পক্ষে কিছু প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষা অর্জন করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হল। ঠাকুরদাসের এক নিকট আত্মীয় জগমোহন ন্যায়ালঙ্কার তাঁর নিজের স্থাপিত টোল থেকে তখন বেশ ভাল আয় করছিলেন। তিনিই ঠাকুরদাসের ইংরাজী শিক্ষার ব্যয় নির্বাহের সমস্যার সমাধান করে দিলেন। তিনি ঠাকুরদাসকে নিজের বাড়ীতে আশ্রয় ও আহারের সংস্থান করে দিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর এক বন্ধুর নৈশ বিদ্যালয়ে বিনা বেতনে তাঁকে ইংরাজী শেখানোরও ব্যবস্থা করলেন। ঠাকুরদাস কাল বিলম্ব না করে নিয়মিত নৈশ বিদ্যালয়ে যোগদান করতে লাগলেন। এর ফলে প্রায়ই তাঁর রাত্রির আহার বাদ পড়ে যেত। টোলের যে সব গরীব ছাত্র ন্যায়ালঙ্কারের বাড়ীতে থাকার অনুমতি পেয়েছিল তাদের এবং অতিথিদের সকলকেই সূর্যাস্তের ঠিক পরেই রাত্রির আহার গ্রহণ করতে হত। এ বিষয়ে ন্যায়ালঙ্কারের কড়া নির্দেশ ছিল। দৈবক্রমে কারুর আসতে দেরী হলে তাকে সে রাত্রির মত বিনা আহারে থাকতে হত। এই কারণে নৈশ বিদ্যালয়ে পড়ার দরুণ ঠাকুরদাসকে প্রায়ই বিনা আহারে রাত্রি কাটাতে হত।

কিছুদিনের মধ্যেই তিনি মাসিক দু'টাকা বেতনে একটি চাকরী পেলেন। কঠোর পরিশ্রম করার জন্য শীঘ্রই বেতন বেড়ে মাসে পাঁচ টাকা হ'ল। দুর্গা দেবী পুত্রের ক্রমোজ্জ্বল সম্ভাবনার খবর পেয়ে অত্যন্ত আনন্দিত হলেন। এই শুভ সংবাদ পেয়ে তিনি বীরসিংহ গ্রামের বাসিন্দাদের মিষ্টান্ন খাইয়ে পরিতুষ্ট করলেন। পরে আরো সুদিন এলো। ন্যায়ালঙ্কারের আশ্রয় ত্যাগ করে ঠাকুরদাস পিতৃবন্ধু ভাগবত চরণ সিংহের বাড়ীতে তাঁর তত্ত্বাবধানে বাস করতে লাগলেন। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন এবং তাঁর অবস্থাও ভাল। বড়বাজারে এঁরই বাড়ীতে ঊন'বংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বিদ্যাসাগর তাঁর ছাত্রজীবন অতিবাহিত করেছিলেন। ভাগবত চরণের বিধবা কন্যা রাইমণির মাতৃসুলভ স্নেহ ও যত্ন বিদ্যাসাগরের মনে যে ছাপ ফেলেছিল তা কখনও মুছে যায় নি। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যা-সাগর তাঁর কথা গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। সম্ভবত রাইমণির বাল-বৈধব্যের কথা মনে করে তিনি জীবনের প্রথমেই ভারতের স্ত্রী জাতির, বিশেষ করে বিধবাদের দুঃখমোচনের জন্য গভীর আগ্রহ ও উদ্যমের সঙ্গে চেষ্টা করেছিলেন।

ঠাকুরদাসের জন্য মাসিক আট টাকা বেতনের একটি চাকরী ভাগবত চরণ সংগ্রহ করে দিলেন। সে সময় ঠাকুরদাসের বয়স ছিল চব্বিশ বৎসর। পশ্চিমবঙ্গের হুগলী জেলার গোঘাট গ্রামের প্রসিদ্ধ পণ্ডিত রামকান্ত তর্কবাগীশের দ্বিতীয়া কন্যা ভগবতী দেবীর সঙ্গে ঠাকুরদাসের বিবাহ হয়। উচ্চশ্রেণীর ঐতিহ্যশালী এই দুই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ পরিবারের বংশধরদের মিলনের ফলে বীরসিংহ গ্রামে ১৮২০ খৃষ্টাব্দের ২৬শে সেপ্টেম্বর, বাংলা ১২২৭ সালের ১২ই আশ্বিন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর জন্ম গ্রহণ করেন।

নানা দিক দিয়ে ভগবতী দেবী ছিলেন একজন অসাধারণ মহিলা। বিদ্যাসাগরের মাতৃভক্তি সম্বন্ধে বাংলাদেশে অনেক গল্প প্রচলিত আছে। ভগবতী দেবীর চরিত্রে দয়াশীলতার চেয়েও বিশেষ উল্লেখযোগ্য গুণ ছিল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর উদারতা। সেকালে স্ত্রী জাতির মধ্যে এই গুণ বিরল ছিল।

প্রয়োজনহলে তিনি জাত বিচার ও শাস্ত্রের সব রকম বিধি নিষেধ অনায়াসে অগ্রাহ্য করতেন। তিনি সমস্ত গ্রামবাসীদের মাতৃস্থানীয় ছিলেন। তাঁর চরিত্রের এই দয়া ও উদারতা পুত্র ঈশ্বরচন্দ্রের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছিল। ঈশ্বরচন্দ্র এই গুণগুলি আজীবন সযত্নে লালন করেছিলেন।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ তাঁর দুই অগ্রজের অন্যায় ব্যবহারের প্রতিবাদে পৈতৃক গ্রাম পরিত্যাগ করে ভবঘুরের মত ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। রামজয় ছিলেন অত্যন্ত তেজস্বী ব্যক্তি। হাতে একটি বাঁশের লাঠি নিয়ে তিনি খাড়া হয়ে চলতেন। নিজে যা ভাল বুঝতেন তাই করতেন। দুর্গা দেবী পাছে দুঃখ পান এই কারণে তিনি শেষে তাঁর শ্বশুর বাড়ীর গ্রাম বীরসিংহে এসে থাকতে রাজি হন। তাঁর শ্যালক রামসুন্দর বিদ্যাভূষণ গ্রামের একজন কর্তা ব্যক্তি ছিলেন। তাঁর বদমেজাজের জন্য গ্রামের লোক তাঁকে খুব ভয় করত। রামজয় তাঁকে একেবারেই পছন্দ করতেন না। গ্রামের অন্য লোকেদের মত শ্যালকের ঔদ্ধত্যের কাছে তিনি মাথা নীচু করতে চাইতেন না। প্রায়ই রামজয় ঠাট্টা করে বলতেন যে অন্যান্য অনেক গ্রামের মত বীরসিংহেও 'চতুষ্পদের' সংখ্যা বেশী কিন্তু 'দ্বিপদের' সংখ্যা খুব কম।

বিদ্যাসাগরের পিতামহের চরিত্র সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পুস্তক 'বিদ্যাসাগর চরিত'-এ মন্তব্য করেছেন : "…রামজয়ের বলিষ্ঠ উন্নত চরিত্র আমাদের নিকট প্রভাতের গিরিশিখরের ন্যায় রমণীয় বোধ হইতেছে। এই হাস্যময় তেজোময় নির্ভীক ঋজুস্বভাব পুরুষের মতো আদর্শ বাংলাদেশে অত্যন্ত বিরল না হইলে বাঙ্গালীর মধ্যে পৌরুষের অভাব হইত না। আমরা তাঁহার চরিত্র বর্ণনা বিস্তারিতরূপে উদ্ধৃত করিলাম, তাহার কারণ, এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ তাঁর পৌত্রকে আর কোনো সম্পত্তি দান করিতে পারেন নাই, কেবল যে অক্ষয় সম্পদের উত্তরাধিকার বণ্টন একমাত্র ভগবানের হস্তে, সেই চরিত্র মাহাত্ম্য অখণ্ডভাবে তাঁহার জ্যেষ্ঠপৌত্রের অংশে রাখিয়া গিয়াছিলেন।"

বীরসিংহ গ্রামে একটি মাটির কুঁড়ে ঘর ছাড়া বিদ্যাসাগর উত্তরাধিকার সূত্রে আর কোনও সম্পত্তি পাননি। কিন্তু পিতামাতা ও পিতামহ পিতামহীর চরিত্রের সমস্ত সৎ গুণগুলি,—অর্থাৎ পিতার সততা ও কর্তব্যপরায়ণতা, মাতার উদারতা ও গভীর মানবতাবোধ, পিতামহীর ধৈর্যশীলতা ও অনমনীয়তা এবং পিতামহের সরলতা, আত্মপ্রত্যয় এবং সত্যানুরাগ তিনি উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছিলেন। এদিক দিয়ে উত্তরাধিকারী হিসাবে তাঁকে বেশ সমৃদ্ধিশালী বলা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রথম প্রতিশ্রুতি

ঈশ্বরচন্দ্রের জন্মের সময় কোষ্ঠি গণনা করে দেখা গেল যে নবজাতক ষাঁড়ের মত একগুঁয়ে হলেও সত্যবাদী, সৎ ও যশস্বী হবেন। তাঁর পিতামহ ও পিতা তাঁকে ঠাট্টা করে বলতেন 'এঁড়ে বাছুর'। পরিহাসছলে তাঁরা যা বলতেন দেখা গেল তা একেবারে মিথ্যা নয়। ঈশ্বরচন্দ্রকে দিয়ে কোনও কাজ করাতে হলে তাঁকে ঠিক তার উল্টোটা করতে বলতে হত, না হলে তিনি করতেন না। একগুঁয়েমীর জন্য তাঁর পিতা তাঁকে অনেক সময় মারধোর করতেন।

ঈশ্বরচন্দ্র কোনদিনই শান্ত শিষ্ট ছিলেন না। গ্রামবাসীদের উপর অনেক সময় অনেক রকম উৎপাত করতেও ছাড়তেন না। তাঁদের বাগান থেকে ফল বা ফুল চুরি করতেন অথবা তাঁদের অন্ধবিশ্বাসে আঘাত দিয়ে বিরক্ত করতেন। বহুকাল পরে একবার এক ভদ্রলোক তাঁর কাছে নিজের ছেলের বিষয় নালিশ করতে আসেন। তখন ঈশ্বরচন্দ্র হাসতে হাসতে ভদ্রলোককে বলেন, "আপনি হতাশ হবেন না। আমার দিকে চেয়ে দেখুন। আমাকে নিয়েও ছেলে বেলায় বেশ সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল। বাবা মাকে এবং পাড়াপড়শীদের জ্বালাতন করার জন্য আমিও নানা রকম দুষ্টুমী করতে ছাড়তাম না। কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি এখন কোনও রকমে নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছি এবং আমার ছেলেবেলায় তথাকথিত বিজ্ঞ ব্যক্তিরা আমার ভবিষ্যৎ যতটা অন্ধকার হবে বলে ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন অন্তত ততটা অন্ধকার হয়নি। কে বলতে পারে যে আপনার ছেলেও ভবিষ্যতে আমার মত অথবা আমার চেয়ে বেশী উন্নতি করবে না?"

বিদ্যাসাগর তাঁর বিখ্যাত শিশুপাঠ্য 'বর্ণ পরিচয়' (প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ) পুস্তকে গোপাল নামে একটি বাধ্য ও আদর্শ চরিত্র বালকের কাহিনী লিখেছেন। গল্পের মধ্যে একটি অবাধ্য ও দুষ্ট বালকের চরিত্রও আছে, তার নাম রাখাল। তরুণ শিক্ষার্থীদের তিনি রাখালের চরিত্র অনুসরণ না করে গোপালের চরিত্র অনুসরণ করবার উপদেশ দিয়েছেন। এই গল্প সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিত'-এ বলেছেন : ……"নিরীহ বাংলাদেশে গোপালের মতো সুবোধ ছেলের অভাব নেই। এ ক্ষীণতেজ দেশে রাখাল এবং তাহার জীবনীলেখক ঈশ্বরচন্দ্রের মতো দুর্দান্ত ছেলের প্রাদুর্ভাব হইলে বাঙ্গালী জাতির শীর্ণ চরিত্রের অপবাদ ঘুচিয়া যাইতে পারে। সুবোধ ছেলেগুলি পাস করিয়া ভালো চাকরি বাকরি বা বিবাহকালে প্রচুর পণ লাভ করে সন্দেহ নাই, কিন্তু দুষ্ট অবাধ্য অশান্ত ছেলেগুলির কাছে স্বদেশের জন্য অনেক আশা করা যায়।"

কিন্তু একটি বিষয়ে অর্থাৎ লেখা পড়ার ব্যাপারে ঈশ্বরচন্দ্র রাখালের সম্পূর্ণ বিপরীত ছিলেন। রাখাল পড়াশুনা করত না, কিন্তু বিদ্যাসাগর অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে লেখাপড়া করতেন, অনেক বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও।

সে যুগে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হ'ত গ্রামের পাঠশালায়। তারপর অবস্থাপন্ন ব্রাহ্মণ শিক্ষার্থীরা টোলে যেত উচ্চতর সংস্কৃত শিক্ষার জন্য। বীরসিংহ গ্রামে একটি পাঠশালা ছিল। সেই পাঠশালার গুরুমশায় মনে করতেন মারধোর না করলে ছেলে মানুষ হয় না। এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে অতি উৎসাহে তিনি ছাত্রদের তাড়না করতেন। পাঠশালার ছেলে-মেয়েরা এই কারণে তাঁকে যমের মত ভয় করত। সুতরাং ঈশ্বরচন্দ্রকে পড়াবার জন্য ঠাকুরদাস কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় নামে এক কুলীন ব্রাহ্মণকে ঠিক করলেন। কালীকান্ত ছিলেন অমায়িক প্রকৃতির মানুষ এবং শিক্ষক হিসেবেও তাঁর সুনাম ছিল। কিন্তু গ্রামের পাঠশালায় শিক্ষকতার চেয়ে কৌলিন্য প্রথার আর্থিক সুবিধার প্রতি তাঁর আকর্ষণ ছিল বেশী। কালী-কান্তের অনিচ্ছা সত্ত্বেও ঠাকুরদাস অনেক বুঝিয়ে রাজী করিয়ে তাঁকে দিয়ে

গ্রামে একটি পাঠশালা খোলালেন। কালীকান্তকে পাঁচ বছরের ছেলে ঈশ্বরচন্দ্রকে লেখাপড়া শেখাবার ভার দেওয়া হল। ঐ বয়সেই হিন্দু প্রথা অনুসারে শিশুদের হাতেখড়ি হয়। কালীকান্ত তাঁর ছাত্রের বুদ্ধিমত্তায় চমৎকৃত হলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের পক্ষে তিন বছরের মধ্যে পাঠশালার পাঠ্যক্রম শেষ করা একটা অসাধারণ ব্যাপার—এ কথা তিনি ঠাকুরদাসকে একাধিকবার বললেন। ঠাকুরদাসকে তিনি আরও বললেন, "ঈশ্বরচন্দ্রকে কলকাতার কোনও ভালো ইংরাজী স্কুলে ইংরাজী শিক্ষার জন্য পাঠাবার এই হল উপযুক্ত সময়।" ঠাকুরদাসও তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে একমত হলেন।

যে গ্রামীণ আবহাওয়ার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের শৈশব অতিবাহিত হয়েছিল তা ছিল নিষ্প্রাণ ও হতাশাব্যঞ্জক। বীরসিংহ গ্রামটি বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের অন্যান্য বহু গ্রামের মতই শিক্ষাসংস্কৃতির আলোকবর্জিত একটি অনুন্নত গ্রাম ছিল। সেখানকার সমাজ জীবনের একটিমাত্র বৈশিষ্ঠ ছিল যা ঈশ্বরচন্দ্রের প্রস্ফুটমান মনের উপরে কিছুটা ছাপ ফেলেছিল। বীরসিংহ ও আশেপাশের বেশীরভাগ গ্রামের অধিবাসীই ছিল ধীবর বা ছোটখাট ব্যবসায়ী। তাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবন প্রকাশ পেত গ্রামের উৎসব, মেলা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে। সেই জীবনে কিছু কিছু সজীবতার লক্ষণ ছিল যা প্রাণহীন আচার অনুষ্ঠানের চাপে নষ্ট হয়ে যায় নি। সাধারণত উচ্চ বর্ণের হিন্দু সমাজে কঠোর নিষ্প্রাণ আচার নিষ্ঠা প্রচলিত ছিল। ভাগ্যক্রমে বীরসিংহ গ্রামের আবহাওয়ায় এ জিনিসটা ছিল না। ফলে ঈশ্বরচন্দ্রের তরুণ মনের সক্রিয় বিকাশ রুদ্ধ হতে পারেনি।

বিদ্যাসাগর যখন কলকাতায় রওনা হলেন তখন তাঁর বয়স আট বছর। তিনি দেখতে ছিলেন বেঁটে, রোগা এবং বয়সের তুলনায় ভীতু ও লাজুক প্রকৃতির। স্থির হল যে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে তাঁর পিতা ও শিক্ষক ছাড়া একজন ভৃত্যও যাবে। ১৮২৮ সালের নভেম্বর মাসের এক শুভদিনে এই চারজন বীরসিংহ থেকে ৬০ মাইল দূরে কলকাতা শহর অভিমুখে পায়ে হেঁটে রওনা হলেন। তিন দিন ধরে তাঁরা উদয়াস্ত পথ চললেন।

ঈশ্বরচন্দ্র বেশ ভাল ভাবেই পথের কষ্ট সহ্য করেছিলেন। মাঝে মাঝে তাঁকে তাঁর পিতা বা শিক্ষক বা বৃদ্ধ ভৃত্যের পিঠে চড়ে যেতে হয়েছিল।

তৃতীয় দিন তাঁরা সালকিয়া যাওয়ার নতুন পাকা সড়কে পোঁছলেন। এ গ্রামটি ছিল হুগলী নদীর পশ্চিমে কলকাতার ঠিক বিপরীত দিকে অবস্থিত। হাঁটা পথে চলতে চলতে পথের ধারে দূরত্ব নির্দেশক পাথরের ফলকগুলি দেখে ঈশ্বরচন্দ্রের কৌতূহল হল। তখন ঠাকুরদাসকে ফলক-গুলির তাৎপর্য বালককে বুঝিয়ে দিতে হল। ঈশ্বরচন্দ্র সহজেই সেই প্রস্তর ফলকগুলি থেকে ইংরাজী সংখ্যামালা শিখে ফেললেন। তিনি এত সহজে এটি শিখে ফেললেন যে তা দেখে কালীকান্ত ও ঠাকুরদাস উভয়েই বিস্মিত হলেন এবং বৃদ্ধ ভৃত্য ঈশ্বরচন্দ্রকে কাঁধের উপর তুলে আনন্দে নাচতে লাগলেন।

তৃতীয় দিনে সন্ধ্যাবেলায় তাঁরা নৌকো করে হুগলী নদী পার হয়ে কলকাতা শহরের বড়বাজার এলাকায় এসে পোঁছলেন। ভাগীরথীর পশ্চিম থেকে পুবে এই যাত্রা ছিল ঈশ্বরচন্দ্রের জীবনে এক স্মরণীয় ও তাৎপর্যপূর্ণ অভিযান। এ যেন পুরাতন থেকে নতুন যুগের উদ্দেশ্যে এক তীর্থযাত্রা।

তৃতীয় অধ্যায়

শিক্ষা : সংস্কৃত বনাম ইংরাজী

কলকাতায় পৌঁছে ঠাকুরদাস ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁর প্রাক্তন আশ্রয়দাতা ভাগবত চরণ সিংহের বড়বাজারস্থ বাড়ীতে নিয়ে এলেন। ভাগবত চরণের মৃত্যুর পর তাঁর পঁচিশ বৎসর বয়স্ক পুত্র জগৎ দুর্লভ তাঁর মা ও বিধবা বোন রাইমণির সঙ্গে সেই বাড়ীতে বাস করছিলেন। ঠাকুরদাস ও ঈশ্বরচন্দ্রকে তাঁরা সাদরে গ্রহণ করলেন। রাইমণি ঈশ্বরচন্দ্রকে মাতৃস্নেহে সমাদর করলেন। একথা ঈশ্বরচন্দ্র জীবনে কখনও ভোলেন নি। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে লিখেছেন: "স্নেহ, দয়া, সৌজন্য, অমায়িকতা, সদ্বিবেচনা প্রভৃতি সদগুণ বিষয়ে, রাইমণির সমকক্ষ স্ত্রীলোক এ পর্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই দয়াময়ীর সৌম্যমূর্ত্তি, আমার হৃদয়মন্দিরে, দেবীমুর্ত্তির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত হইয়া, বিরাজমান রহিয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে, তাঁহার কথা উত্থাপিত হইলে তদীয় অপ্রতিম গুণের কীর্ত্তন করিতে করিতে, অশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারি না।" অনেকে মনে করেন যে রাইমণির প্রতি ঈশ্বরচন্দ্রের এই সশ্রদ্ধ ভালবাসা ও তাঁর বালবৈধব্য সম্বন্ধে সহানুভূতি,— এই দুই কারণে তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহুবিবাহ নিবারণের জন্য সংগ্রাম করেছিলেন।

কলকাতায় পৌঁছবার কয়েকদিনের মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রকে এক পাঠশালায় পাঠান হল তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা কতদূর এগিয়েছে তার পরীক্ষা নেবার জন্য। এই পাঠশালার গুরুমহাশয় স্বরূপচন্দ্র কালীকান্তের চেয়ে ভাল শিক্ষক ছিলেন। তিন মাস যাবৎ সেই পাঠশালায় পড়াশুনা করে ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর প্রাথমিক শিক্ষা সম্পূর্ণ করলেন। এইবার তিনি কোন ভালো

স্কুলে উচ্চ শিক্ষা লাভের উপযুক্ত হলেন। কিন্তু কোন ভাষার মাধ্যমে তিনি উচ্চ শিক্ষা লাভ করবেন—ইংরাজী না সংস্কৃত ?

ঈশ্বরচন্দ্রের পিতা, শিক্ষকেরা এবং অন্যান্য শুভাকাঙ্খীরা এই নিয়ে এক সমস্যায় পড়লেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার পারস্পরিক সুবিধা ও সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা চলল। তাঁর আত্মজীবনীতে ঈশ্বরচন্দ্র সমস্যাটি এইভাবে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন "গুরু মহাশয়ের পাঠশালায় যতদূর শিক্ষা দিবার প্রণালী ছিল, কালীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ও স্বরূপচন্দ্র দাসের নিকট আমার সে পর্যন্ত শিক্ষা হইয়াছিল। অতঃপর কিরূপ শিক্ষা দেওয়া উচিত, এ বিষয়ে পিতৃদেবের আত্মীয়বর্গ, স্ব স্ব ইচ্ছার অনুযায়ী পরামর্শ দিতে লাগিলেন।......আমরা পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী ; পিতৃদেব অবস্থার বৈগুণ্য-বশতঃ ইচ্ছানুরূপ সংস্কৃত পড়িতে পারেন নাই ; ইহাতে তাঁহার অন্তঃকরণে অতিশয় ক্ষোভ জন্মিয়াছিল। তিনি সিদ্ধান্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, আমি রীতিমত সংস্কৃত শিখিয়া চতুষ্পাঠীতে অধ্যাপনা করিব। এ জন্য পূর্ব্বোক্ত পরামর্শ তাঁহার মনোনীত হইল না। তিনি বলিলেন, উপার্জ্জনক্ষম হইয়া আমার দুঃখ ঘুচাইবেক, আমি সে উদ্দেশ্যে ঈশ্বরকে কলিকাতায় আনি নাই। আমার একান্ত অভিলাষ, সংস্কৃত শাস্ত্রে কৃতবিদ্য হইয়া দেশে চতুষ্পাঠী করিবেক, তাহা হইলেই আমার সকল ক্ষোভ দূর হইবেক।......মাতৃদেবীর মাতুল রাধামোহন বিদ্যাভূষণের পিতৃব্য পুত্র মধুসূদন বাচস্পতি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন করিতেন। তিনি পিতৃদেবকে বলিলেন, আপনি ঈশ্বরকে সংস্কৃত কলেজে পড়িতে দেন, তাহা হইলে, আপনকার অভিপ্রেত সংস্কৃত শিক্ষা সম্পন্ন হইবেক ; আর যদি চাকরী করা অভিপ্রেত হয়, তাহারও বিলক্ষণ সুবিধা আছে ; সংস্কৃত কলেজে পড়িয়া যাহারা ল' কমিটির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়, তাহারা আদালতে জজ পণ্ডিতের পদে নিযুক্ত হইয়া থাকে।......অনেক বিবেচনার পর বাচস্পতি মহাশয়ের ব্যবস্থাই অবলম্বনীয় স্থির হইল।" ঠাকুরদাস ও তাঁর আত্মীয় স্বজনের মধ্যে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার পারস্পরিক সুবিধা সম্বন্ধে যে সময় আলোচনা চলছিল তখন সেটা ছিল ১৮২৯ সাল। ইংরাজী

শিক্ষার সমর্থক বা অ্যাংলিসিষ্ট ও প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষার সমর্থক বা ওরিয়েন্টালিষ্টদের মধ্যে তখন তুমুল বাক্‌বিতণ্ডা চলছিল। বার বছর ধরে এই তর্ক বিতর্ক চলেছিল। ১৮২২-২৩ সালে সুরু হযে এই বিরোধ চরমে পেঁাছায় ১৮২৯ ও ১৮৩৫ সালের মধ্যে এবং শেষ হয় ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ তারিখে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্কের বিখ্যাত সিদ্ধান্ত গৃহাত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। মেকলে ইংরাজী শিক্ষার সরকাবী সমর্থনের জন্য যে সুপারিশ করেছিলেন তারই ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসনকালে ভারতে শিক্ষা বিস্তারের কয়েকটি স্পষ্ট পর্যায দেখতে পাওয়া যায়। সর্ব প্রথম পর্যায়ে কোম্পানীর কোনও স্বীকৃত ভূস্বত্ব বা রাজনৈতিক অধিকার না থাকাতে ভারতীয়দের শিক্ষা ব্যবস্থা কোম্পানীর শাসন নীতির অন্তর্ভুক্ত ছিল না। দ্বিতীয় স্তরে অর্থাৎ ১৭৮১ থেকে ১৭৯১ পর্যন্ত তাদের নীতি ছিল প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠ-পোষকতা করা; এই সময় কলকাতা, মাদ্রাজ ও বেনারসে সংস্কৃত কলেজ গুলি প্রতিষ্ঠিত হয। এই নীতির উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু ও মুসলমানদের শিক্ষা দিয়ে কোম্পানীর শাসন ও বিচাব বিভাগে কাজের জন্য কর্মচারী তৈরী করা। তৃতীয স্তরে ১৮১৩ সালে শিক্ষা বিস্তার করা রাষ্ট্রের দায়ীত্ব বলে আইনত মেনে নেওয়া হয়। ভারতীয়দের মধ্যে কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ইংরাজী শিক্ষা প্রসারের জন্য চেষ্টা করেন। ১৮১১ সালের ৬ই মার্চ তারিখে মিণ্টো তাঁর বিখ্যাত কার্যবিবরণীতে (Minute) শিক্ষার প্রতি শাসক শ্রেণীর ঔদাসীন্যের নিন্দা করে বলছিলেন "অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, যে জাতির নিকট সাংস্কৃতিক চর্চা এত প্রিয় এবং সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলে তার প্রসারের জন্য বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছে, সেই জাতি হিন্দুদের সাহিত্য সংস্কৃতির পৃষ্ঠপোষকতা করতে এবং ইউরোপীয় পণ্ডিত সমাজের সামনে এই সাহিত্য ভাণ্ডারের দ্বার উন্মুক্ত করতে অসমর্থ হয়েছে।" এই মন্তব্যের ফলে ১৮১৩ সালের চার্টার এ্যাক্টে সর্বপ্রথম এই ব্যবস্থা করা হল যে "ভারতীয় সাহিত্যের পুনরুজ্জীবন, ভারতীয় পণ্ডিত সমাজকে উৎসাহ

দান এবং বৃটিশ ভারতের অধিবাসীদের মধ্যে বিজ্ঞান শিক্ষা প্রচারের জন্য” বছরে অন্তত এক লাখ টাকা খরচ করা হবে।

দেখা যায় যে ১৮১৩ থেকে ১৮৩০ সাল পর্যন্ত বাংলা, মাদ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে শিক্ষার জন্য বছরে প্রায় দু'লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছিল। শিক্ষা সংক্রান্ত পরিকল্পনার জন্য ১৮২৩ সালে কলকাতায় এবং ১৮২৬ সালে মাদ্রাজে জন শিক্ষা সমিতি স্থাপিত হয়েছিল এবং বোম্বাই-এ ১৮২৩ সালে শিক্ষা সমিতি গঠিত হয়েছিল। কিন্তু শিক্ষার জন্য যা খরচ করা হচ্ছিল তা সু-পরিকল্পিত ছিল না। ইতিমধ্যে ১৮২৩ সালের ২১শে আগষ্ট সপরিষদ বড়লাট সিদ্ধান্ত করলেন যে বেনারসের মত কলকাতাতেও একটি সংস্কৃত কলেজ স্থাপন করা হবে এবং তার জন্য বার্ষিক ২৫,০০০ টাকা মঞ্জুর করা হবে। সরকারী মন্তব্যে বলা হয়েছিল যে যদিও “কলকাতা সংস্কৃত কলেজের বর্তমান বা সরাসরি উদ্দেশ্য হবে হিন্দু সংস্কৃতির অনুশীলন,” তবুও সপরিষদ বড়লাট বাহাদুরের মতে—“এর গভীরতর উদ্দেশ্য হবে ইউরোপের জ্ঞান প্রসার করবার উপযুক্ত উপায় নির্ধারণ করা।” এই সিদ্ধান্ত অনুসারে ১৮২৪ সালের ১লা জানুয়ারী কলকাতার ৬৬নং বহুবাজারের ভাড়া বাড়ীতে সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে ১৮২৬ সালের ১লা মে নিজস্ব নতুন ভবনে কলেজটি স্থানান্তরিত করা হয়।

দেখা যাচ্ছে গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আগে কোম্পানীর শিক্ষানীতি কোনও চূড়ান্তরূপ নেয়নি। ইতিমধ্যে বিখ্যাত শিক্ষাবিদ ও ঘড়ি ব্যবসায়ী ডেভিড হেয়ার এবং বিচারপতি এডওয়ার্ড হাইড ইষ্টের সহায়তায় কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙ্গালী ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্য ১৮১৭ সালে কলকাতায় একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন। এই প্রতিষ্ঠানের কয়েকটি নাম ছিল, যেমন হিন্দু কলেজ, মহাবিদ্যালয় ও এ্যাংলো ইণ্ডিয়ান কলেজ। সেই প্রতিষ্ঠানটিই বর্তমানে কলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজে পরিণত হয়েছে। হিন্দু কলেজ স্থাপন করেন কয়েকজন উচ্চ শ্রেণীর

নিষ্ঠাবান বাঙ্গালী হিন্দু। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে পাশ্চাত্য শিক্ষার সমর্থনকারী রামমোহন রায় এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন না।

এর কারণ অনুসন্ধান করা কঠিন নয়। ১৮১৫-১৬ সালে রামমোহন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বসবাস সুরু করেন। তারপর থেকে তিনি হিন্দু ধর্মের প্রাচীন প্রথা, যেমন বহু দেবদেবীর পূজা, মূর্তিপূজা, সতীদাহ বা সহমরণ ইত্যাদি, দূর করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠেছিলেন। হিন্দুদের ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক আচারের বিরুদ্ধে এই অভিযানে গোঁড়া হিন্দুরা ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন এবং সম্ভবত সেই কারণে একমাত্র হিন্দু ছাত্রদের জন্য স্থাপিত এই নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে রামমোহনের কোনও সাহায্য তাঁরা নিতে চান নি। অতএব রামমোহন ১৮২২ সালে কলকাতায় আর একটি ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপন করেন। আমহার্স্টকে লিখিত তাঁর বিখ্যাত পত্রে তিনি ভারতে শিক্ষাবিস্তারের ব্যাপারে গভর্ণমেণ্টের প্রাচ্যবিদ্যামুখী নীতির বিরোধিতা করেন। সেই চিঠিতে তিনি কলকাতায় সংস্কৃত কলেজ প্রতিষ্ঠা করার প্রস্তাবের তীব্র সমালোচনা করেন এবং ভারতে এক উদার ও প্রগতিশীল শিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের জন্য বিশেষ অনুরোধ জানান। তাঁর মতে এই শিক্ষার মধ্যে থাকবে "গণিত শাস্ত্র, প্রকৃতি বিজ্ঞান, রসায়ন, শারীরবিদ্যা এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিজ্ঞান শাস্ত্র—যেগুলি যথাযথ অনুশীলনের ফলে ইউরোপীয় জাতিরা পৃথিবীর অন্যান্য দেশের অধিবাসীদের চেয়ে অনেক উন্নতি করতে পেরেছে।"

তখনকার দিনে ইংরাজদের মধ্যে অনেকে ছিলেন যাঁরা সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচ্যজ্ঞানকে শ্রদ্ধা করতেন ও তার চর্চা করতেন। কিন্তু ভারতীয়দের মধ্যে ইংরাজী ভাষা ও কৃষ্টির সমর্থক খুব বেশী ছিলেন না। রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম স্পষ্ট ভাষায় ইংরাজী শিক্ষার সমর্থন করেন এবং ১৮১৬ থেকে ১৮৩০ সালে তাঁর বিলাত যাত্রা পর্যন্ত ইংরাজী শিক্ষার স্বপক্ষে আন্দোলন চালিয়ে যান। ইতিমধ্যে হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত এক নতুন তরুণ গোষ্ঠির সৃষ্টি হল যারা ইংরাজী শিক্ষার প্রবল সমর্থন করতে

লাগলেন। এই ব্যাপারটি ঘটেছিল ১৮২৯-৩০ সালে। ঠিক সেই সময়ে ঈশ্বরচন্দ্রকে কি ধরনের উচ্চশিক্ষা দেওয়া হবে এই নিয়ে আলোচনা চলছিল। যতদিনে গভর্ণমেণ্ট ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তনের নীতি গ্রহণ করলেন ততদিনে প্রাচ্যবিদ্যা সমর্থকরা হার মানতে সুরু করেছেন। সে হল ১৮৩৫ সালের কথা। ঈশ্বরচন্দ্র তখন তাঁর ছাত্রজীবনের মাঝামাঝি সময়ে পৌঁছেছেন।

ঠাকুরদাস যখন স্থির করলেন যে ঈশ্বরচন্দ্রকে প্রাচীন সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়া হবে, তখন পর্যন্ত প্রাচ্যবিদ্যার পৃষ্ঠপোষকেরা প্রবল ছিলেন এবং ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে কোনটি প্রবর্তন করা উচিৎ সে বিষয়ে ইংরাজ শাসকেরা দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। শাসকদের ধীরেসুস্থে কাজ করার অবকাশ ছিল কিন্তু ন'বছরের একটি বালকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তার মধ্যে ফেলে রাখা সম্ভব ছিল না। অতএব তার শিক্ষা ব্যবস্থা সম্বন্ধে যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল তা শীঘ্রই কার্যে পরিণত করা হল। ১৮২৯ সালের ১লা জুন ঈশ্বরচন্দ্র কলকাতার সংস্কৃত কলেজে ভর্তি হলেন। গত শতাব্দীর সেই চাঞ্চল্যময় তৃতীয় দশকে তিনি শিক্ষা সুরু করলেন।

চতুর্থ অধ্যায়

বিক্ষুব্ধ দশক

গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে হঠাৎ নানা দিক দিয়ে বিক্ষোভের ঝড় বইতে আরম্ভ করেছিল। ফলে বহু দিনের পুরানো বিশ্বাস ও ঐতিহ্য সব ভেঙ্গে পড়ছিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সমাজে ভীতি ও অনিশ্চয়তা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮২৯ থেকে ১৮৪১ পর্যন্ত ঈশ্বরচন্দ্র যতদিন লেখাপড়া করছিলেন ততদিন ধরে এই আলোড়ন চলেছিল।

একদিকে যেমন ইংরাজী ও প্রাচ্যবিদ্যাপ্রেমীদের তীব্র বাদানুবাদ চলছিল, অন্যদিকে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজের কাজও এগিয়ে চলছিল। ১৮২৪ সালের জানুয়ারী মাসে হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ গভর্নমেণ্টের কাছে সরকারী সাহায্যের জন্য আবেদন করলেন। জনশিক্ষা সমিতি (কমিটি অব পাবলিক ইনষ্ট্রাক্‌শানস্) কলেজকে সাহায্য করতে রাজী হলেন। কিন্তু তার বিনিময়ে কলেজ পরিচালনার ব্যাপারে আংশিক কর্তৃত্ব দাবী করলেন। কলেজের বাঙালী হিন্দু পরিচালকদের এই প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না। ১৮২৬ সালে গোলদীঘি বা কলেজ স্কোয়ারে একটি নতুন বাড়ী তৈরী হল। সেই একই বাড়ীতে হিন্দু কলেজ ও সংস্কৃত কলেজ স্থান পেল। মাঝের অংশে সংস্কৃত কলেজ ও পূর্ব পশ্চিম অংশে হিন্দু কলেজ। একই বাড়ীতে দু'টি প্রতিষ্ঠান অবস্থিত হওয়ার ফলে প্রাচীন ভারতীয় ও পাশ্চাত্যের আধুনিক ভাবধারার বিভেদ দূর করার খুব সুবিধা হয়েছিল।

কিন্তু সামাজিক বিধিনিষেধের জন্য উভয়ের মধ্যে সংযোগের সম্ভাবনা নষ্ট হয়ে গেল। সংস্কৃত কলেজে একমাত্র উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য

ছাত্রদের প্রবেশাধিকার ছিল। হিন্দু কলেজে সকল শ্রেণীর হিন্দু ছাত্রের পড়বার অনুমতি ছিল। কিন্তু মুসলমান ও খ্রীষ্টান ছাত্রেরা সেখানে পড়তে পারত না। এইভাবে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় শিক্ষাই জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিধিনিষেধের দ্বারা সীমাবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। সুরুতে দুই প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পারস্পরিক মেলামেশা বন্ধ করার জন্য যে উপায় উদ্ভাবন করা হয়েছিল তা হাস্যোদ্দীপক বলে মনে হয়। দুই প্রতিষ্ঠানকে একটি দেওয়াল দিয়ে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল আর সেই দেওয়ালের উপর দেওয়া ছিল লোহার গরাদ। উদ্দেশ্য ছিল যাতে 'দ্বিজ' ও 'শূদ্র' ছাত্ররা পরস্পর মেলামেশা না করতে পারে। এ ছাড়া তাদের একই ফটক ভিতর দিয়ে ভিতরে ঢোকার অনুমতি ছিল, অবশ্য তেমন চওড়া ফটকের হলে এবং ঢোকবার সময় উভয় শ্রেণীর ছাত্রদের মধ্যে ছোঁয়াছুঁয়ি না না হলে তবেই। ভবনের মাঝের অংশকে বেড়া দিয়ে ঘিরে পাশের অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়েছিল যাতে এক কলেজের ছাত্রেরা অন্য কলেজে প্রবেশ করতে না পারে। উপরন্তু দুই কলেজের সন্নিহিত উপ-গৃহ (আউট হাউস) ও দপ্তরগুলি আলাদা করে রাখা হয়েছিল যাতে "ভারতীয়দের দৃঢ়বদ্ধমূল ধর্মবিশ্বাস ক্ষুণ্ণ না হয়।"

সেই মহৎ শিক্ষা-মন্দিরের রেলিং-ঘেরা সংকীর্ণ আবেষ্টনীর মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবন কেটেছিল।

হিন্দু কলেজকে "হিন্দুস্তানের উন্নততর বুদ্ধিশালী ব্যক্তিদের মধ্যে ইউরোপীয় জ্ঞান বিস্তারের প্রধান মাধ্যম" করার অথবা সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে "ক্রমশ ইউরোপীয় জ্ঞান প্রসার" করার মত অনুকূল অবস্থা ছিল না।

এই আবহাওয়ার মধ্যে ঈশ্বরচন্দ্র বড় হয়ে উঠলেও তাঁর বুদ্ধিবৃত্তি বিশেষ প্রসার লাভ করেছিল। 'জ্ঞান সমুদ্রে'র পূর্ব তীরে দাঁড়িয়ে তিনি 'লোহার রেলিং' এর 'পরিবেষ্টনী'র ওপারে পশ্চিমের দিকে তাকিয়ে একান্ত মনে কামনা করতেন যে এই রেলিং এর বেড়া দূর হয়ে যাক। পূর্ব ও পশ্চিমের মধ্যে বিনা বাধায় ভাবের যাচাই ও বিনিময় হোক।

হিন্দু কলেজের কয়েকজন চরমপন্থী ছাত্রের কার্যকলাপের জন্য অবস্থাটা আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল। এদের বলা হত, 'ডিরোজিয়ান' অর্থাৎ ডিরোজীয়পন্থী। এঁদের এই নামকরণ হয়েছিল এঁদের শিক্ষক এইচ. এল. ভি. ডিরোজীও-র নাম অনুসারে। ডিরোজীও ছিলেন একজন তরুণ ইউরেশিয়ান কবি, দার্শনিক ও শিক্ষাবিদ। এই যুবকগোষ্ঠী জন সমাজে 'ইয়ং বেঙ্গল' ও 'ইয়ং ক্যালকাটা' নামে পরিচিত ছিলেন। এঁদের উদ্ভব হয় দ্বিতীয় দশকের শেষের দিকে। প্রাচীন মত চূর্ণ করবার উৎসাহ ও সমাজ সংস্কারের প্রবল আগ্রহ নিয়ে এঁরা গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে আর্বিভূত হ'ন। ঈশ্বরচন্দ্রের ছাত্রজীবনের প্রথমার্ধে এইসব ঘটনা ঘটে।

১৮০৯ সালের ১০ই এপ্রিল কলকাতায় ডিরোজীওর জন্ম হয় এবং মৃত্যু হয় ১৮৩১ সালে। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র বাইশ বছর। ১৮২৭ সালে মাত্র ১৮ বছর বয়সে তিনি হিন্দু কলেজের শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর মনোমুগ্ধকর ব্যক্তিত্ব ও বুদ্ধিমত্তা দেখে কলেজের উচু ক্লাশের ছাত্রেরা তাঁর দিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। ডিরোজীওর জীবনীকার টমাস এডওয়ার্ড বলেছেন, "তাঁর পূর্বে অথবা পরে কোনও ভারতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কোনও শিক্ষক ছাত্রদের উপর এত গভীর প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি।" তখনকার ঘটনাবলী থেকে এই প্রশংসা বাক্যের সত্যতা প্রমাণিত হয়।

১৮২৭ থেকে ১৮৩০ সালের মধ্যে তরুণ ডিরোজীও ছাত্র শিষ্যেরা প্রতিপত্তি লাভ করেন। ডিরোজীওর নিজের কথায় বলতে গেলে, 'তারা পুষ্প দলের মত বিকশিত হয়ে উঠছিল", "তারা যেন পক্ষীশাবকদের মত গ্রীষ্মের নরম আবহাওয়ায় পাখা মেলে নিজেদের শক্তি পরীক্ষা করছিল।" তরুণ শিক্ষক ডিরোজীওর কাছে তারা বেকন, লক্, বার্কলে, হিউম, রিড্, টমাস পেইন্, ডুগাল্ড ষ্টুয়ার্ট প্রভৃতির রচনাবলী পড়ল। ফলে তাদের ভাবধারার মধ্যে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসতে লাগল। তারা সব জিনিস যুক্তি দিয়ে যাচাই করে নিতে শিখছিল, শিখছিল প্রশ্ন করতে,

সন্দেহ করতে, কোনও বিধান বা নির্দেশকে নির্বিচারে মেনে না নিতে,— তা সে যতই প্রাচীন হোক না কেন। ক্লাসে, ডিরোজীওর বসবার ঘরে এবং 'দি এ্যাকাডেমিক এ্যাসোসিয়েশান' নামে তাদের নিজেদের সমিতিতে তারা গুরুগম্ভীর বিষর নিয়ে বাদানুবাদ করত। রেভারেণ্ড লালবিহারী দে তাঁর 'রিকালেক্শান্স' নামক গ্রন্থে লিখেছেন যে উপরোক্ত এ্যাসোসিয়েশানের সাপ্তাহিক সভায় "ইয়ং ক্যালকাটা দলের শ্রেষ্ঠ সভ্যরা সপ্তাহের পর সপ্তাহ সামাজিক, নৈতিক ও ধর্ম বিষয়ক সমস্যা সম্বন্ধে ভাষণ দিতেন। এইসব আলোচনার মুল সুর ছিল প্রচলিত ধর্ম সম্বন্ধীয় বিধি বিধানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।······সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে এ্যাকাডেমীর সিংহ শিশুদের গর্জন শোনা যেত, 'হিন্দু ধর্ম ধ্বংস হোক', 'গোঁড়ামি ধ্বংস হোক'।" এর ফলে হিন্দু সমাজে ভীতির সঞ্চার হল এবং নেতৃস্থানীয়েরা রীতিমত চিন্তিত হয়ে উঠলেন।

এই সময় জ্বলন্ত আগুনে নতুন করে ইন্ধন পড়ল। অনেক ইতস্তত করবার পর বড়লাট বেণ্টিঙ্ক ১৮২৯ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর আইন করে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে দিলেন। তখনকার দিনে অনেক ইংরাজ এই আইনের বিপক্ষে ছিলেন, কেন না তাঁদের মতে এই আইন করলে হিন্দু ধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে। প্রখ্যাত প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদ এইচ. এইচ. উইলসন গভর্ণমেন্টের সামরিক সচিবকে ১৮২৬ সালের ২৫শে নভেম্বর লিখেছিলেন: "কলকাতার দু'একজন ব্যক্তি বিশেষ যাঁরা হিন্দু ধর্মের প্রচলিত নিয়ম বা প্রথা বর্জনের বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছেন তাঁরা হয়ত অন্যমত পোষণ করতে পারেন, কিন্তু বৃহত্তর জনসমাজ এই মত সমর্থন করবে যে সরকারী আইন মুষ্টিমেয় বিদ্রোহীদের জন্য নয়, সমস্ত হিন্দু সমাজের জন্য তৈরী হওয়া উচিত।"* সম্ভবতঃ রামমোহন রায় ও তাঁর মুষ্টিমেয় সমর্থকদের কথা মনে করে উইলসন "কলকাতায় দু'একজন ব্যক্তি বিশেষের" কথা লিখেছিলেন। এই আইনের ফলে হিন্দু সমাজের ধর্ম বিশ্বাস বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হয়েছিল এবং ১৮২৯-৩০ সালে সমস্ত হিন্দু সমাজ এর বিরুদ্ধে

* জুডিশিয়াল কনসালটেশান (ক্রিমিন্যাল) ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮২৯

প্রায় বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিল। ১৮৩০ সালের ১৭ই জানুয়ারী গোঁড়া হিন্দুরা ধর্মসভা গঠন করে এই আইন বাতিলের জন্য তার বিরোধিতা করেন।

একদিকে আমূল সংস্কারবাদী ডিরোজীও ছাত্র শিষ্যরা তীব্র স্বরে প্রগতিবাদ ঘোষণা করছিলেন, অন্যদিকে গোঁড়া হিন্দুসমাজ প্রবল প্রতিবাদের ধ্বনি তুলছিলেন। এর ফলে বেশ বিশৃঙ্খলা চলছিল। সেই সময় ১৮৩০ সালের ২৭শে মে বিখ্যাত ধর্মযাজক আলেকজাণ্ডার ডাফ কলকাতায় এসে পৌঁছান। ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম ও পাশ্চাত্য শিক্ষা প্রচারের জন্য স্কটল্যাণ্ডের কমিটি অব ফরেন মিশন্স তাঁকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি এসে দেখতে পেলেন বাংলা দেশের তরুণ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে একটা বিপ্লব চলছে, দেখতে পেলেন ধর্ম ও সমাজ সম্বন্ধে তাদের চরম মনোভাব এবং চিন্তার ক্ষেত্রে তাদের অবাধ স্বাধীনতার স্পৃহা। তাঁর 'ইণ্ডিয়া এ্যাণ্ড ইণ্ডিয়ান মিসন্স' গ্রন্থে ডাফ্ লিখেছেন: "তখনকার অবস্থা খুব অনুকূল ছিল। এই অবস্থার জন্যই আমরা এতদিন প্রতীক্ষা করেছি, এই অবস্থার জন্যই গভীরভাবে কামনা করেছি।" সেই অবস্থা দেখে তাঁর মনে আনন্দ এবং ভয়, এই মিশ্রিত মনোভাবের উদয় হয়েছিল। রামমোহন রায় ১৮৩০ সালের নভেম্বর মাসে বিলাত যাত্রার জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন। তাঁর সাহায্যে ডাফ্ ১৮৩০ সালের ১৩ই জুলাই তারিখে কলকাতায় জোড়াসাঁকো অঞ্চলে মাত্র পাঁচটি ছাত্র নিয়ে জেনারেল এ্যাসেমব্লিজ ইনসটিটিউশান নামে একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূচনা করলেন। তিনি খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে একটি বক্তৃতা-মালারও ব্যবস্থা করেন, বক্তা ছিলেন তিনি নিজে, লণ্ডন মিশনারী সোসাইটির রেভারেণ্ড এ্যাডাম ও রেভারেণ্ড হিল এবং রেভারেণ্ড ডিলট্রি। রেভারেণ্ড ডিলট্রি পরবর্তী কালে মাদ্রাজের বিশপ হয়েছিলেন। প্রথম বক্তৃতাটি ১৮৩০ সালের আগষ্ট মাসে বহু সংখ্যক শিক্ষিত হিন্দু যুবকদের সামনে প্রদত্ত হয়। এই ঘটনার আকস্মিকতায় হিন্দু কলেজের কর্তৃপক্ষ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলেন। তাঁরা ভাবলেন তাঁদের পুরুষানুক্রমিক ধর্ম বিপন্ন হয়ে উঠেছে এবং ছাত্রেরা নিশ্চয় অবিলম্বে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করবে। সুতরাং

তাঁরা নিয়ম করলেন যে, যে ছাত্র ধর্মযাজকদের ভাষণ শুনতে যবে তাকে কলেজ থেকে বহিষ্কৃত করা হবে। তরুণ প্রগতিশীল ছাত্রেরা এই "স্বেচ্ছাচারী আদেশের" বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জানাতে ছাড়ল না। বিভিন্ন বিতর্ক সভায় তারা হিন্দু সমাজের অন্ধ গোঁড়ামী ও অন্যায় অত্যাচারের তীব্র নিন্দা করতে লাগল।

এই আন্দোলনের ফলে ডিরোজীও ১৮৩১ সালের এপ্রিল মাসে হিন্দু কলেজ পরিত্যাগ করতে বাধ্য হলেন। পরের ডিসেম্বর মাসে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু ঘটে। তাঁর তরুণ ছাত্রদের বুদ্ধিবৃত্তি ও কর্মশক্তি তাঁর ব্যক্তিত্বের সম্মোহনে ক্রমশ মুক্ত হয়ে কিভাবে বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে ছড়িয়ে পড়ছিল তা তিনি দেখে যেতে পারেন নি। দু'জন প্রধান ডিরোজীও শিষ্য ছিলেন কৃষ্ণ মোহন বন্দোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। তখন তাঁদের বয়স ছিল মাত্র সতের আঠার বছর। ১৮৩১ সালের মে ও জুন মাসে তাঁরা 'এনকোয়ারার' নামে একটি ইংরাজী সাপ্তাহিক ও 'জ্ঞানাম্বেষণ' নামে একটি বাংলা সাপ্তাহিক প্রকাশ করেন। সেই পত্রিকা দুটির মাধ্যমে এই দুই তরুণ সম্পাদক সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে গোঁড়া হিন্দুসমাজের কঠোর সমালোচনা করতে থাকেন। সংরক্ষণশীল 'সমাচার চন্দ্রিকা' এই আমূল সংস্কারবাদীদের তীব্র বিরোধিতা করেন। ইউরোপীয়-দের মুখপাত্র 'ইণ্ডিয়ান গেজেট' ও 'বেঙ্গলী হরকরা' এবং শ্রীরামপুর ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের পরিচালিত সংবাদপত্র 'সমাচার দর্পণ' নরমপন্থী ও চরমপন্থীদের মধ্যে একটা মাঝামাঝি পথ অবলম্বন করে বাড়াবাড়ির জন্য তাদের উভয় দলকেই ভৎর্সনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতৃব্য প্রসন্ন কুমার ঠাকুর সম্পাদিত ইংরাজী সাপ্তাহিক 'রিফর্মার' পক্ষপাত শূন্যভাবে উদারনীতি প্রচার করেন—রামমোহন রায়, তাঁর সঙ্গী ও শিষ্যদের অর্থাৎ ব্রাহ্মদের মতবাদ এই কাগজে প্রচারিত হত। একদিকে ছিল সংরক্ষণশীল গোঁড়া হিন্দুসমাজ অন্যদিকে ছিল চরমপন্থী ডিরোজীও ছাত্র শিষ্যবর্গ, মাঝখানে ছিল মধ্যপন্থী ব্রাহ্ম সমাজ। গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে ঈশ্বরচন্দ্র যখন সংস্কৃত কলেজের ছাত্র তখন সমাজের চিত্র ছিল

মোটামুটি এই রকম। এই সামাজিক বিক্ষোভের কেন্দ্র ছিল সংস্কৃত কলেজ ভবনের পার্শ্বস্থ অংশে অবস্থিত হিন্দু কলেজ। এই দশকেই ঈশ্বরচন্দ্র বড় হয়ে উঠেছিলেন। অতএব এই বিক্ষোভ তাঁর বিকাশমান মনকে স্পর্শ না করে পারেনি।

এই দশকের শেষের দিকে তাঁর ছাত্র জীবনও শেষ হয়ে এসেছিল। তখন ঝড়ের মেঘ ধীরে ধীরে কেটে গিয়ে অন্ধকার আবহাওয়ার মধ্যে নতুন আলোর আভাস দেখা যাচ্ছিল। শিক্ষিত বাঙ্গালীদের মধ্যে দুটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য সামাজিক ও সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। ১৮৩৮ সালের মে মাসে গড়ে উঠল 'সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশান অফ জেনারেল নলেজ' ও ১৮৩৯ সালের অক্টোবর মাসে স্থাপিত হল 'তত্ত্ববোধিনী সভা'। উভয়েরই উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক বিশৃঙ্খলা নিবারণ করা এবং যতদূর সম্ভব প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের পরস্পর বিরোধী আদর্শ ও নীতির মধ্যে সামঞ্জস্য সৃষ্টি করা। প্রধানত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং তাঁর তত্ত্ববোধিনী সভার উদ্যোগেই এই সামঞ্জস্য বিধানের প্রচেষ্টা সম্ভব হয়েছিল। ১৮৩০ সালে রামমোহনের বিদেশ যাত্রা ও ১৮৩৩ সালে বিলাতে তার মৃত্যুর পর থেকে ব্রাহ্ম ধর্মের প্রভাব বেশ হ্রাস পেয়ে গিয়েছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা সেই ব্রাহ্ম মতবাদ গ্রহণ করল। দেবেন্দ্র-নাথের দৃঢ় প্রত্যয়ের ফলে এই সভা শক্তিমান ও সজীব হয়ে উঠল এবং বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের উদার মনোভাবসম্পন্ন বহু লোক এই সভায় যোগ দিলেন। তৃতীয় দশকের অনেক নাম করা ডিরোজীও শিষ্যরা চতুর্থ দশকে এই সভায় যোগদান করে খুব প্রভাবশালী সভ্য হয়ে উঠলেন। ঈশ্বরচন্দ্র স্বভাবতই এই গোষ্ঠির দিকে আকৃষ্ট হলেন এবং তাঁর ছাত্র জীবন শেষ হওয়ার পর এই সভার গণ্ডীর মধ্যে এসে পড়লেন। এই সভা এবং এর বাংলা মুখপত্র 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ছিল উদার মনোভাব বিশিষ্ট। ঈশ্বরচন্দ্র ঐ পত্রিকার সঙ্গেও সংযুক্ত হলেন। এই উদারনৈতিক ভাবধারার সংস্পর্শে এসে তিনি ভবিষ্যৎ জীবনে সমাজ সংস্কারকের ভূমিকা গ্রহণের জন্য প্রস্তুত হতে পারলেন।

পঞ্চম অধ্যায়

সংস্কৃত কলেজ

কলকাতায় সংস্কৃত কলেজে তখনও পর্যন্ত প্রাচীন টোল চতুষ্পাঠীর শিক্ষা পদ্ধতি কঠোরভাবে অনুসরণ করা হত। তখন না ছিল ছাত্রদের বসবার জন্য বেঞ্চি, না ছিল শিক্ষকদের জন্য চেয়ার। ঘরের মেঝেতে মাদুর বিছিয়ে তারা বসত। ছাত্রেরা এক এক টুকরো কাপড়ে বাণ্ডিল বেঁধে বই খাতাপত্র নিয়ে আসত। ছাপা বই প্রায় ছিল না বললেই চলে। হাতে লেখা পুঁথি থেকে ছাত্রদের পাঠ নকল করে নিতে হত। বহু পুরাতন প্রথা অনুসারে কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্রেরা সেখানে প্রবেশাধিকার পেত। শিক্ষণ পদ্ধতিও প্রাচীন টোলের আদর্শ অনুযায়ী ছিল। ইংরাজী পড়ান হত বটে কিন্তু আবশ্যিকভাবে নয়। ফলে কলেজের কর্তৃপক্ষ ও ছাত্র উভয়েই ইংরাজীর প্রতি উদাসীন ছিলেন। ইংরাজী নিয়মিত পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল না। সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করতে হলে প্রথমেই ব্যাকরণ পড়তে হত, কেননা ব্যাকরণের জ্ঞান ছাড়া সংস্কৃত ভাষা শেখা যায় না। তারপর একে একে সাহিত্য, অলঙ্কার, স্মৃতি, বেদান্ত ও ন্যায়শিক্ষা করতে পারলে সংস্কৃতে সুপণ্ডিত বলে বিবেচনা করা হত। সম্পূর্ণ পাঠ্যসূচী আয়ত্ব করতে বার বছর সময় লাগত।

সংস্কৃত ব্যাকরণ মরুদ্যানহীন মরুভূমির মত নীরস ও কঠিন। সুতরাং ব্যাকরণ আয়ত্ব করতে গিয়ে ঈশ্বরচন্দ্র মুস্কিলে পড়লেন। এই জটিল বিষয়টিকে তাঁর শিক্ষকেরা চিত্তাকর্ষক করবার চেষ্টা করতেন বটে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ঈশ্বরচন্দ্রকে গভীর রাত্রি পর্যন্ত ব্যাকরণের কঠিন নিয়মগুলি আয়ত্ব করতে হত, যদিও তাঁর স্বাস্থ্যও তখন ভাল ছিল না। তিন বছরেরও

বেশী সময় চেষ্টা করবার পর অবশেষে তিনি ব্যাকরণরূপ মরুভূমি পার হলেন। শুধু তাই নয়, অনেকগুলি বৃত্তি ও পুরস্কারও পেলেন। পরবর্তী-কালে শিক্ষা সংস্কারক হিসাবে তিনি সর্বপ্রথম সংস্কৃত ব্যাকরণের আমূল সংস্কার করে বাংলায় প্রকাশ করেন, যাতে ছাত্রেরা মাতৃভাষার মাধ্যমে সহজে ব্যাকরণ শিখতে পারে।

সংস্কৃত কলেজে ব্যাকরণ শ্রেণীতে প্রাথমিক ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হত। এ বিষয়েও ঈশ্বরচন্দ্র ভাল ফল দেখিয়েছিলেন এবং পুরস্কার পেয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৩৫ সালে কর্তৃপক্ষ ইংরাজী শিক্ষা তুলে দেওয়ার সিদ্ধান্ত করায় ঈশ্বরচন্দ্র এ বিষয়ে আর অগ্রসর হতে পারেন নি। কঠিন সংস্কৃত ব্যাকরণ কৃতিত্বের সঙ্গে আয়ত্ব করবার পর তিনি ১৮৩৩ সালে সাহিত্য শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হলেন। তখন জয়গোপাল তর্কালঙ্কার নামে এক প্রসিদ্ধ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত কলেজে সংস্কৃত সাহিত্যের অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর অধ্যয়নশীলতা ও মনোরম ব্যক্তিত্বের জন্য ছাত্রেরা তাঁকে খুব পছন্দ করত। তাঁর কয়েকজন পুরাতন শিষ্যদের লেখা স্মৃতিকথা থেকে জানা যায় যে তিনি ক্লাসে কোনও কাব্যের শ্লোক বা গদ্য রচনার অংশবিশেষ পাঠ করবার পর চোখ বন্ধ করে স্বপ্নালুভাবে সেই অংশটির সাহিত্যিক তাৎপর্য এমন ভাবাবিষ্ট ভাষায় ব্যাখ্যা করতেন যে ছাত্রেরা মুগ্ধ হয়ে যেত। ক্লাসের সেই শুষ্ক নীরস আবহাওয়া অতিক্রম করে তারা কল্পনার মেঘালয়ে পৌঁছে যেত। সৌভাগ্যক্রমে ঈশ্বরচন্দ্র জয়গোপালের মত একজন সুপণ্ডিতের তত্ত্বাবধানে প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্য পড়বার সুযোগ পেয়েছিলেন। ১৮৩৪-৩৫ সালে তিনি সাহিত্যের শেষ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করে কয়েকটি পুরস্কার পেলেন। সাহিত্য শ্রেণীতে তিনি যে দু'বছর ধরে অধ্যয়ন করেছিলেন তা তাঁর দীর্ঘ ছাত্র জীবনে সবচেয়ে আনন্দের হয়েছিল।

তখন ছিল বাল্য বিবাহের যুগ। মাত্র ১৪ বছর বয়সে দীনময়ী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। দীনময়ী দেবী বীরসিংহের নিকটস্থ ক্ষীরপাই গ্রামের এক মধ্যবিত্ত পরিবারের কন্যা ছিলেন।

কৃতিত্বের সঙ্গে অলঙ্কার, বেদান্ত ও স্মৃতি পাঠ সম্পন্ন করার পর ঈশ্বরচন্দ্র ১৮৩৯ সালে হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষা দিয়ে সফল হলেন। তার ফলে তিনি "সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত যে কোনও বিচারালয়ে" হিন্দু ল অফিসার হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করলেন। ১৮৩৯ সালের মে মাসে কমিটির অধ্যক্ষ ও সভ্যগণ তাঁকে যে প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন তার মধ্যে তাঁকে "ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর" বলে অভিহিত করেন। সাধারণত মনে করা হয় যে ১৮৪১ সালে তাঁর পাঠ সম্পূর্ণ হওয়ার পর তিনি বিদ্যাসাগর উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। কিন্তু দেখা যাচ্ছে তা নয়,—১৮৩৯ সালের মাঝামাঝি সময়েই তিনি এই উপাধি পাওয়ার যোগ্যতা অর্জন করেছিলেন।

হিন্দু ল' কমিটির পরীক্ষায় সফল হওয়ার পর পূর্ববঙ্গের ত্রিপুরা জেলার জজ-পণ্ডিতের পদ তাঁকে দেওয়া হয়। অর্থাভাবের দরুণ তিনি এই পদ গ্রহণ করতে খুব ইচ্ছুকও ছিলেন কিন্তু তাঁর পিতা তাঁকে শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে চাকরী গ্রহণ করতে নিষেধ করলেন। সুতরাং তিনি চাকরী গ্রহণ করলেন না। শিক্ষা সম্পূর্ণ করার জন্য কঠিন ন্যায় দর্শনের ক্লাসে যোগদান করলেন। পুনরায় সৌভাগ্যক্রমে তিনি সে সময়ের দু'জন বিশিষ্ট ন্যায়শাস্ত্রবিদ শিক্ষকের কাছে পড়তে পেরেছিলেন। তাঁরা ছিলেন পণ্ডিত নিমাইচন্দ্র শিরোমণি ও পণ্ডিত জয়নারায়ণ তর্ক পঞ্চানন। ১৮৪০-৪১ সালে ন্যায়ের শেষ পরীক্ষায় তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে একশত টাকা পুরস্কার পান। তিনি আরও অনেক পুরস্কার পেয়েছিলেন, যেমন শ্রেষ্ঠ সংস্কৃত কবিতা রচনার জন্য একশত টাকা, শ্রেষ্ঠ দেবনাগরী হাতের লেখার জন্য আট টাকা, কোম্পানীর আইনে ব্যুৎপত্তির জন্য পঁচিশ টাকা। এছাড়া মাসিক আট টাকা হিসাবে একটা বৃত্তি পেয়েছিলেন।

পরিবারের সাহায্যের জন্য তিনি পুরস্কার ও বৃত্তি হিসাবে যে টাকা পেতেন তা পিতাকে দিয়ে দিতেন। সেই টাকার কিছু অংশ তাঁর পিতা আলাদা করে রেখে দিতেন যাতে বীরসিংহ গ্রামে এক খণ্ড সুবিধামত জমি কিনে একটি টোল স্থাপন করতে পারেন। বাকী টাকা দিয়ে মূল্যবান ও

দুষ্প্রাপ্য সংস্কৃত পাণ্ডুলিপি কিনবার জন্য পুত্রকে নির্দেশ দিতেন। তাঁর এই নির্দেশ ঈশ্বরচন্দ্র অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনেক হস্তলিখিত মূল্যবান পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন, আবার নকলনবীশদের দিয়ে অনেকগুলি নকল করিয়ে নিয়েছিলেন। এগুলি এখনও তাঁর বিরাট লাইব্রেরীতে রাখা আছে। সে লাইব্রেরীর কথা সেই যুগেই সুপরিচিত ছিল। বর্তমানে সেই লাইব্রেরী আংশিকভাবে কলকাতার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সুরক্ষিত আছে।

সংস্কৃত কলেজে বার বছর অধ্যয়ন করার পর ১৮৪১ সালের ৪ঠা ডিসেম্বর তিনি সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে ব্যুৎপত্তির জন্য শেষ প্রশংসাপত্র পেলেন। সম্প্রতি এই প্রশংসাপত্রটি সংগ্রহ করে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাখা হয়েছে। এ ছাড়া কলেজের অধ্যাপকেরা তাঁর অসাধারণ মেধা ও সাফল্যের জন্য তাঁকে একটি অতিরিক্ত প্রশংসাপত্র দিয়েছিলেন। এর তারিখ ১০ই ডিসেম্বর ১৮৪১ সাল। প্রকৃতপক্ষে ঐ দিন তাঁর ছাত্র জীবন শেষ হল। তখন তাঁর বয়স একুশ বছর কয়েক মাস। তখন সেই বিদ্যাপীঠ ছেড়ে বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে সাফল্য অর্জন করবার সময় উপস্থিত হল।

ষষ্ঠ অধ্যায়

সংগ্রাম হল সুরু

এইবার বিদ্যাসাগরের জীবনে নিজের পথ বেছে নেওয়ার সময় এল। কলকাতা শহরের সেই অপরিচিত পরিবেশের মধ্যে তাঁকে প্রতি মুহূর্তে কঠিন সংগ্রাম করে চলতে হয়েছিল। পূর্বসূরী রামমোহনের মত তিনিও প্রগতিমূলক সমাজ ও শিক্ষা সংস্কারের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তিনি জাতীয় ঐতিহ্য সম্বন্ধেও বিশেষ সচেতন ছিলেন।

তাঁর জীবনের কয়েকটি প্রধান ঘটনা হল এই রকম,— প্রথমে ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের সেরিস্তাদার বা প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হন। তারপর ১৮৪৬ সালের এপ্রিল মাসে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ পান। ১৮৪৭ সালে তিনি ঐ পদে ইস্তফা দেন। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে পুনরায় বহাল হন। গত শতাব্দীর পঞ্চম দশকে বিদ্যাসাগর যতদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন ততদিন তিনি শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের কাজে ব্যাপৃত ছিলেন। ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে তিনি অধ্যক্ষ পদ পরিত্যাগ করেন। সেই সময় থেকে তাঁর জীবনে আর এক পরিবর্তন এল। ধীরে ধীরে তিনি কর্মক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে লাগলেন। তিনি ১৮৯১ সাল পর্যন্ত জীবিত ছিলেন কিন্তু আর কখনও জন কল্যাণের কাজে পুরোভাগে এগিয়ে আসতে পারেন নি। তাঁর জীবনে অনেক আশা ভঙ্গ হয়েছিল। সম্ভবত সেই কারণে তাঁর মনে হতাশা ও ক্লান্তি এসে পড়েছিল।

১৮৪১ থেকে ১৮৫০ পর্যন্ত ছিল তাঁর প্রস্তুতির কাল, যার ফলে পঞ্চম দশকে তিনি বিশেষ খ্যাতি ও বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে পেরেছিলেন। দেখা গেল ঐ দশকের শেষভাগে তিনি তাঁর জীবনের ব্রত নিশ্চিতভাবে বেছে নিয়েছেন এবং সে ব্রত থেকে তিনি আর পিছু হটেননি। পূর্বেই বলা হয়েছে যে তিনি ১৮৪১ সালের ডিসেম্বর মাসে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান পণ্ডিত নিযুক্ত হয়েছিলেন। ১৮০০ সালের ২৪শে নভেম্বর তারিখে মার্কুইস অব ওয়েলেসলি কলকাতায় এই কলেজ প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, কোম্পানীর যে সব তরুণ কর্মচারী ভারতে প্রথম আসতেন তাঁদের প্রাচ্যভাষা শিক্ষা দেওয়া। কলেজের এই ৪১ বছর সময়ের মধ্যে অনেক বাঙ্গালী ও হিন্দুস্থানী পণ্ডিত এবং মুসলমান মৌলভী সেখানে ভারতীয় ভাষার শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন ও উচ্চ মনোভাবাপন্ন বহু ইংরাজের সংস্পর্শে এসেছিলেন। সুতরাং ঐ প্রতিষ্ঠানে ইউরোপীয় ও ভারতীয় ভাব বিনিময়ের একটা উপযুক্ত আবহাওয়া সৃষ্টি হয়েছিল। পণ্ডিতেরা পাশ্চাত্যের নতুন উদারপন্থী মনোভাব গ্রহণ করেছিলেন আবার তরুণ ইংরাজ শাসকেরা এ দেশীয় সংস্কৃতির অন্তর্নিহিত উদারতার সংস্পর্শে আসতে পেরেছিলেন।

বিদ্যাসাগর যখন ঐ কলেজে যোগদান করলেন তখন সেখানকার আবহাওয়া ও শিক্ষার মান দ্রুত নীচে নেমে যাচ্ছিল। তবুও সেখানে তিনি শিল্প-বিপ্লবোত্তর ইংলণ্ডের অনেক গুণী তরুণ সিভিলিয়ানের প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছিলেন যার ফলে তাঁর আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে উঠবার সুযোগ হয়েছিল।

তিনি যখন কলেজের প্রধান পণ্ডিত ছিলেন তখন কলেজের সম্পাদক ক্যাপ্টেন মার্শালের সস্নেহ উৎসাহে হিন্দী ও ইংরাজী শিখবার সুযোগ পেয়েছিলেন। তিনি সংস্কৃত ভাল জানতেন বলে একজন হিন্দী শিক্ষকের কাছে সহজেই হিন্দী শিখে ফেললেন। কিন্তু ইংরাজী শেখার জন্য তাঁকে খুব পরিশ্রম করতে হয়েছিল। দুর্গাচরণ ব্যানার্জি, রাজনারায়ণ

বসু, নীলমাধব মুখার্জী ও রাজনারায়ণ গুপ্ত নামে হিন্দু কলেজের কয়েকজন ছাত্রের কাছে তিনি ইংরাজী শিক্ষা করছিলেন। অল্প কিছুদিন পরে গণিত শিক্ষা পরিত্যাগ করে তিনি শোভাবাজার রাজপরিবারের রাধাকান্ত দেব মহাশয়ের দৌহিত্র আনন্দকৃষ্ণ বসুর সহায়তায় সেক্সপীয়ারের রচনাবলী পাঠ করেছিলেন। শোভাবাজার রাজবাড়ীতে যাতায়াত করতে করতে তিনি রাজা রাধাকান্ত দেবের সঙ্গে পরিচিত হন। রাধাকান্ত দেব সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ছিলেন এবং হিন্দু সমাজের সংরক্ষণশীল দলের সবচেয়ে প্রভাবশালী নেতা ছিলেন। তিনিই রামমোহনের সমাজ ও ধর্মসংস্কারমূলক প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর যে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন এবং বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহ নিরোধের প্রচেষ্টা করেছিলেন রাধাকান্ত দেব তারও বিরোধিতা করেছিলেন। কিন্তু গোঁড়া স্বভাবের মানুষ হলেও রাজা রাধাকান্ত বিদ্যাসাগরের বুদ্ধির দীপ্তি দেখে চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি প্রায়ই বলতেন যে এই ব্রাহ্মণ বালক একদিন ভারতবর্ষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবেন। বিদ্যাসাগর অবশ্য তখন জানতেন না যে অবিলম্বে রাজা নিজে সমাজ সংস্কার ব্যাপারে তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়াবেন। সামাজিক ব্যাপারে রাধাকান্ত দেবের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল মধ্যপন্থী। সমাজের ভিতর থেকে উদ্বুদ্ধ যে সংস্কার প্রচেষ্টা তাতে তাঁর আপত্তি ছিল না, আপত্তি ছিল বাইরে থেকে সংস্কার প্রচেষ্টা সমাজের উপর চাপানোতে। রাধাকান্ত দেবের মত প্রভাবশালী ব্যক্তির শুভেচ্ছা জাবনের সুরুতে বিদ্যাসাগরের পক্ষে উৎসাহজনক হয়েছিল। বিদ্যাসাগর তাঁর এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর প্রতি কখনও শ্রদ্ধা হারাননি।

বিদ্যাসাগর নিজে যেমন ইংরাজী শিখছিলেন তেমনি অন্য অনেককে সংস্কৃত শেখাচ্ছিলেন। বাঙ্গালী ছাত্রদের সংস্কৃত শেখাবার জন্য তিনি একটা নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবন করেছিলেন এবং এই পদ্ধতিতে ভাল কাজ হচ্ছে দেখে উৎসাহিত হয়ে তিনি বাংলায় একটি সংস্কৃত ব্যাকরণ লিখে

ফেললেন। এইভাবে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের বাংলা বিভাগে তিনি কাজ করছিলেন। ইতিমধ্যে ১৮৪৬ সালে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের পদ খালি হল। শিক্ষা পরিষদের তদানীন্তন সম্পাদক ডাঃ এফ. জে মউয়াট ঐ পদে বিদ্যাসাগরকে নিযুক্ত করবার জন্য মার্শাল সাহেবের সম্মতি চাইলেন। মার্শাল সানন্দে সম্মতি দিলেন এবং বিদ্যাসাগরকে দরখাস্ত করতে বললেন। বিদ্যাসাগর তাঁর আবেদনপত্রে নিজের যোগ্যতা ও ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে তাঁর কাজের ধরন সম্বন্ধে উল্লেখ করলেন এবং লিখলেন যে সাংখ্যদর্শন ও পুরাণ, যা নাকি সংস্কৃত কলেজের নিয়মিত পাঠ্যসূচীর অন্তর্ভুক্ত নয়, সে দু'টি বিষয়ও ভাল করে শেখার জন্য তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম করেছেন। তিনি লিখলেন, "এই কারণে এবং দীর্ঘদিন সংস্কৃত কলেজে ছাত্র থাকার ফলে ঐ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা পদ্ধতি সম্পর্কে আমার বিশেষ জ্ঞান থাকায় আমার বিশ্বাস আমাকে যদি ঐ পদে নিযুক্ত করা হয় তবে আমি প্রতিষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত কাজ করতে পারব।" এই দরখাস্তের সঙ্গে মার্শালের দেওয়া একটা প্রশংসাপত্রও তিনি পাঠিয়েছিলেন। ঐ প্রশংসাপত্রে মার্শাল বিদ্যাসাগরের অসাধারণ গুণাবলীর পরিচয় দিয়েছিলেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের কথা তখন সুবিদিত ছিল, কিন্তু যা অনেকেই জানতেন না তা হল "কুসংস্কার বা সকল প্রকার অসঙ্গত মনোভাব থেকে মুক্ত স্বভাব" এবং তাঁর "অধ্যয়সায়, সৎ স্বভাব ও শ্রদ্ধার্হ চরিত্র"। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি বিধান করবার জন্য বিদ্যাসাগরের মনে যে ইচ্ছা ছিল তা তাঁর দরখাস্ত থেকে স্পষ্টই বোঝা যায়। ১৮৪৬ সালে এপ্রিল মাসে নতুন দায়িত্বভার গ্রহণ করেই তিনি সংস্কারের কাজে হাত দিলেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রচেষ্টায় বাধা পেলেন সম্পাদক রসময় দত্তের কাছ থেকে তাঁর সঙ্গে মতবিরোধের ফলে শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরকে পদত্যাগ করতে হয়েছিল।

সংস্কৃত কলেজের হস্তলিখিত অপ্রকাশিত বিবরণী থেকে এই দু'জনের সংঘর্ষের কথা জানা যায়। পরবর্তী কালে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধনের

যে প্রয়াস বিদ্যাসাগর করেছিলেন তার সঙ্গে এই ঘটনাটি বিশেষ তাৎপর্য-পূর্ণভাবে জড়িত। এই সর্ব প্রথম বিদ্যাসাগর অন্যের কাছে বাধা পেলেন। দেখা গেল যে তিনি যদি নিজের মতের সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হতেন তবে তিনি কারও কর্তৃত্বের কাছে মাথা নীচু করতেন না। কলেজের বিবরণী থেকে জানা যায় যে ১৮৪৬ সালের ৬ই এপ্রিল সহকারী সম্পাদক হিসাবে কাজে যোগদান করার পরই তিনি শিক্ষা পদ্ধতির উন্নতি সাধনের জন্য একটি পরিকল্পনার খসড়া করেন এবং কলেজের নিয়ম অনুযায়ী ১৯শে সেপ্টেম্বর সেটা বিবেচনা করবার জন্য সম্পাদকের কাছে পাঠিয়ে দেন। তার প্রায় ছ'মাসের মধ্যে ১৮৪৭ সালের এপ্রিল মাসে তাঁকে পদত্যাগ করতে হয়। ১৮৪৭ সালের ৬ই জুলাই তাঁর পদত্যাগপত্র আনুষ্ঠানিক ভাবে গৃহীত হয়। ১৮৪৭ সালের ১০ এপ্রিল সংস্কৃত কলেজের পণ্ডিত ও শিক্ষকেরা সকলে কলেজের সম্পাদক ও শিক্ষা পরিষদের সম্পাদক ডাঃ মউয়াটের কাছে এক "প্রার্থনা পত্র" পেশ করেন যে তাঁরা যেন বিদ্যাসাগরকে এই কলেজের সঙ্গে সংস্রব ছিন্ন করতে নিবৃত্ত করেন। ১৮৪৭ সালের ২১শে এপ্রিল তারিখে লিখিত এক পত্রে রসময় দত্ত বিদ্যাসাগরকে পদত্যাগ করবার কারণ দেখাতে অনুরোধ জানান। তার উত্তরে ১৮৪৭ সালের ৩রা মে বিদ্যাসাগর লিখলেন: "আমি গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্য শিক্ষা করি এবং সেখানেই এ বিষয়গুলি সম্বন্ধে আমার মনে শ্রদ্ধা ও আগ্রহ জাগে। এই মনোভাব নিয়ে আমি এই পদের জন্য প্রার্থী হয়েছিলাম, অন্য কোনও বিশেষ উদ্দেশ্য নিয়ে নয়। যেসব দোষ ত্রুটির জন্য শিক্ষা সম্পূর্ণ ফলপ্রদ হচ্ছে না, আমি আশা করেছিলাম সেগুলি দূর করবার সুযোগ আমি পাব এবং একটি নতুন ও ভাল শিক্ষণ প্রণালী প্রবর্তন করতে পারব। কিন্তু যখন আমার সে আশা পূর্ণ হল না, উপরন্তু আমাকে অসম্মানজনক অবস্থার মধ্যে পড়তে হল, তখন আমি পদত্যাগ করাই উচিত বলে মনে করলাম।" এরপর তিনি কারণগুলি বিশদভাবে বর্ণনা করলেন। পাঠ্য বিষয়গুলির পুনর্বিন্যাস, পাঠ্যক্রমের সংশোধন, পাঠ্যপুস্তকগুলির পরিবর্তন, শিক্ষক ও ছাত্রদের মধ্যে নিয়মানু-বর্তিতা প্রবর্তন,—এইসব কার্যসূচীর মাধ্যমে তিনি ভারতীয় প্রাচীন শিক্ষা

ব্যবস্থাকে সময়োপযোগী নতুন রূপ দেওয়ার বিশেষ চেষ্টা করেছিলেন। শিক্ষা ব্যবস্থার এই সুশৃঙ্খল পুনর্বিন্যাস ছাত্রেরা ততটা অপছন্দ করে নি যতটা করেছিলেন প্রাচীনপন্থী পণ্ডিত শিক্ষকেরা। মাত্র পাঁচ বছর আগে বিদ্যাসাগর নিজেই তাঁদের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু কলেজের উন্নতির স্বার্থে তিনি তাঁর প্রাক্তন শিক্ষকদের নতুন নিয়মানুসারে চলতে বাধ্য করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করতেন না। শিক্ষকদের পক্ষে, বিশেষ করে বৃদ্ধ পণ্ডিতদের পক্ষে, সময় মত কলেজে আসা বেশ কষ্টকর ছিল। সেই প্রাচীন পণ্ডিত-দের হঠাৎ অল্প সময়ের মধ্যে আধুনিক মনোভাবাপন্ন করে তোলা খুব সহজ কাজ ছিল না। কিন্তু ছাত্রেরা এবং কয়েকজন পণ্ডিত বিদ্যাসাগর প্রিবতত নতুন নিয়মানুবর্তিতা অপছন্দ করেন নি। তাঁরা অকারণ গোলমাল না করে নতুন ব্যবস্থার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর তাঁর জবাবে এ কথারও উল্লেখ করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন: "এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে গত এক বছরের মধ্যে শিক্ষণ প্রণালীর উন্নতি হয়েছে এবং এও সত্য যে এই উন্নতি বিধানের জন্য আমি ব্যক্তিগতভাবে চেষ্টার কোনও ত্রুটি করিনি। প্রত্যেক পণ্ডিত এবং প্রত্যেক ছাত্র এ কথার প্রমাণ দেবে।"

কিন্তু কলেজের সম্পাদক তাঁর সহকারীর শিক্ষাসংস্কার পরিকল্পনা কার্যকরী করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বিদ্যাসাগর নিজেই লিখেছেন যে এই সংস্কারের উদ্দেশ্য ছিল "সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষার এমন সমন্বয় সাধন করা যাতে এই শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আমাদের দেশীয় ভাষাগুলির মধ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও সভ্যতা উপযুক্তভাবে প্রবর্তন করতে পারেন।"

পূর্ব পশ্চিমের সমন্বয় এবং দেশীয় ভাষায় পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞান প্রবর্তন করা,—এই ছিল শিক্ষার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের সবচেয়ে প্রিয় আদর্শ। মাত্র ২৫ বছর বয়সে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকরূপে তিনি সর্বপ্রথম এই প্রস্তাব করেন। এ বিষয় তাঁর প্রথম প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ সফল হয়নি সত্য, কিন্তু সে জন্য তিনি তাঁর আদর্শ পরিত্যাগ করেন নি।

তিনি কলেজ ছেড়ে গেলেন বটে, কিন্তু কিছুকাল পরেই আরো বেশী, প্রায় সর্বময় কর্তৃত্ব নিয়ে আবার সেই কলেজে ফিরে এলেন এবং তাঁর শিক্ষা বিষয়ক আদর্শকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য সক্রিয়ভাবে কাজ করতে লাগলেন।

সপ্তম অধ্যায়

শিক্ষা সংস্কারের প্রচেষ্টা

"আমি বরং আলু পটল বেচে খাব তবু আমার নীতি বিসর্জন দিয়ে কোনও প্রতিষ্ঠানে চাকরী করব না।" বিদ্যাসাগরের কয়েকজন বন্ধু যখন তাঁকে সংস্কৃত কলেজের সহকারী সম্পাদকের কাজ পরিত্যাগ করতে বারণ করেছিলেন তখন বিদ্যাসাগর এই স্পষ্ট জবাব দিয়েছিলেন। প্রায় দেড় বছর যাবৎ তিনি বেকার ছিলেন এবং এই সময় ইংরাজী ও হিন্দী ভাষা খুব ভালভাবে শিক্ষা করার চেষ্টা করেছিলেন। ১৮৪৯ সালের মার্চ মাসে তিনি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে পুনরায় যোগদান করেন, এবারে হেড রাইটার ও কোষাধ্যক্ষ হিসাবে। তাঁর মাসিক বেতন তখন আশি টাকা হল। প্রায় দু'বছর সেখানে কাজ করার পর ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে তিনি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবে পুনরায় তাঁর প্রিয় সংস্কৃত কলেজে ফিরে আসার সুযোগ পেলেন। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসে তিনি ঐ কলেজের অধ্যক্ষ নিযুক্ত হলেন।

'বেতাল পঞ্চবিংশতি' নামে তাঁর বাংলা পুস্তকের একাদশ সংস্করণের মুখবন্ধে বিদ্যাসাগর নিজে তাঁর এই নিয়োগ সম্বন্ধে লিখেছেন: ".. মদনমোহন তর্কালঙ্কার জজ পণ্ডিত নিযুক্ত হইয়া মুরশিদাবাদ প্রস্থান করিলে, সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপকের পদ শূন্য হয়। শিক্ষাসমাজে তৎকালীন সেক্রেটারি, শ্রীযুক্ত ডাক্তর মোয়েট সাহেব, আমায় ঐ পদে নিযুক্ত করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। (এই সময়ে আমি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজে হেড রাইটার নিযুক্ত ছিলাম।) আমি নানা কারণ দর্শাইয়া, প্রথমতঃ অস্বীকার করি। পরে, তিনি সবিশেষ যত্ন ও আগ্রহ প্রকাশ করাতে আমি কহিয়াছিলাম যদি শিক্ষাসমাজ আমাকে প্রিন্সিপালের

ক্ষমতা দেন, তাহা হইলে আমি এই পদ স্বীকার করিতে পারি। তিনি আমার নিকট হইতে ঐ মর্ম্মে একখানি পত্র লেখাইয়া লয়েন। তৎপরে ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে, আমি সংস্কৃত কলেজে সাহিত্য শাস্ত্রের অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হই। আমার এই নিয়োগের কিছুদিন পরে, বাবু রসময় দত্ত মহাশয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা পদ পরিত্যাগ করেন। সংস্কৃত কলেজের বর্ত্তমান অবস্থা, ও উত্তরকালে কিরূপ ব্যবস্থা করিলে, সংস্কৃত কলেজের উন্নতি হইতে পারে, এই দুই বিষয় রিপোর্ট করিবার নিমিত্ত, আমার প্রতি আদেশ প্রদত্ত হয়। তদনুসারে আমি রিপোর্ট সমর্পণ করিলে, ঐ রিপোর্ট দৃষ্টে সন্তুষ্ট হইয়া শিক্ষাসমাজ আমাকে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত করেন। সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতাকার্য্য, সেক্রেটারি ও এ্যাসিসট্যাণ্ট সেক্রেটারি, এই দুই ব্যক্তি দ্বারা নির্ব্বাহিত হইয়া আসিতেছিল, ঐ দুই পদ রহিত হইয়া, প্রিন্সিপালের পদ নূতন সৃষ্টি হইল। ১৮৫১ সালের জানুয়ারী মাসের শেষে, আমি সংস্কৃত কলেজের প্রিন্সিপাল অর্থাৎ অধ্যক্ষের পদে নিযুক্ত হইলাম।"

বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজের উন্নতি বিধানের জন্য যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন তা ১৮৫০-৫১ সালের জনশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ বিপোর্টের (জেনারেল রিপোর্ট অন পাবলিক ইনষ্ট্রাকশান) অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। দশ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই রিপোর্টের তারিখ ছিল ১৬ই ডিসেম্বর ১৮৫০। রসময় দত্তের চিঠির উত্তরে ১৮৪৭ সালের মে মাসে তিনি যেসব বিষয়ে উল্লেখ করেছিলেন এবারকার রিপোর্টে তার বিশদ বিবরণ দিলেন। তিনি প্রথমে সংস্কৃত ব্যাকরণ সম্বন্ধে কিছু কঠিন মন্তব্য করলেন। তিনি লিখলেন, "একেই সংস্কৃত ভাষা কঠিন, তার উপরে কঠিন ব্যাকরণের পাঠ দিয়ে এই ভাষা শিখতে সুরু করান আমার মতে যুক্তি-সম্মত নয়।" তিনি বললেন যে ব্যোপদেবের মুগ্ধবোধ "বিরাট বিরাট ব্যাখ্যা সত্ত্বেও অসম্পূর্ণ ব্যাকরণ" এবং এই ব্যাকরণ পড়তে গিয়ে ছাত্রদের প্রথম পাঁচটি বছর একেবারেই নষ্ট হয়। অতএব তিনি প্রস্তাব করলেন ছাত্রেরা প্রথমে বাংলা ভাষার মাধ্যমে ব্যাকরণের কতকগুলি প্রাথমিক নিয়ম শিখবে এবং তারপর

দু'তিনটি সংস্কৃত পাঠ্যপুস্তক পড়বে। অবশেষে 'সিদ্ধান্ত কৌমুদী' পড়বে এবং এই ব্যবস্থা ব্যাকরণ বিভাগের উচ্চতম শ্রেণী পর্যন্ত চলবে। বিদ্যাসাগরের মতে "সমস্ত ব্যাকরণের মধ্যে এই ব্যাকরণই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ এবং সবচেয়ে প্রামাণিক"।

তিনি সাহিত্যের পাঠ্যতালিকার বিশেষ পরিবর্তনের পক্ষপাতী ছিলেন না, তবে অলঙ্কার শাস্ত্রের জন্য কয়েকটি আরও উন্নত ধরনের পাঠ্য পুস্তকের নাম করেছিলেন। গণিত শাস্ত্র সম্বন্ধে তিনি বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের প্রস্তাব করেছিলেন। "গণিত শাখার পাঠ্য বিষয়ে বিশেষ পরিবর্তনের প্রয়োজন। বর্তমানে শ্রেষ্ঠ ইংরাজী গ্রন্থের ভিত্তিতে গণিত, বীজগণিত ও জ্যামিতির সম্পূর্ণ পাঠ্যপুস্তক সঙ্কলন করা উচিত। পরে উচ্চতর গণিতের পাঠ্যপুস্তকও ঐভাবে অনুবাদ করে রচনা করতে হবে। আমি প্রস্তাব করছি যে হারশেলের গ্রন্থের মত জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্বন্ধে বাংলায় একটি সহজবোধ্য পুস্তক সঙ্কলন করে গণিত ক্লাসে পড়ানো হোক।" স্পষ্টতঃ বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন পাশ্চাত্য গণিত শাস্ত্রের প্রবর্তন করতে, অবশ্য ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে।

স্মৃতি বা আইন সম্বন্ধে তিনি এই মত প্রকাশ করলেন যে নিধারিত ২৮টি তত্ত্বের কোন প্রয়োজন নেই, কেননা "তা পুরোহিত শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের কাজে লাগলেও শিক্ষা বিষয়ক ব্যাপারে একেবারেই নিষ্প্রয়োজন।" মনুসংহিতা, মিতাক্ষরা, বিবাদ-চিন্তামণি, দায়ভাগ, দত্তকচন্দ্রিকা প্রভৃতি যেমন ছিল তেমনি থাকবে,—এতে তাঁর কোনও আপত্তি ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের পেশার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তত্ত্ব পাঠে তাঁর আপত্তি লক্ষ্য করবার বিষয়।

এরপর তিনি ন্যায়দর্শন সম্বন্ধে মত প্রকাশ করলেন। এই দর্শনের পাঠ্যপুস্তক এবং লেখকদের সমালোচনা করে তিনি লিখলেন: "হিন্দু দর্শনশাস্ত্রের বেশীর ভাগ অংশের সঙ্গে আধুনিক প্রগতিশীল ভাবধারা মেলে না কিন্তু এ কথাও অনস্বীকার্য যে কোনো সংস্কৃতে সুপণ্ডিত ব্যক্তির এই ভাবধারার সঙ্গে পরিচয় থাকা বিশেষ প্রয়োজন।" তিনি প্রস্তাব করলেন

যে ছাত্রেরা যখন দর্শন শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে তখন তাদের ইংরাজীর জ্ঞান এমন হওয়া চাই যাতে তারা ইউরোপের আধুনিক দর্শন পড়তে পারে। তিনি বললেন : "এইভাবে তারা ভারতীয় দর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের নূতন দর্শনশাস্ত্রের তুলনামূলক বিচার করবার যথেষ্ট সুযোগ পাবে। এর ফলে তারা প্রাচীন হিন্দুদর্শনের মধ্যে যেসব ভুল আছে তা সহজেই ধরতে পারবে কারণ কেবলমাত্র ইউরোপীয় দর্শন পড়ে এই ভুল ধরা সহজ নয়। আমি যে সমস্ত প্রচলিত ভারতীয় দর্শন প্রণালী পড়ানোর প্রস্তাব করেছি তার প্রধান কারণ এই যে এর ফলে ছাত্রেরা দেখতে পাবে কি ভাবে এইসব দার্শনিক মতবাদের প্রবর্তকেরা পরস্পর পরস্পরকে আক্রমণ করেছেন এবং পরস্পরের ভুল দেখিয়ে দিয়েছেন। এই ধরনের শিক্ষালাভ করলে ছাত্রেরা নিজেরাই বিষয়টি বিচার করে গ্রহণ করতে পারবে। ইউরোপীয় দর্শন পাঠের ফলে তারা প্রচলিত দার্শনিক প্রণালীগুলির উৎকর্ষ বিশেষভাবে উপলব্ধি করতে পারবে।" প্রাচীন হিন্দুদর্শন সম্বন্ধে এই মন্তব্যগুলি করার ফলে গোঁড়া হিন্দুসমাজ বিদ্যাসাগরের রূঢ় সমালোচনা করেন, এমন কি তাঁকে বিদ্রূপ করেন। কিন্তু কিছুতেই তিনি তাঁর এই মতবাদ পরিত্যাগ করেন নি এবং শেষ পর্যন্ত শিক্ষা পরিষদকে তাঁর সংস্কারমূলক প্রস্তাবগুলি গ্রহণ করতে রাজী করিয়েছিলেন।

সে সময়ে সংস্কৃত কলেজে সমস্ত পাঠ্যবিষয়গুলির মধ্যে ইংরাজী ছিল সবচেয়ে অবহেলিত। ছেলেরা যে কি পড়বে সে সম্বন্ধে কোনও বাঁধাধরা নিয়ম ছিল না। তারা নিজেদের ইচ্ছামত পড়ত। ইচ্ছামত তারা ইংরাজী পাঠ সুরু করত আবার ছেড়ে দিত, আবার তাদের সুবিধামত নতুন করে সুরু করত। বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে প্রস্তাব করলেন যে সংস্কৃত ভাষায় কিছুটা দখল হওয়ার আগে ছাত্রদের ইংরাজী পড়তে দেওয়া হবে না এবং তারপর থেকে ইংরাজী আবশ্যিকভাবে পড়ান হবে।

এই রিপোর্ট থেকে দেখা যায় বিদ্যাসাগর একজন কত বড় শিক্ষা সংস্কারক ছিলেন। তিনি তাঁর মতবাদ স্পষ্ট করে প্রকাশ করতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেননি, যদিও তিনি জানতেন গোঁড়া ব্রাহ্মণ পণ্ডিত সমাজ তাঁর

উপরে বিশেষ ক্রুদ্ধ হবেন। কর্তৃপক্ষ তাঁর রিপোর্টের বিশেষ প্রশংসা করলেন এবং তা গ্রহণ করলেন। রসময় দত্ত পদত্যাগ করলেন। তাঁকে বলা হল বিদ্যাসাগরের উপর কার্যভার ন্যস্ত করতে "যতদিন না গভর্ণমেণ্ট পরিষদ কর্তৃক গৃহীত পরিবর্তনের প্রস্তাবগুলি অনুমোদন করেন।" এক পক্ষকালের মধ্যে বিদ্যাসাগর কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করলেন।

এরপর তিনি কলেজের উন্নতিকল্পে তাঁর সমস্ত শক্তি নিয়োগ করলেন। জাতিভেদের ভিত্তিতে কলেজে ভর্তি হওয়ার যে নিষেধ ছিল তা তিনি সর্বপ্রথমে দূর করলেন। ব্যাপারটি যখন শিক্ষা পরিষদের নজরে আনা হল তখন পরিষদ তাঁকে একটি রিপোর্ট দিতে বললেন। ১৮৫১ সালের ২০শে মার্চ তিনি এই রিপোর্ট দেন। তাঁর বক্তব্য ছিল এই যে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য শূদ্রদের চেয়ে কোনও অংশে উচ্চস্তরের মানুষ নয়, অতএব সংস্কৃত কলেজে সব জাতির ছাত্রদের প্রবেশাধিকার না থাকবার কোনও কারণ থাকতে পারে না। তিনি এও অকপটে স্বীকার করেছিলেন যে কলেজের পণ্ডিতেরা প্রায় সবাই এই উদার সংস্কার বিধানের বিরোধী ছিলেন। পরিষদকে তিনি সনির্বন্ধ অনুরোধ করলেন যাতে প্রবেশাধিকার সম্বন্ধে কড়াকড়ি না করা হয় এবং সুরুতে অন্ততঃ কায়স্থ সন্তানদের ভর্তি করবার অনুমতি দেওয়া হয়, যাতে ধীরে ধীরে সমস্ত জাতিভেদগত নিষেধ দূর হতে পারে। কলেজের পণ্ডিতেরা, যাঁরা বেশীর ভাগই বিদ্যাসাগরের শিক্ষক ছিলেন, তাঁরা ক্রুদ্ধ হয়ে এই প্রচেষ্টার বিরোধিতা করতে লাগলেন। বিদ্যাসাগর কয়েকজন সুবিখ্যাত অব্রাহ্মণ সংস্কৃত পণ্ডিতের নজীর দেখালেন। তিনি বললেন যে পণ্ডিতেরা যখন পারিশ্রমিকের বিনিময়ে ইংরাজদের সংস্কৃত শেখাতে পারেন তখন জাতি নির্বিশেষে দেশের লোকদের শেখাতে অনিচ্ছুক হবেন কেন? কলেজে সর্বজাতির ছাত্রদের প্রবেশাধিকার দিতে তিনি দৃঢ় সঙ্কল্প করেছিলেন এবং পণ্ডিতদের সাবধান করে দিয়েছিলেন যে তাঁরাও যদি সমানে তাঁর বিরোধিতা করার প্রতিজ্ঞা করে থাকেন তবে তিনি পদত্যাগ করবেন। কিন্তু ব্যাপারটা ততদূর গড়ায়নি। কর্তৃপক্ষ তাঁকে কায়স্থ

ছাত্রদের ভর্তির অনুমতি দিলেন। কিছুকাল পরে অন্যান্য জাতির ছাত্রদের ভর্তি করা হতে লাগল এবং তারা একমাত্র ব্রহ্মবিদ্যা ছাড়া সংস্কৃতের সব বিষয়ই পড়বার অনুমতি পেয়েছিল।

বিদ্যাসাগর তারপর সংস্কৃত শিক্ষার মধ্যে যে বিশৃঙ্খলা ছিল তা দূর করবার চেষ্টা সুরু করলেন। বিভিন্ন বিভাগগুলি পুনর্গঠিত করা হল। পাঠ্যপুস্তক পরিবর্তন করা হল এবং শিক্ষক ও ছাত্রদের কলেজের নিয়ম-কানুন যথাযথভাবে পালন করবার আদেশ দেওয়া হল। বিদ্যাসাগরের নতুন পরিকল্পনায় কলেজের বিশেষ উন্নতি হতে লাগল। এই উন্নতিতে পরিষদ খুশী হলেন বটে, কিন্তু ১৮৫৩ সালের মে মাসে পরিষদ কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডঃ জে. আর. ব্যালেন্‌টাইনকে দিয়ে বিদ্যাসাগর প্রচলিত নতুন সংস্কৃত শিক্ষা প্রণালী অনুমোদন করানোর ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। পরিষদের দ্বারা আমন্ত্রিত হয়ে ডাঃ ব্যালেনটাইন ১৮৫৩ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে কলকাতা সংস্কৃত কলেজ পরিদর্শন করে একটা চিঠিতে তাঁর মতামত পরিষদকে জানালেন। তাঁর একটা প্রধান বক্তব্য ছিল এই যে, যে শিক্ষাপ্রণালী কলকাতার বাঙালী ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী তা কাশীর অর্থাৎ দেশের উত্তরাঞ্চলের ছাত্রদের পক্ষে উপযোগী নাও হতে পারে। তিনি লিখলেন, "কলকাতার লোকেরা এত বেশী ইংরাজী মনোভাবাপন্ন যে এখানকার নজীর উত্তরাঞ্চলে বিভ্রম সৃষ্টি করতে পারে। আবার এর উল্টোটাও সত্য।" অতএব তাঁর মতে বিভিন্ন স্থানীয় পরিস্থিতির জন্য দু'টি প্রতিষ্ঠানের পক্ষে পৃথক পদ্ধতিতে কাজ করা ভাল। তাঁর চিঠি থেকে বুঝতে পারা যায় যে তিনি এক সঙ্গে ইংরাজী ও সংস্কৃত শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না, কারণ এর ফলে ছাত্রেরা শিখবে যে সত্য এক এবং অদ্বিতীয় নয়, দু'রকমের। তাঁর মতে এই সম্ভাবনা অলীক নয়। তিনি একটা দৃষ্টান্ত দিলেন। তাঁর সঙ্গে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পরিচয় ছিল যাঁরা সংস্কৃত ও ইংরাজী দুইই ভালভাবে জানতেন এবং মনে করতেন যে ইউরোপায় ন্যায় শাস্ত্র ঠিক। তাঁরা হিন্দু ন্যায়ও জানতেন। কিন্তু দু'য়ের মধ্যে যে মিল আছে তা এমন স্পষ্টভাবে উপলব্ধি করতে পারতেন না যাতে একের যুক্তি প্রণালী অন্য ভাষায় প্রকাশ করতে পারেন। তিনি

লিখলেন, "যাঁরা পৃথকভাবে সংস্কৃত ও ইংরাজী ভাষায় চর্চা করেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিদের মনে যদি বিভ্রম সৃষ্টি হয়ে থাকে তবে একই রকম শিক্ষাপ্রাপ্ত সাধারণ ছাত্রদের বেলায় যে এর অন্যথা হবে তা মনে হয় না।" এই সমস্যা সমাধানের জন্য তিনি কয়েকটি ইংরাজী পাঠ্যপুস্তকের নির্দেশ দিলেন যার মধ্যে হিন্দু দর্শন ও ইউরোপীয় বিজ্ঞানের মিলগুলি দেখিয়ে টীকা দেওয়া ছিল।

১৮৫৩ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে ডাঃ মউয়াটকে লেখা এক পত্রে বিদ্যাসাগর ব্যালেন্‌টাইনের মন্তব্যগুলির বিরুদ্ধে আপত্তি জানান। শিক্ষা সম্বন্ধে তিনি যত চিঠি লিখেছেন তার মধ্যে এই চিঠিটি বোধহয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে ব্যালেন্‌টাইনের কথা তিনি সম্পূর্ণভাবে মানতে পারলেন না। 'লজিক' বা যুক্তিবিদ্যা সম্বন্ধে মিলের মূল বইএর পরিবর্তে ব্যালেন্‌টাইন সুপারিশ করেছিলেন যে তাঁর নিজের লেখা মিলের লজিকের "সারাংশ" পড়ানো হোক। এই সুপারিশের অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্য এই ছিল যে মিলের মূল গ্রন্থের দাম খুব বেশী ছিল। বিদ্যা-সাগর এই প্রস্তাব মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তিনি বললেন, "আমাদের ছাত্রেরা আজকাল বেশী দাম দিয়ে উপযুক্ত মানের পাঠ্যপুস্তক কিনতে অভ্যস্ত হয়েছে। অতএব মিলের মূল বইএর মত এমন মহত্ত্বপূর্ণ পুস্তক বর্জন করার কোনও প্রয়োজন নেই।" বেদান্ত, ন্যায় ও সাংখ্য এই তিন দর্শনশাস্ত্রের জন্য ইংরাজী ভাষান্তর ও টীকা সমেত তিনখানি পাঠ্যপুস্তক পড়ানোর জন্য ব্যালেন্‌টাইন সুপারিশ করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর বললেন যে 'বেদান্তসার' ব্যতীত বাকি দু'খানি "অত্যন্ত নিকৃষ্ট স্তরের গ্রন্থ।" বিশপ বার্কলের 'ইনকোয়ারি' নামক গ্রন্থ ক্লাসে পড়ানোর জন্য ব্যালেন্‌টাইন যে প্রস্তাব করেছিলেন সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর তীক্ষ্ণ মন্তব্য করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এতে "লাভের চেয়ে লোকসানই বেশী হবে।" সাহস ও দৃঢ় প্রত্যয়ের পরিচয় দিয়ে তিনি বললেন যে সংস্কৃত কলেজে বেদান্ত ও সাংখ্য পড়াতে বাধ্য হতে হয় একমাত্র এই কারণে যে হিন্দুরা এই দুই শাস্ত্রকে অপরিসীম শ্রদ্ধা করেন। অতএব ছাত্রদের ইংরাজীর মাধ্যমেও দর্শন পড়ান দরকার। "বেদান্ত ও সাংখ্য যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে বিশপ বার্কলের 'ইনকোয়ারি' মোটামুটি সেই সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছে।

এছাড়া ইউরোপে এই গ্রন্থকে খুব প্রামাণিক দার্শনিক গ্রন্থ বলে মনে করা হয় না। অতএব এই গ্রন্থ পাঠের দ্বারা উপরি উক্ত উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। অপর পক্ষে এই বই পড়ে কলেজের হিন্দু ছাত্রেরা যখন দেখবে যে সাংখ্য ও বেদান্তের সিদ্ধান্তগুলি একজন ইউরোপীয় দার্শনিকের সমর্থন লাভ করেছে তখন এই দুই শাস্ত্রের উপর তাদের শ্রদ্ধা বেড়ে যেতে পারে।"

সত্য দ্বিবিধ, এমন একটা ধারণা হতে পারে বলে ব্যালেন্টাইন আশঙ্কা করেছিলেন তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর জবাব দিলেন, "আমার মনে হয় যদি কোনও ব্যক্তি বুদ্ধি বা উপলব্ধি সহকারে ইংরাজী ও সংস্কৃত জ্ঞানবিজ্ঞানের এবং সাহিত্যের চর্চা করেন তবে তার সত্য সম্বন্ধে ব্যালেন্টাইন বর্ণিত বিভ্রম যে ঘটবেই এমন কোনও কথা নেই। সত্য সব সময়ই সত্য, যদি অবশ্য যথাযথভাবে উপলব্ধি করা যায়। 'সত্য দ্বিবিধ' এই ধারণা সত্যের আসল রূপ সম্বন্ধে অসম্পূর্ণ উপলব্ধিজনিত। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠানে আমরা যে উন্নত ধরনের পাঠ্যক্রম গ্রহণ করেছি তার দ্বারা ঐ অসম্পূর্ণতা দূর হয়ে যাবে বলে আমি নিশ্চিতভাবে মনে করি।"

ব্যালেন্টাইন হিন্দু শাস্ত্র ও পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের মধ্যে যে মিল দেখানোর চেষ্টা করেছিলেন, সে সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর স্পষ্ট ভাষায় বললেন : "সবক্ষেত্রে যে আমরা ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য দেখাতে পারব তা বোধহয় সম্ভব নয়। যদি ধরে নেওয়া যায় যে আমরা উভয়ের মধ্যে মিল খুঁজে বের করতে পারব, তবুও ভারতীয় বিদ্বৎ সমাজকে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের উৎকর্ষ মেনে নিতে রাজী করানো অসম্ভব বলে আমার মনে হয়।" এখানে ভারতীয় "বিদ্বৎ সমাজ" বলতে তিনি প্রাচীন-পন্থী পণ্ডিতদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বললেন : "এই বিদ্বৎ সমাজের প্রভাব ক্রমশঃ হ্রাস পেয়ে যাচ্ছে ; সুতরাং এঁদের বিরোধিতায় ভয় পাওয়ার কোনও কারণ নেই। এঁদের কণ্ঠস্বর দিন দিন ক্ষীণ হয়ে আসছে। এঁরা যে এঁদের আগেকার আধিপত্য ফিরে পাবেন এমন কোনও সম্ভাবনা নেই।" সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পক্ষে সংস্কৃত পণ্ডিত সমাজ সম্বন্ধে এই ধরনের কথা বলা তখনকার দিনে অত্যন্ত ধর্মবিরোধী আচরণ বলে গণ্য হত। কিন্তু সমাজ ও শিক্ষা ব্যাপারে বিদ্যাসাগর স্পষ্ট কথা বলতে কখনও দ্বিধা করতেন না, সমালোচনা বা বিরুদ্ধতার ভয়ে পিছ পাও হতেন না।

ব্যালেন্‌টাইনের মন্তব্যের উত্তরে বিদ্যাসাগরের জবাব যে পরিষদ সম্পূর্ণ অনুমোদন করবেন না, তা অপ্রত্যাশিত ছিল না। অতএব ১৮৫৩ সালের ১৪ই সেপ্টেম্বর তারিখের কার্যবিবরণীতে পরিষদ সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষকে ব্যালেন্‌টাইন প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম অনুসরণ করবার নির্দেশ দিলেন। আরও নির্দেশ দেওয়া হল যে তিনি যেন ব্যালেন্‌টাইন সঙ্কলিত সংক্ষিপ্তসার ও অন্যান্য প্রবন্ধগুলি যথেষ্ট পরিমাণে ব্যবহার করেন, কারণ সেগুলি "বিভিন্ন বিষয় ব্যাখ্যা করার কাজে তাঁর ও তাঁর অধীন শিক্ষকদের কাছে খুব মূল্যবান হবে।" পরিষদ আরও ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে "অধ্যক্ষ যেন ক্লাসের পড়াশোনা সম্বন্ধে প্রায়ই ব্যালেন্‌টাইনের সঙ্গে যোগা-যোগ রাখেন। অধ্যক্ষের অবগতির জন্য এই কার্যবিবরণীর একটি নকল ১৮৫৩ সালের ২২শে সেপ্টেম্বর তারিখে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হল।

বিদ্যাসাগর এই ব্যাপারে খুবই মর্মাহত হলেন। যে ভাষায় তাঁকে এই নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল সে রকম ভাষা শুনতে তিনি অভ্যস্ত ছিলেন না। কলেজ তখন পূজা উপলক্ষ্যে বন্ধ হতে চলেছে এবং তিনি নিজেও দেশে যাওয়ার জন্য ব্যস্ত। কিন্তু তবুও তিনি জবাব দিলেন যে "পরিষদের নির্দেশ সম্পূর্ণ মেনে নিলে তাঁর নিজের প্রবর্তিত পাঠ্যক্রমের ব্যাপারে এমন বিঘ্ন ঘটবে যার ফলে কলেজে তাঁর অবস্থা কিছু পরিমাণে অপ্রীতিকর হয়ে উঠবে।" ব্যালেন্‌টাইনের লেখা বইগুলি পড়ানোতে তাঁর আপত্তি ছিল না, কেননা তাঁর মতে বইগুলি ভাল। কিন্তু তিনি বললেন যে "বইগুলি সম্বন্ধে তাঁর নিজের বিচার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে এবং সেগুলি তাঁর প্রতিষ্ঠানের উপযোগী কিনা একথা চিন্তা না করে তিনি যদি সেগুলি পড়াতে বাধ্য হন, তবে অধ্যক্ষ হিসাবে তাঁর আর কিছুই করার থাকে না।"

সুখের বিষয় শেষ পর্যন্ত তাঁরই কর্তৃত্ব বজায় রইল। পরিষদ তাঁর অকাট্য যুক্তি মেনে নিলেন। সংস্কৃত কলেজের শিক্ষানীতি নির্ধারণ ও সে নীতি কার্যকরী করবার জন্য পরিষদ তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দিলেন। এর ফলে সংস্কৃত ও ইংরাজী শিক্ষা উভয়ের পক্ষেই উন্নতিসাধক হল। তিনি অধ্যক্ষ নিযুক্ত হওয়ার আগে যে প্রতিষ্ঠান দ্রুত অবনতির পথে নেমে যাচ্ছিল সেই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে নতুন জীবনীশক্তি সঞ্চারিত হল। কলেজ উন্নত হল এবং সুনাম অর্জন করতে লাগল।

১৮৪৭ সালে সংস্কৃত কলেজের সম্পাদক হিসাবে বিদ্যাসাগর তাঁর শিক্ষাসংস্কারকের জীবনের প্রথম সংগ্রামে পরাজিত হন। শিক্ষা পরিষদের সঙ্গে দ্বিতীয় সংগ্রামের প্রথম পর্যায়ে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে জয়ী হলেন। কিন্তু এ ছিল সাময়িক জয়। এর ফলে যে শান্তি স্থাপিত হয়েছিল তা বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। কয়েক বছরের মধ্যে সে শান্তিতে বিঘ্ন ঘটল। শিক্ষানীতি ও পদ্ধতি সম্বন্ধে আবার পরিষদের সঙ্গে তাঁর মতভেদ হল। সে হল ১৮৫৭-৫৮ সালের ঘটনা তার ফলে ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে তিনি পদত্যাগ করলেন।

ব্যালেন্‌টাইন-বিদ্যাসাগর কাহিনীর বিশেষ উল্লেখ এই জন্য প্রয়োজন যে এর ভিতর দিয়ে আমরা আধুনিক যুগের বুদ্ধিজীবী মানব-হিতৈষী হিসাবে বিদ্যাসাগরকে বিচার করতে পারি। ইউরোপীয় সংস্কৃত পণ্ডিত ব্যালেন্‌টাইন পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও হিন্দু শাস্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগর পুরোদস্তুর বাঙালী এবং প্রাচীন ভারতীয় বিদ্যায় সুপণ্ডিত হয়েও এই সামঞ্জস্য খোঁজা নিছক ছেলেমানুষী ও ক্ষতিকর বিবেচনা করে তা সম্পূর্ণ বর্জন করতে চেয়েছিলেন।

ব্যালেন্‌টাইন প্রদত্ত যুক্তি থেকে মনে হয় তিনি তাঁদেরই একজন ছিলেন যাঁরা মনে করেন জ্ঞান বিজ্ঞানের জগতে এমন কিছু নেই যা বেদের মধ্যে পাওয়া যায় না। ইউরোপীয় প্রাচ্যবিদ্যাবিশারদদের মধ্যে উইলসন, জোন্স প্রভৃতি এই মতের দিকে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। কঠোর বাস্তব যুক্তির দ্বারা বিদ্যাসাগর ব্যালেনটাইন যে "সত্য দ্বিবিধ" বলে প্রতীয়মান হওয়ার কথা বলেছিলেন তার অসারতা প্রমাণ করে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে ব্যালেন্‌-টাইনের প্রিয় দার্শনিক বার্কলেও যে কতদূর ভ্রান্ত তাও দেখিয়ে দিলেন। এমন কি তিনি হিন্দুদের আদর্শবাদী দর্শন বেদান্ত ও সাংখ্যের সমালোচনা করতেও পিছপা হননি। তিনি যে এগুলির নিন্দা করতে চেয়েছিলেন তা নয়, তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল এগুলির অনুরূপ যে ইউরোপীয় দর্শনগুলি ছিল তাদের অসারতা প্রমাণ করা। বিদ্যাসাগর ও ব্যালেন্‌টাইন উভয়েই সংস্কৃতে প্রগাঢ় পণ্ডিত ছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য তাঁর মধ্যে নবজাগরণের স্পৃহা এনে দিয়েছিল। সিমণ্ডস্‌ এর ভাষায়, "একমাত্র

পাণ্ডিত্যই মানুষের কাছে উদঘাটিত করে দিয়েছিল মানব মনের ঐশ্বর্য, তার চিন্তাধারার মর্যাদা ও তার দূর প্রসারী কল্পনার মূল্য এবং ধর্মের নিয়ম ও অন্ধ বিশ্বাসের উপরে মানুষ হিসাবে তার পৃথক সত্তার কথা।" বিদ্যাসাগরের পাণ্ডিত্য ছিল মানবকেন্দ্রিক, ঈশ্বরকেন্দ্রিক নয়। তিনি ছিলেন খাঁটি বুদ্ধিজীবী মানবদরদী।

অষ্টম অধ্যায়

জনশিক্ষার ব্রত

কোন ভাষায় জনশিক্ষা প্রচার করা হবে, এই নিয়ে বিদ্যাসাগর বেশ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। সংস্কৃত বা ইংরাজীর মাধ্যমে এই শিক্ষা প্রচার করা সম্ভব ছিল না এ কথা বলাই বাহুল্য। ব্যালেন্‌টাইনের জবাব দিতে গিয়ে তিনি পরিষদকে লিখেছিলেন: "আজ জনসাধারণের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজন। আমাদের উচিত কতকগুলি মাতৃভাষাভিত্তিক বিদ্যালয় স্থাপন করা এবং মাতৃভাষায় শিক্ষামূলক বিষয়ে প্রয়োজনীয় পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। আমাদের উচিত এমন একদল লোককে শিক্ষিত করে তোলা যারা শিক্ষকতার দায়িত্ব গ্রহণ করবেন। এইভাবে যদি আমরা কাজ করতে পারি, তবে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে। এই ভবিষ্যৎ শিক্ষক-দের যোগ্যতা সম্বন্ধে বলা যেতে পারে যে তাদের মাতৃভাষার উপর সম্পূর্ণ দখল থাকবে, প্রয়োজনীয় বিভিন্ন বিষয় সম্বন্ধে তাদের যথেষ্ট জ্ঞান থাকবে আর তাঁরা হবেন দেশের প্রচলিত কু-সংস্কার থেকে মুক্ত। আমি এই ধরনের বিশেষ উপযুক্ত একদল লোক তৈরী করবার সিদ্ধান্ত নিয়েছি এবং এই উদ্দেশ্যে সংস্কৃত কলেজে আমাদের সর্বশক্তি নিয়োগ উকরা ।"চিতিতিনি পরিষদের কাছে আন্তরিক আবেদন জানালেন যাতে শিক্ষানীতি বিষয়ে তাঁকে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়া হয়। তিনি লিখলেন: "আমি যেভাবে সংস্কৃত পড়াতে চাই তার প্রধান উদ্দেশ্য ছাত্রেরা ভালভাবে মাতৃভাষা আয়ত্ত করতে পারবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি চাই যে তারা ইংরাজীর মাধ্যমে প্রয়োজনীয় জ্ঞান আহরণ করুক। আমি নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে এইভাবে শিক্ষা দিতে পারলে এবং পরিষদের সমর্থন ও উৎসাহ পেলে আমি অল্প কয়েক বছরের মধ্যে এমন একদল তরুণ শিক্ষক সৃষ্টি করতে পারব যাঁরা জনসাধারণের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষা ও জ্ঞান বিস্তার করবেন, যা কিনা

আপনাদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত ইংরাজী বা প্রাচ্যবিদ্যার কোনও প্রতিষ্ঠানের ছাত্রদের পক্ষে আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। আমার এই অতি প্রিয় এবং মহৎ শিক্ষাদর্শকে কার্যকরী করার জন্য আমাকে 'অবশ্যই' (এই শব্দটি ব্যবহার করার জন্য আমাকে মাপ করবেন) অনেক পরিমাণে আমার ইচ্ছামত কাজ করবার স্বাধীনতা দিতে হবে।"

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে তাঁর উদ্দেশ্য ছিল জনসাধারণের মধ্যে তাদের মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা বিস্তার করা। এই ছিল তাঁর জীবনের "মহৎ" ও "অতি প্রিয়" আদর্শ। তিনি আরও লিখেছিলেন : "সৌভাগ্যক্রমে যদি আমার প্রবর্তিত শিক্ষাপ্রণালী আমাকে অনুসরণ করতে দেওয়া হয়, তবে আমি পরিষদকে নিশ্চিতভাবে এ আশ্বাস দিতে পারি যে সংস্কৃত কলেজ যে শুধু সংস্কৃত বিদ্যার বিশুদ্ধ ও প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের কেন্দ্র হয়ে উঠবে তাই নয়, মাতৃভাষায় উন্নত ধরনের সাহিত্য সৃষ্টিরও কেন্দ্র হয়ে উঠবে।" মাতৃভাষার মাধ্যমে সমস্ত শিক্ষা, এমন কি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষা দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন বিদ্যাসাগর।

প্রাচ্যশিক্ষার পক্ষপাতী ও ইংরাজী শিক্ষার সমর্থকদের মধ্যে শিক্ষার বাহন সম্বন্ধে যে বাদানুবাদ চলেছিল ইতিপূর্বেই তার উল্লেখ করা হয়েছে। ১৮২৩ সালে যখন প্রিনসেপ, উইলসন প্রভৃতি ব্যক্তিদের নিয়ে জনশিক্ষা সম্বন্ধে সাধারণ সমিতি গঠিত হয়, তখন সে সমিতি প্রাচ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খুলতে লাগলেন এবং প্রাচ্য দেশের প্রাচীন ভাষাগুলির গ্রন্থরাজি অনুবাদ ও প্রকাশ করতে লাগলেন। ১৮২৩ সালে আমহার্ষ্টকে লিখিত এক পত্রে রামমোহন কমিটির এই নীতির তীব্র সমালোচনা করেছিলেন। তৃতীয় দশকে এই মতবিরোধ চরমে পৌঁছয়; অবশেষে তর্কটা এই নিয়ে দাঁড়ায় যে প্রাচীন প্রাচ্য ভাষার মাধ্যমে না ইংরাজীর মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে। ভারতীয় ভাষাগুলির দাবী সহজেই অগ্রাহ্য হয়ে গেল। এ ছাড়া আর একটি মতবাদ তখন বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। বলা হতে লাগল যে সমাজের উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর দিয়ে শিক্ষা ক্রমে জনসাধারণের স্তরে পৌঁছবে। কমিটির দুই দলই এ মতবাদ সমর্থন করছিলেন। এর ফলে একটি অচল অবস্থার সৃষ্টি হ'ল। সেই সময় তিনজন স্মরণীয় ব্যক্তি এই বিতর্কের মধ্যে

এসে দাঁড়ালেন,—তাঁরা ছিলেন লর্ড উইলিয়ম বেন্টিঙ্ক, মেকলে ও সুপরিচিত মিশনারী উইলিয়ম এ্যাডাম।

বাংলাদেশে শিক্ষার "বিস্তার ও উন্নতির জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্বন করা যায়" তা নির্ধারণ করার উদ্দেশ্যে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ করে এ্যাডামকে একটি রিপোর্ট দিতে বলা হল। মেকলেকে এই তর্কের একটা মীমাংসা করতে অনুরোধ করা হল। এই সম্পর্কে ১৮৩৫ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী তারিখে তিনি তাঁর বিখ্যাত "মিনিট" বা লিখিত বিবরণী প্রস্তুত করেন এবং তাঁর মধ্যে তিনি প্রাচ্যবিদ্যার পক্ষপাতীদের তীব্রভাবে আক্রমণ করে ইংরাজী শিক্ষার পরিপোষকদের সমর্থন করেন। ইতিমধ্যে বেন্টিঙ্ক এ্যাডামের মতামতের জন্য অপেক্ষা না করেই মেকলের সুপারিশ গ্রহণ করে ১৮৩৫ সালের ৭ই মার্চ তারিখে পাশ করেন যে "ভারতীয়দের মধ্যে ইউরোপীয় সাহিত্য ও বিজ্ঞান প্রচারের পরিপোষকতা করা হবে" এবং "শিক্ষার জন্য সরকার যা খরচ করবেন তা ইংরাজী শিক্ষার জন্য ব্যয় করলেই সবচেয়ে ভাল হয়।" এই মন্তব্য সত্ত্বেও এ্যাডামকে তথ্য সংগ্রহের কাজ থেকে নিরস্ত হতে বলা হ'ল না। এর থেকে প্রমাণিত হয় যে ইংরাজী শিক্ষা প্রবর্তন করা সত্ত্বেও বেন্টিঙ্ক দেশীয় শিক্ষা পদ্ধতির ব্যাপকতা ও গুরুত্ব সম্বন্ধে সচেতন ছিলেন। যথা সময়ে এ্যাডামের বিবরণী প্রকাশিত হল বটে কিন্তু তা গৃহীত হল না। সে রিপোর্ট সরকারী দলিল সংগ্রহশালায় স্থান পেল মাত্র। ইতিমধ্যে ইংরাজী শিক্ষা সম্পূর্ণ সরকারী সমর্থন পেতে লাগল।

বেন্টিঙ্কের মন্তব্য সত্ত্বেও বাদানুবাদ একেবারে থামল না। ১৮৪১ সালে অকল্যাণ্ডকে লিখিত তিনটি খোলা পত্রে এবং ১৮৫৩ সালে হাউস অব লর্ডসের (বৃটিশ পার্লামেণ্টের উর্ধতন আইন সভা) সিলেক্ট কমিটির (প্রবর সমিতি) সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে রেভারেণ্ড আলেকজাণ্ডার ডাফ, প্রাচ্যবিদ্যার সমর্থকদের তীব্র নিন্দা করেন। অকল্যাণ্ড ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা দেওয়া প্রয়োজন স্বীকার করতেন। কিন্তু তাঁর মতে উচ্চ ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে ইংরাজীর মাধ্যমে উন্নততর শিক্ষা দেওয়ার প্রয়োজন আরও বেশী ছিল। উপরোক্ত কমিটি এ্যাডামের প্রস্তাবগুলির কঠোর সমালোচনা

করে পরীক্ষামূলকভাবে মাত্র ২০টি গ্রাম্য পাঠশালা খুলবার পরিকল্পনা করলেন। কমিটির এই পরিকল্পনা সরকার অগ্রাহ্য করলেন। ১৮৪৪ সালে যখন হার্ডিঞ্জ ভারতের বড়লাট ছিলেন তখন এ্যাডামের সুপারিশগুলি কিছু পরিমাণে কাজে লাগানোর চেষ্টা হয়েছিল। ফলে গ্রামাঞ্চলে ১০১টি "হার্ডিঞ্জ বিদ্যালয়" স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু স্থানীয় শাসকদের সহায়তা না পাওয়ায় বিদ্যালয়গুলি বেশীদিন চলে নি।

কিন্তু এ্যাডামের প্রস্তাবের ফল ফলেছিল দেশের অন্য এক অঞ্চলে। আগ্রা ও অযোধ্যা অঞ্চল নিয়ে গঠিত উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেনাণ্ট গভর্নর টোমাসন "বিদেশী ভাষা বর্জন করে দেশীয় ভাষার মাধ্যমে" শিক্ষা বিস্তারের একটা প্রচেষ্টা করেছিলেন। তিনি এ্যাডামের রিপোর্টগুলির উপর খুব গুরুত্ব আরোপ করেছিলেন এবং তাঁর তৃতীয় রিপোর্টের কতকগুলি নির্বাচিত অংশ পুনরায় মুদ্রিত করে সাধারণের মধ্যে প্রচার করেছিলেন। গ্রামের বিদ্যালয়গুলিতে পড়ানোর উপযোগী পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়েছিল। তাঁর এই পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা খুবই সফল হয়েছিল বলা যেতে পারে, কেননা স্বয়ং বড়লাট এ বিষয়ে আগ্রহান্বিত হয়ে বাংলাদেশের শাসকদের ঐ ধরনের কিছু করা যায় কিনা ভেবে দেখবার জন্য নির্দেশ দিয়েছিলেন। ১৮৫৩-৫৪ সালে বাংলাদেশে ভারতীয় ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়ার একটা পরীক্ষামূলক প্রচেষ্টা সুরু হ'ল। অবশ্য টোমাসনের পরিকল্পনা অনুসারে নয়, শিক্ষা পরিষদের কাছে বিদ্যাসাগর যে পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন তারই ভিত্তিতে।

সংস্কৃত কলেজের হাতে লেখা দলিলপত্রের মধ্যে বিদ্যাসাগরের নিজের খসড়া করা একটি নোট বা সংক্ষিপ্ত মন্তব্য রক্ষিত আছে। সেটির তারিখ ১২ই এপ্রিল, ১৮৫২ এবং নাম "সংস্কৃত কলেজ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত মন্তব্য"। এর প্রথম পাঁচটি অনুচ্ছেদে বিদ্যাসাগর তাঁর নিজের যে মতামত মোটামুটিভাবে লিখে গেছেন তা ভারতের জাতীয় শিক্ষার ইতিহাসে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সেগুলি হল :

"১। যাঁদের উপর বাংলাদেশের শিক্ষার তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া হয়েছে তাঁদের প্রথম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত উন্নত ধরনের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা।

"২। যাঁরা ইউরোপীয় জ্ঞান ভাণ্ডার থেকে জ্ঞান আহরণ করে সেই জ্ঞান মার্জিত, অভিব্যক্তিপূর্ণ খাঁটি বাংলা ভাষায় প্রকাশ করতে পারবেন না, তাঁদের দ্বারা এরকম সাহিত্য সৃষ্টির কাজ সম্ভব নয়।

"৩। সংস্কৃতে সুপণ্ডিত না হলে কারো পক্ষে সুরুচিপূর্ণ, প্রকাশ-ব্যঞ্জক ও বাক্ বৈশিষ্ট্যপুর্ণ বাংলা ভাষা সৃষ্টি করা সম্ভব নয়। এই কারণে যাঁরা সংস্কৃতে সুপণ্ডিত তাঁদের ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্য ভাল করে জানা দরকার।

"৪। অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে যাঁরা শুধু ইংরাজীতে সুপণ্ডিত তাঁরা সুন্দর ও বাক্‌বৈশিষ্ট্যসম্মত বাংলা ভাষায় নিজেদের ভাব প্রকাশ করতে অক্ষম। তাঁরা ইংরাজীর দ্বারা এত বেশী প্রভাবিত যে মনে হয় পরে সংস্কৃত চর্চা করলেও সুন্দর ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ বাংলায় ভাব প্রকাশ করা তাঁদের পক্ষে সম্ভব নয়।

"৫। এর থেকে বোঝা যাচ্ছে যে সংস্কৃত কলেজের ছাত্রেরা যদি ইংরাজী সাহিত্য অধ্যয়ন করে তবে তারা উন্নত ধরনের বাংলা সাহিত্য সৃষ্টির কাজে অত্যন্ত উপযোগী হবে।"

এরপর উপরোক্ত উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সংস্কৃত কলেজে শিক্ষার ধরন কি হওয়া উচিত এ বিষয়েও বিদ্যাসাগর মন্তব্য করেছিলেন। স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে যে শিক্ষাবিদ হিসাবে তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মার্জিত ও সুরুচিপূর্ণ বাংলা সাহিত্য সৃষ্টি করা। মনে হয় বিদ্যাসাগর তদানীন্তন শিক্ষা পরিষদের সভ্য এফ. জে. হ্যালিডের অনুরোধে উপরোক্ত মন্তব্যগুলি প্রস্তুত করে-ছিলেন। হ্যালিডে ১৮৫২ সালের জুন মাসে বিদ্যাসাগর প্রণীত প্রস্তাবগুলি পরিষদের কাছে পেশ করার সময় মন্তব্য করেন: "অধ্যক্ষের সঙ্গে আমার অনেক আলোচনার ফলস্বরূপ এই প্রস্তাবগুলি তৈরী হয়েছে এবং আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি অনুসারে মনে হয় এগুলি সযত্নে বিবেচনা করে দেখার উপযুক্ত।" ভারতীয় ভাষায় শিক্ষা বিস্তারের জন্য কোন পথ অবলম্বন করা হবে সে সম্বন্ধে হ্যালিডে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণীতে তাঁর অভিমত জানান। তিনি বলেন: "বাংলাদেশে বহু সংখ্যক দেশীয় বিদ্যালয় আছে······আমাদের

উদ্দেশ্য হবে যতদূর সম্ভব এগুলির উন্নতি সাধন করা। এ বিষয়ে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশসমূহের লেফটেনাণ্ট গভর্নর যা করেছেন আমাদের সেই পথ অনুসরণ করাই সবচেয়ে ভাল। অতএব আমাদের উচিত দেশীয় বিদ্যালয়গুলির সামনে কতকগুলি আদর্শ স্কুল স্থাপন করা এবং নিয়মিত স্কুল প্রদর্শনের ব্যবস্থা করা। এরফলে দেশীয় স্কুলের শিক্ষকেরা আদর্শ স্কুলগুলির অনুসরণ করতে উদ্বুদ্ধ হবে।"

বিদ্যাসাগরের মন্তব্যের উপর মত প্রকাশ করে তিনি বলেন: "আমি এই সঙ্গে একটি স্মারকলিপি সংযুক্ত করে দিচ্ছি। এই স্মারকলিপি প্রস্তুত করেছেন সংস্কৃত কলেজের সুদক্ষ ও উৎসাহী অধ্যক্ষ। একথা সুবিদিত যে তিনি দেশীয় শিক্ষার উন্নতি সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহশীল। শুধু তাই নয়, সংস্কৃত কলেজে উন্নত ধরনের শিক্ষাপ্রণালী প্রবর্তন করে এবং নিজে কয়েকখানি প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক রচনা করে দেশীয় শিক্ষার উন্নতি সাধনের জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করেছেন। এই স্মারকলিপিতে অধ্যক্ষ যে পরিকল্পনা পেশ করেছেন সাধারণভাবে আমি তা সমর্থন করি এবং এই পরিকল্পনা কার্যে পরিণত হোক এই আমার ইচ্ছা।"

১৮৫৪ সালের মে মাসে হ্যালিডে বাংলার প্রথম লেফটেনাণ্ট গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি বিদ্যাসাগরের একজন প্রধান গুণগ্রাহী ছিলেন। সুতরাং তিনি বিদ্যাসাগরের শিক্ষানীতির রূপায়ণে বিশেষ সহায়তা করেছিলেন। কিন্তু বিদ্যাসাগরের উপর সমস্ত আদর্শ স্কুলগুলির তত্ত্বাবধানের ভার দেওয়া সম্বন্ধে পরিষদে বিশেষ আপত্তি উঠেছিল। বিদ্যাসাগরের কর্মদক্ষতা সম্বন্ধে কারও কোনও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু বিরোধী দলের যুক্তি ছিল এই যে একজন ব্যক্তি যতই কর্মদক্ষ হোন না কেন তাঁর উপর এত বড় দায়িত্ব দেওয়া উচিত নয়। হ্যালিডে জানতেন যে এটাই বিরুদ্ধতার একমাত্র কারণ ছিল না। অতএব তিনি শেষ পর্যন্ত নিজের মত অনুসারে চললেন।

১৮৫৩-৫৪ সালে পরিষদ এবং গভর্নমেণ্ট শিক্ষাবিষয়ক কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার নিয়ে ব্যাপৃত ছিলেন। তাঁরা তখন কলকাতা মাদ্রাসার সংস্কার ও প্রেসিডেন্সী কলেজ প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা বন্দোবস্ত নিয়ে ব্যস্ত।

কোর্ট অব ডিরেক্টারস দ্বারা ১৮৫৪ সালের জুলাই মাসের সুবিখ্যাত শিক্ষা-সম্বন্ধীয় ডেসপ্যাচ্ বা বিবরণী প্রকাশিত হল। এরফলে ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে শিক্ষা পরিষদ ভেঙ্গে দিয়ে একটি শিক্ষা বিভাগ গঠিত হল। উইলিয়ম গর্ডন ইয়ং নামে একজন সিভিলিয়ান কর্মচারী প্রথম জনশিক্ষা অধিকর্তা নিযুক্ত হলেন। বিদ্যালয়গুলিকে সরকারী সাহায্য দানের নীতি গৃহীত হল। ১৮৫৫-৫৬ সালে একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের পরিকল্পনা করা হল। একে বিধিসম্মত রূপ দেওয়া হল ১৮৫৭ সালের দ্বিতীয় আইন অনুসারে।

সেই বিক্ষোভময় পরিবর্তনের যুগে ভারতীয় ভাষাগুলির উন্নতি সাধনকে শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য করার কথা হয়ত সহজেই অগ্রাহ্য হয়ে যেত। কিন্তু তা হতে পারেনি হ্যালিডের দৃঢ় প্রচেষ্টা এবং বিদ্যাসাগরের অনুপ্রেরণার জন্য। ১৮৫৪ সালের ১৬ই নভেম্বর তারিখে লিখিত একটি পত্রের সঙ্গে আণ্ডার সেক্রেটারী হজ্‌সন্ প্র্যাট্ "বাংলা প্রদেশের দক্ষিণাঞ্চলে দেশীয় শিক্ষা" নামে হ্যালিডে রচিত পরিকল্পনা ভারত সরকারের কাছে পাঠিয়ে দেন। হ্যালিডে প্রস্তাব করেছিলেন যে বাংলা প্রেসিডেন্সীর কোনো কোনো জেলায় এই পরিকল্পনা কার্যকরী করতে হলে বিদ্যাসাগরের মত একজন অত্যন্ত কর্মকুশল ব্যক্তির উপর দায়িত্ব দেওয়া উচিত। ১৮৫৫ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারী ভারত সরকারের সচিব সিসিল বিডন এর জবাবে লিখলেন: "আপনি যদি বিবেচনা করেন যে এতে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ হিসাবে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মার গুরুদায়িত্বের কোনও ব্যাঘাত হবে না তবে তাঁকে মাঝে মাঝে দেশীয় বিদ্যালয়গুলি পরিদর্শন করতে দেওয়াতে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল বাহাদুরের কোনও আপত্তি হবে না। কিন্তু কোর্ট অব ডিরেক্টরস এর মত অনুসারে তাঁকে দেশীয় বিদ্যালয়গুলির অধীক্ষক নিযুক্ত করা যায় না, কেননা এ কাজের দায়িত্ব এখন শিক্ষা অধিকর্তার এবং তাঁর অধীনে নিযুক্ত পরিদর্শকদের।"

হ্যালিডে এই জবাবে সন্তুষ্ট হলেন না। নতুন শিক্ষা অধিকর্তাকে জানিয়ে দেওয়া হল যে বিদ্যাসাগরের আন্তরিক সহযোগিতা ব্যতীত বাংলা দেশে দেশীয় শিক্ষার উন্নতি করা সম্ভব নয়। শিক্ষা অধিকর্তা প্রস্তাব

করলেন যে বিদ্যাসাগরকে সাময়িকভাবে বিদ্যালয়গুলির পরিদর্শক নিযুক্ত করা হোক। কিন্তু লেফটেনাণ্ট গভর্ণর এই প্রস্তাবে বিশেষ আপত্তি করলেন। তিনি সম্পূর্ণভাবে জানতেন যে পণ্ডিত দৃঢ়প্রত্যয়বিশিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন এবং তিনি সাময়িকভাবে কাজ চালাবার জন্য এই গুরু দায়িত্ব নিতে রাজী হবেন না। এ ছাড়া তাঁর নিজের কাজে উপরওয়ালার হস্তক্ষেপও সহ্য করবেন না এবং কোনও ভাল কাজ নিরুৎসাহজনকভাবে করাও তাঁর স্বভাব ছিল না। লেঃ গভর্ণর বললেন যে, যে মহৎ কাজে বিদ্যাসাগর নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছেন, সেই কাজে যদি গভর্ণমেণ্ট তাঁর সাহায্য না নেন তবে তা বিশেষ দুঃখের বিষয় হবে।

অবশেষে শিক্ষা অধিকর্তা তাঁর নিজের মত পরিবর্তন করলেন। বিদ্যাসাগরকে স্কুলগুলির সহকারী পরিদর্শক নিযুক্ত করা হল এবং এর জন্য ১৮৫৫ সালের মে মাস থেকে মাসিক ২০০ টাকা হিসাবে তাঁর অতিরিক্ত বেতন ধার্য করা হল। এরপর থেকে এক বছর পর্যন্ত সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ছাড়া বিদ্যাসাগর নদীয়া, বর্ধমান, হুগলী, মেদিনীপুর ও ২৪ পরগণা জেলাগুলি পরিভ্রমণ করেন। তিনি ২০টি গ্রামে ২০টি আদর্শ বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু শীঘ্রই দেখা গেল যে জনসাধারণ ঐ বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে উদাসীন। বিশেষ করে যে সব জায়গায় মধ্যবিত্ত শ্রেণী প্রবল সে সব স্থানে স্কুলগুলি সম্বন্ধে শুধু ঔদাসীন্য নয়, অবিশ্বাস ও বিরুদ্ধতা দেখা যেতে লাগল।

বিদ্যাসাগরের এই মহৎ চেষ্টা যে ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল তার অনেকগুলি কারণ ছিল। তার মধ্যে একটি ছিল সরকারের পক্ষ থেকে উপযুক্ত সমর্থনের অভাব। প্রধান কারণ অবশ্য ছিল এই যে মধ্যবিত্ত বাঙালী অভিভাবকেরা মাইনে দিয়ে বিশুদ্ধ দেশীয় শিক্ষার জন্য এই সব বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের পাঠাতে রাজী ছিলেন না। শুধু কলকাতা শহরে নয়, গ্রামাঞ্চলেও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ততদিনে বেশ বুঝতে পেরেছিলেন যে সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ইংরাজী শিক্ষা ছিল অত্যন্ত সম্ভাবনাপূর্ণ। আর গ্রামের জনসাধারণের কথা যদি ধরা যায় তবে তারা কোনও শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধেই সচেতন ছিল না,—তা ভারতীয় ভাষার মাধ্যমেই হোক বা ইংরাজীর মাধ্যমেই হোক।

অতএব বিদ্যাসাগর খুব বেশীদিন তাঁর পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ করতে পারলেন না। বলা বাহুল্য তাঁর সময় ও শক্তি অপরিসীম ছিল না এবং স্ত্রী শিক্ষা, সমাজ সংস্কার প্রভৃতি অন্যান্য অনেক বিষয়ে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। সুতরাং সাময়িকভাবে তাঁর জীবনের এই "অতি প্রিয় আদর্শ" অনুযায়ী কাজ বন্ধ রাখতে হল। অন্তত বাংলাদেশে ইংরাজী শিক্ষার বুনিয়াদ বেশ শক্ত হয়ে গড়ে উঠেছিল, কেননা উচ্চ এবং মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই শিক্ষার ভিতর দিয়ে সমাজে উন্নততর স্থান এবং আর্থিক সুবিধা লাভ করছিল। বিদ্যাসাগর দেখলেন যে দেশীয় শিক্ষার পরিকল্পনা চালু করা অসম্ভব ব্যাপার। বিদ্যাসাগরের দৃষ্টিভঙ্গী সমসাময়িক যুগের তুলনায় অনেক অগ্রগামী ছিল: দেশীয় শিক্ষা চালু করার উপযুক্ত সময় তখনও আসেনি।

নবম অধ্যায়

স্ত্রী শিক্ষার সমর্থনে

ছেলেদের সম্বন্ধে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা অবলম্বনের অনেক পরে গভর্ণমেণ্ট স্ত্রী শিক্ষার দিকে নজর দেন। তখনকার দিনে স্ত্রী শিক্ষার ভার নিয়েছিলেন কয়েকজন ব্যক্তি বিশেষ এবং কয়েকটি বেসরকারী সংস্থা। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কোর্ট অব ডাইরেক্টরস বা স্থানীয় গভর্ণমেণ্ট কেউই তাঁদের কোনও শিক্ষাবিষয়ক বিবরণীতে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে কোনও উল্লেখ করেন নি। সরকারী সমর্থনের অভাবে স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে ব্যক্তি বিশেষের এবং বিদেশী ধর্মযাজকদের উৎসাহ কার্যকরী হতে পারে নি।

১৮৩২ সালের জুলাই মাসে পার্লামেণ্টে সিলেক্ট কমিটির সামনে সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তিনেভেলীর বালিকা বিদ্যালয়ের উন্নতি সম্বন্ধে রেভারেণ্ড জেমস্ হাফ্ বলেন : "এই স্কুলগুলি সম্বন্ধে বিশেষভাবে লক্ষ্য করবার বিষয় হ'ল এই যে বহুদিন পর্যন্ত এই ধারণা ছিল যে স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে হিন্দুদের রাজী করান অসম্ভব।" মাদ্রাজের রেভারেণ্ড জে. টাকারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, "ভারতীয়েরা স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে নিজেরা কি প্রচেষ্টা করেছে?" উত্তরে তিনি বলেন, "তারা কোনও চেষ্টাই করেনি, কেননা তারা সকলেই স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী।" এই রকম প্রশ্নের উত্তরে বোম্বাই এর উইলিয়ম জেকব বলেছিলেন, "ভারতের পশ্চিম অঞ্চলে এ বিষয়ে কোনও প্রচেষ্টা হয়নি। ভারতে একজন স্ত্রীলোকও গভর্ণমেণ্ট প্রবর্তিত শিক্ষার সুবিধা গ্রহণ করেছে কিনা সন্দেহ।"

বস্তুতপক্ষে ১৮৪৯-৫০ এর আগে দেশের কোনও অঞ্চলেই সরকারী পরিকল্পনার মধ্যে কোথাও স্ত্রী শিক্ষার স্থান ছিল বলে জানা যায় না। এ কথা অস্বীকার করা যায় না যে সে যুগে হিন্দু মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের

মধ্যেই বহুদিনের সংস্কারের ফলে স্ত্রী শিক্ষার বিরুদ্ধে একটা প্রবল বিরোধিতা ছিল। একথা সত্য যে ভারতের প্রাচীন সাহিত্যে এমন অনেক নজীর আছে যা থেকে বোঝা যায় যে পুরাকালে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের সঙ্গে ধর্ম ও দর্শন সম্বন্ধে আলোচনা করতেন, রাষ্ট্রীয় ব্যাপারে অংশ গ্রহণ করতেন, বীরত্বমূলক কাজ করতেন এবং লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পেতেন। কিন্তু এ থেকে প্রমাণিত হয় না যে পুরাকালে বা মধ্যযুগে ভারতীয় স্ত্রীলোকদের অধিকারগতভাবে শিক্ষালাভের সুযোগ ছিল। ভারতীয় স্ত্রীলোকদের, বিশেষ করে হিন্দু স্ত্রীলোকদের জীবনাদর্শ ছিল বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে স্নেহময়ী মাতা ও অনুরক্ত পত্নী হিসাবে নিশ্চিন্ত মনে শুদ্ধ গার্হস্থ জীবন যাপন করা। তখনকার দিনে কোম্পানীর শাসক শ্রেণী দেশের প্রচলিত প্রাচীন প্রথার উপর জোর করে হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না। শাসনকর্তাদের এই ঔদাসীন্যের জন্য স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে প্রথম পথপ্রদর্শকদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল।

১৮৪৯ সালের মে মাসে কলকাতায় বেথুন বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন পর্যন্ত স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণী এখানে দেওয়া হচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্বয়ং সুরু থেকেই এই বেথুন বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। অনেক পূর্বে অর্থাৎ ১৮১৯ সালে ব্যাপটিষ্ট মিশনারীদের সহায়তায় কলকাতায় ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি বা বালিকা সমিতি নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল "বাংলা দেশে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার করা।" ১৮২১ সালে মিস কুক (ইনি মিসেস উইলসন নামে সমধিক পরিচিত) বৃটিশ ও বিদেশী বিদ্যালয় সমিতির (বৃটিশ এ্যাণ্ড ফরেন স্কুল সোসাইটি) দ্বারা কলকাতায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করবার জন্য প্রেরিত হন। ১৮২৪ সালে "দি লেডিজ সোসাইটি ফর নেটিভ ফিমেল এডুকেশান" বা দেশীয় স্ত্রীলোকেদের শিক্ষা সমর্থক মহিলা সমিতি স্থাপিত হয়। এর উদ্দেশ্য ছিল কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের বালিকা বিদ্যালয়গুলি যাতে পরস্পরের সঙ্গে যোগসূত্র রেখে কাজ করতে পারে তার ব্যবস্থা করা। একটা কেন্দ্রীয় স্কুল স্থাপন করার উদ্দেশ্যও এই সমিতির ছিল। সমিতির মহিলা পৃষ্ঠপোষক লেডী আমহার্ষ্ট এই স্কুলের ভিত্তি স্থাপন করেন ১৮২৬ সালের ১৮ই মে তারিখে। লণ্ডন ও চার্চ মিশনারী সমিতিগুলি

দ্বারা আরও কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট তখনও এইসব প্রথম প্রচেষ্টাকারীদের কোনও ভাবেই কোনও উৎসাহ দেন নি। মিশনারীদের প্রচেষ্টাও সফল হয় নি, কারণ তারা স্কুলগুলিকে ধর্ম প্রচারের কাজে ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন। এমন কি তথাকথিত "জেনানা এ্যাণ্ড সিলেক্ট স্কুল স্কীম" অর্থাৎ মহিলামহল ও নির্বাচিত স্কুল পরিকল্পনাও সফল হতে পারেনি, কেননা ধনী বাঙালী পরিবারের মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য যে সব ইউরোপীয় গৃহশিক্ষিকা রাখা হত, তাঁরা লেখা-পড়া শেখানোর চেয়ে খৃষ্টধর্ম প্রচার সম্বন্ধে বেশী মনোযোগী ছিলেন। এই পরিকল্পনা অনুসারে তিন পর্যায়ে শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। প্রথম স্তরে শিক্ষিকারা নিজেরা গিয়ে কোনও এক ভদ্রলোকের বাড়ীর অন্দরমহলে বসে সেই বাড়ীর স্ত্রীলোকদের শিক্ষা দিতেন। দ্বিতীয় পর্যায়ে কয়েকটি প্রতিবেশী পরিবারের মহিলারা কোনও নিদিষ্ট স্থানে একত্রিত হয়ে শিক্ষা গ্রহণ করতেন। আর তৃতীয় পর্যায়ে ছিল বিদ্যালয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা। এই পরিকল্পনা মাত্র আংশিকভাবে কার্যকরী হয়েছিল।

রাজা রামমোহন রায়, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা বৈদ্যনাথ দেব প্রভৃতি পথপ্রদর্শকেরা এবং হিন্দু কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকেরা স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে যে কাজ করেছিলেন তা মিশনারীদের প্রচেষ্টার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ ছিল। ১৮৪৯ সালের মে মাসে কলকাতায় বেথুন কলেজের প্রতিষ্ঠা ভারতে স্ত্রী শিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। তখন থেকে শুধু শাসক শ্রেণী নয়, শিক্ষিত ও প্রতিপত্তিশালী হিন্দুরাও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আন্তরিক ও সক্রিয় আগ্রহ বোধ করতে লাগলেন। শোভাবাজার রাজপরিবারের রাজা রাধা-কান্ত দেব সামাজিক ব্যাপারে বরং রক্ষণশীল মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু বেথুন স্কুল খুলবার ১৫ দিনের মধ্যেই তিনি শোভাবাজারে নিজের বাড়ীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। ১৮৪৯ সালের আগষ্ট মাসে জয়-কৃষ্ণ ও রাজকৃষ্ণ মুখার্জি উত্তরপাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় খোলা সম্বন্ধে শিক্ষা পরিষদকে একটি পত্র দেন। এইভাবে অন্যান্য অনেক জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় খোলা শুরু হয়।

এই বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা যত বাড়তে লাগল গোঁড়া হিন্দুদের বিরুদ্ধতাও তত উগ্র আকার ধারণ করতে লাগল। যাঁরা এই মহৎ কাজে

অগ্রণী হয়েছিলেন তাঁদের সম্বন্ধে নানারূপ কুৎসা রটনা সুরু হল। এই উৎসাহী পথপ্রদর্শকদের কেউ কেউ প্রকাশ্যভাবে প্রহৃতও হয়েছিলেন। কিন্তু বেথুন ও ডালহাউসী উভয়েই স্ত্রী শিক্ষার উন্নতিবিধানে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন। তাঁরা এই বিরুদ্ধতাকে বেশী আমল দিলেন না।

জে. ই. ডি. বেথুনের মত এমন সহৃদয় পরোপকারী ইংরাজ ভারতে খুব কমই এসেছিলেন। ইংলণ্ডে থাকবার সময় তিনি শিক্ষাবিস্তারের মহান আন্দোলনে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেছিলেন। অতএব ভারতে পদার্পণ করেই তিনি শিক্ষার কাজে মনোনিবেশ করলেন। ফলে অল্পদিনের মধ্যেই তিনি শিক্ষা পরিষদের সভাপতি নিযুক্ত হলেন। ডালহাউসীকে লেখা এক পত্রে তিনি এই অনুরোধ জানালেন যে ভারত গভর্ণমেণ্ট যেন এই মর্মে একটি বিজ্ঞপ্তি দেন যে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে সমস্ত বেসরকারী প্রচেষ্টায় সরকারী সমর্থন আছে। ডালহাউসী অবিলম্বে এই অনুরোধ মেনে নিলেন। ১৮৫০ সালের ১১ই এপ্রিল তারিখে তাঁর সেই বিখ্যাত বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হল যা নাকি ভারতের স্ত্রী শিক্ষার ইতিহাসে সরকারী সনদ বা ফারমানের মর্যাদা লাভ করেছে। সেই বিজ্ঞপ্তি মারফৎ জনসাধারণকে জানিয়ে দেওয়া হল যে যাঁরা স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে ব্রতী আছেন তাঁদের সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্ট সহানুভূতিশীল।

প্রথম থেকেই বেথুন এই মহান উদ্দেশ্য সাধনে বিদ্যাসাগরকে সঙ্গীরূপে পেয়েছিলেন। শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হিসাবে তিনি পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের গুণের পরিচয় পেয়েছিলেন। তাঁর অনুরোধে ১৮৫০ সালের ডিসেম্বর মাসে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বেথুন স্কুলের অবৈতনিক সম্পাদকের পদ গ্রহণ করলেন। বেথুন এবার তাঁর স্কুল সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হলেন, কেননা তাঁর প্রতিষ্ঠানটি এমন এক ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত হল যাঁর সাহস, সততা ও একাগ্রতা ছিল অবিসংবাদিত।

"ইয়ং বেঙ্গল" নামে পরিচিত ডিরোজিও শিষ্যেরা স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে বিশেষভাবে সচেষ্ট ছিলেন। লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, এমন কি সংস্কৃত

কলেজের কয়েকজন পণ্ডিতও স্ত্রী শিক্ষা সমর্থন করেছিলেন। ১৮৫০ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে ডালহাউসীকে লেখা বেথুনের এক বিখ্যাত পত্র থেকে তা জানা যায়। বেথুন লিখেছিলেন: "মাননীয় লর্ড মহোদয়ের জানা আছে যে গত বৎসর মে মাসে কলকাতায় আমি এ দেশীয় বালিকাদের জন্য একটি স্কুল খুলি। কেন যে আমি নিজের দায়িত্বে এই পরীক্ষামূলক কাজটি করেছি তা তখন আপনাকে জানিয়েছিলাম এবং আপনার অনুমোদন পেয়ে আমি নিজেকে সম্মানিত বোধ করেছিলাম। আমার ধারণা যে এদেশীয় শিক্ষাব্যবস্থায় আমি যে নতুন ধারা প্রবর্তন করেছি তা সফল হবে। আমি ভারত সভার (কাউন্সিল অব ইণ্ডিয়া) সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকায় এবং শিক্ষাপরিষদের সভাপতি হওয়ায় আমার উপরোক্ত ধারণা সত্য কিনা তা পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখার কতকগুলি বিশেষ সুবিধা ছিল। আমি চেয়েছিলাম যে যদি কোনমতে আমার ধারণা ভুল প্রমাণিত হয়, তবে তার জন্য দুর্নামের ভাগী যেন আমিই হই এবং যতক্ষণ না আমার পরীক্ষা নিরীক্ষা সফল হচ্ছে ততক্ষণ আমি গভর্ণমেণ্টকে এর সঙ্গে জড়াতে চাই নি।

"সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েদের মিশনারী স্কুলে ভর্তি করবার চেষ্টা বার বার ব্যর্থ হয়েছে। ফলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে যে একমাত্র সরকারী স্কুলের ভিতর দিয়েই সারা দেশে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হতে পারে। সেইজন্য আমি আমার স্কুলে ধর্ম সম্বন্ধে কোনও রকম শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা রাখিনি, অবশ্য তার ফলে যে ভাল শিক্ষয়িত্রী পাওয়া কঠিন হবে সে বিষয়ে আমি সুচেতন ছিলাম। যে সব পিতামাতা তাঁদের মেয়েদের ইংরাজী শিক্ষা দিতে চান কেবলমাত্র সেইসব মেয়েদেরই সে শিক্ষা দেওয়া হবে। সকলকেই বাংলার মাধ্যমে শিক্ষা দেওয়া হবে এবং সেই সঙ্গে সাধারণ ও সৌখীন হাতের কাজও শেখানো হবে।

"আমার স্কুলটি চালু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে যে খুব উত্তেজনা সৃষ্টি হবে তা আমি পূর্বেই অনুমান করেছিলাম। তখন আমার স্কুলে মাত্র ২১টি ছাত্রী ছিল। কলকাতার অত্যন্ত প্রভাবশালী দেশীয় বাসিন্দাদের

মধ্যে অনেকেই আমার স্কুলের বিরুদ্ধাচারণ করেছিলেন। অবশ্য এই বিরুদ্ধতার প্রধান কারণ ছিল এই যে আমি তাঁদের সঙ্গে কোনো পরামর্শ করিনি। এতে তাঁদের আত্মাভিমানে আঘাত লেগেছিল। অনেক ভেবে চিন্তেই আমি তাঁদের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত বিবেচনা করিনি। অপর পক্ষে, যাঁরা আমার পরিকল্পনা সমর্থন করতেন তাঁরা আমাকে উৎসাহ দিতে দ্বিধা করেন নি।

"তিনজন দেশীয় ব্যক্তি আমাকে বিশেষ সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের প্রতি আমার কৃতজ্ঞতা জানানো উচিত। তাঁদের মধ্যে একজন হলেন বাবু রামগোপাল ঘোষ। তিনি প্রথমদিকে আমার উপদেষ্টা ছিলেন এবং সর্বপ্রথমে আমার স্কুলের ছাত্রী সংগ্রহ করার ব্যাপারে আমাকে সাহায্য করেছিলেন। আর একজন হলেন বাবু দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়। এঁর সঙ্গে আমার আগে পরিচয় ছিল না। কিন্তু আমার স্কুল সম্বন্ধীয় পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইনি এসে আমার সঙ্গে পরিচয় করেন এবং শহরের দেশীয় লোকদের বসতি অঞ্চলে স্কুলের জন্য বিনামূল্যে পাঁচ বিঘা জমি দিতে চান যার বাজার দর দশ হাজার টাকা হবে। তৃতীয় ব্যক্তি ছিলেন সংস্কৃত কলেজের অন্যতম পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কার। তিনি যে শুধু তাঁর দুই মেয়েকে আমার স্কুলে ভর্তি করিয়ে দিয়েছিলেন তাই নয়, তিনি প্রতিদিন বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের বিনা পারিশ্রমিকে বাংলা পড়াতেন এবং অবসর সময়ে বিশেষ করে তাদের উপযোগী কয়েকখানি প্রাথমিক বাংলা পাঠ্যপুস্তক লিখে দিয়েছিলেন। আমার বন্ধুবান্ধবদের উপর নানারকম উৎপাৎ ও নির্যাতন করা হত যাতে তাঁরা আমাকে সাহায্য না করেন। ফলে এমন অবস্থা হল যে স্কুলের ছাত্রী সংখ্যা ক্রমশঃ কমতে কমতে সাতে গিয়ে দাঁড়াল এবং এক সময়ে তিন চারজনের বেশী ছাত্রী স্কুলে উপস্থিত হত না……।

"আমার মতে স্ত্রী শিক্ষাকে সম্পূর্ণ সফল করতে হলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে সমর্থন জানিয়ে একটা ঘোষণা দেওয়ার সময় এসেছে। শিক্ষার জন্য গভর্ণমেণ্ট যা কিছু করেছেন তারপরে জনসাধারণকে বোঝা-

নোর জন্য যে আদৌ এমন একটি ঘোষণার প্রয়োজন আছে একথা অবিশ্বাস্য মনে হতে পারে। কিন্তু স্ত্রী শিক্ষার বিরোধীরা নানা রকম নির্লজ্জ ছল ছুতায় বাধা সৃষ্টি করছে এবং তার মধ্যে একটি অজুহাত হচ্ছে এই যে গভর্ণমেণ্ট স্বয়ং শুধু স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে উদাসীন নন্, এর বিরোধীও বটেন। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে যাঁরা স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী হয়েছেন তাঁরা যদি একাজে কিছু উৎসাহ না পান তবে এইসব ভ্রান্ত রটনার ফল ফলবেই, নতুবা আমার ইচ্ছা ছিল যে আমার বিদ্যালয়কে সম্পূর্ণ সফল করবার জন্য আরও কিছুদিন গভর্ণমেণ্টের সাহায্য না নিয়ে আমি একাই কাজ করে যাব। আমি মাননীয় লর্ড মহোদয়কে এ কথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি যে আমি যে প্রস্তাব করেছি তার পিছনে বহুলোকের সমর্থন আছে এবং এই প্রস্তাব যদি অবিলম্বে গ্রহণ করা না হয়, তবে একটা আশাভঙ্গের আবহাওয়া সৃষ্টি হতে বাধ্য। গভর্ণমেণ্ট স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে সমর্থন ঘোষণা করলে তার বিরোধিতা হবে এমন আশঙ্কা করার কোনও কারণ নেই। স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা যতই প্রবল হোক না কেন মেডিকেল কলেজ স্থাপনের সময় জনমত যে পরিমাণে উগ্র হয়ে উঠেছিল এখন ততটা নয়। এই পরিকল্পনা সম্পূর্ণভাবে কার্যে পরিণত করলে যে সামাজিক সুফল ফলবে দেশের অন্য কোনও প্রতিষ্ঠান থেকেই তা আশা করা যায় না...।"

রামগোপাল ঘোষকে বেথুন তাঁর চিঠিতে "সুপরিচিত ব্যবসায়ী" এবং তাঁর "প্রধান উপদেষ্টা" বলে উল্লেখ করেছিলেন। রামগোপাল ছিলেন ডিরোজীয় শিষ্যদের মধ্যে অগ্রণী। তাঁকে বলা হত বাঙ্গালী বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে প্রধান, তিনি ছিলেন সুবিখ্যাত "এডু-রাজ" অর্থাৎ "শিক্ষিত বাঙ্গালীদের রাজা"। শুধু তাই নয়, তিনি ছিলেন অসাধারণ বাগ্মী এবং সে যুগের একজন জননেতা। শিক্ষা, বাণিজ্য, রাজনীতি সম্বন্ধীয় এমন কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না যার সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন না। তবে তিনি শিক্ষা সম্বন্ধেই বেশী আগ্রহশীল ছিলেন। শিক্ষা পরিষদের প্রাক্তন সম্পাদক ডঃ মউয়াট বলেছিলেন : "শিক্ষাক্ষেত্রে প্রথমদিকে আমি যত কাজ করেছি তার সবগুলির সঙ্গে তিনি (রামগোপাল) জড়িত ছিলেন।" দক্ষিণারঞ্জন ছিলেন "জমিদার"। তিনিও ডিরোজীয় শিষ্যদের

মধ্যে অন্যতম প্রধান ছিলেন এবং সমস্ত রকমের প্রগতিশীল সংস্কারমূলক প্রচেষ্টার সমর্থক ছিলেন। মদনমোহন তর্কালঙ্কার ছিলেন বিদ্যাসাগরের নিকট বন্ধু। মদনমোহনও তাঁর মহানুভব বন্ধুর চেয়ে সমাজ ও শিক্ষা সংস্কার ব্যাপারে কোনও অংশে কম উৎসাহী ছিলেন না। ১৮৫০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে "সর্বশুভকরী পত্রিকা" নামে এক সাময়িক পত্রে মদনমোহন স্ত্রী শিক্ষা সমর্থন করে একটি সুদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধে তিনি বলেন যে, সে সময়ে বেথুন তাঁর বালিকা বিদ্যালয়ের জন্য নিজের উপার্জন থেকে প্রতি মাসে সাত আট শত টাকা ব্যয় করেছিলেন।

লর্ড ও লেডী ডালহাউসীর পৃষ্ঠপোষকতায় বেথুন খুবই উপকৃত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি কেবল সরকারী সহযোগিতা পেয়েই নিশ্চিন্ত ছিলেন না। তিনি ইংরাজী শিক্ষিত বাঙালী বুদ্ধিজীবী এবং বিদ্যাসাগর ও মদন-মোহনের মত প্রগতিশীল পণ্ডিতদের সহযোগিতায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য নির্দিষ্ট কার্যসূচী নিয়ে এগিয়ে চললেন। শিক্ষা পরিষদের সভাপতি হিসাবে তাঁকে বাংলার বিভিন্ন জেলায় শিক্ষাকেন্দ্রগুলি পরিদর্শন করতে যেতে হত এবং সেখানে তিনি ছাত্রদের উপদেশমূলক ভাষণ দিতেন। তাঁর প্রায় প্রত্যেকটি বক্তৃতায় তিনি ছাত্রদের স্ত্রী শিক্ষার বিশেষ প্রয়োজনীয়তার কথা বোঝাতেন এবং শিক্ষিত তরুণদের মেয়েদের শিক্ষিত করে তোলবার মহান ব্রত গ্রহণ করবার জন্য আহ্বান জানাতেন।

কিন্তু এই মহান ব্রত যে কতদূর অগ্রসর হল তা দেখবার সুযোগ বেথুনের ঘটেনি। তিনি ১৮৫১ সালের ১২ই আগষ্ট মারা যান। ঐ বছর অক্টোবর মাস থেকে ডালহাউসী বেথুন স্কুল চালাবার সমস্ত ব্যয়ভার বহন করতে থাকেন এবং ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করবার পর স্কুলটি সরকারী স্বীকৃতি ও সাহায্যপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠান হিসাবে চলতে থাকে। তখন এর তত্ত্বাবধানের ভার পড়ে মিঃ সিসিল বিডনের উপরে। ১৮৫৬ সালের আগষ্ট মাসে বিডন বাংলা গভর্ণমেন্টের কাছে প্রস্তাব করলেন যে হিন্দু সমাজের শীর্ষস্থানীয় ব্যক্তিদের নিয়ে একটি পরিচালক সমিতি গঠন করে স্কুলটি তার তত্ত্বাবধানে রাখা হোক। তিনি

আরও প্রস্তাব করলেন যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বিদ্যালয়ের সম্পাদক নিযুক্ত করা হোক। তিনি চিঠিতে লিখলেন : "পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র যে সব জনহিতকর কার্য করছেন এবং সমাজে তিনি যে বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন তাতে মাননীয় সরকার বাহাদুর তাঁকে স্কুলের পরিচালক সমিতির সম্পাদক নিযুক্ত করার উপযুক্ত বিবেচনা করবেন বলে মনে করা যায়।" ১৮৫৬ সালের আগষ্ট মাসে বিদ্যাসাগরকে বেথুন স্কুল কমিটির অবৈতনিক সম্পাদক নিযুক্ত করা হল এবং হিন্দুসমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করা হল। এরপর বেথুন স্কুলের জীবনে একটি নতুন পর্যায় সুরু হ'ল।

বিদ্যাসাগরের জনহিতকর কাজ করবার একটা নিজস্ব রীতি ছিল। তাঁর অসীম উৎসাহ এবং অদম্য ইচ্ছাশক্তি শুধু বেথুন স্কুল বা কলকাতা শহরের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি বৃহত্তর কর্মক্ষেত্রে অর্থাৎ বাংলার গ্রামাঞ্চলে নিজের কর্মপ্রচেষ্টা বিস্তৃত করে দিতে উৎসুক হয়েছিলেন।

১৮৫৪ সালের শিক্ষা সম্বন্ধীয় বিবরণীতে কোর্ট অব ডিরেক্টরস সর্বপ্রথম ভারতে স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা ও গুরুত্ব স্বীকার করেছিলেন। ডিরেক্টররা মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁরা আনন্দের সঙ্গে লক্ষ্য করেছেন যে "ভারতবাসীর মধ্যে মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা বর্ধিত হয়েছে।" তাঁরা এ কথাও স্বীকার করেছিলেন যে পুরুষদের শিক্ষার দ্বারা দেশের শিক্ষা সম্বন্ধীয় ও নৈতিক অবস্থার যতটা উন্নতি হয় তার চেয়ে স্ত্রী শিক্ষার দ্বারা অনেক বেশী উন্নতি সাধন হতে পারে। বালিকা বিদ্যালয়গুলিও নবপ্রবর্তিত সরকারী সাহায্য পাওয়ার অধিকারী হ'ল। ১৮৫৭ সালের কাছাকাছি সময়ে স্থানীয় সরকার বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে সাহায্য দেওয়া সম্ভব বলে মনে করলেন।

স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে উৎসাহী লেফটেনান্ট গভর্ণর হ্যালিডে ১৮৫৭ সালের প্রথমদিকে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে এ বিষয়ে বিশদভাবে আলোচনা করেন। বিদ্যাসাগর তখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের পদে বহাল আছেন এবং সঙ্গে

সঙ্গে দক্ষিণ বাংলার স্কুলগুলির সহকারী পরিদর্শক হিসাবেও কাজ করছেন। গ্রামাঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা যে কত কঠিন কাজ তা তাঁরা দুজনেই বেশ ভালভাবে বুঝতে পেরেছিলেন। সে সময় এমন কি শহরাঞ্চলেও স্ত্রী শিক্ষা বিশেষ অগ্রসর হতে পারে নি। কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনও কাজে দমে যাওয়ার লোক ছিলেন না। তিনি নির্ভীক-ভাবে হ্যালিডেকে বললেন যে দৃঢ় সঙ্কল্প ও আন্তরিকতা থাকলে কোন কাজই অসাধ্য নয়।

অবিলম্বে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্রের অফুরন্ত উৎসাহ নতুন কর্মক্ষেত্রে বিস্তৃত হল। তিনি ১৮৫৭ সালের ৩০শে মে তারিখে শিক্ষা অধিকর্তাকে জানালেন যে বর্ধমান জেলার একটি গ্রামে বালিকা বিদ্যালয় খোলা সম্ভব হয়েছে: "আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে বর্ধমান জেলার যোগঙ্গ গ্রামের অধি-বাসীরা স্থানীয় আদর্শ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের উপদেশ অনুসারে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছে। গত ১৫ই এপ্রিল এই বিদ্যালয়টির কাজ সুরু হয়। বর্তমানে এর ছাত্রী সংখ্যা চার থেকে এগার বৎসর বয়স্ক ২৮টি বালিকা। এরা অধিকাংশই ঐ গ্রামের সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণ ও কায়স্থ ঘরের মেয়ে।......এই স্কুলটি পরিদর্শন করে আমার ধারণা হয়েছে যে স্কুলটি সুষ্ঠুভাবে চলবার সম্ভাবনা আছে। শুধু যে গ্রামবাসীরা এর সাফল্য সম্বন্ধে অত্যন্ত আগ্রহশীল তাই নয়, স্কুলের ছাত্রীরাও অত্যন্ত আনন্দ ও আগ্রহের সঙ্গে পড়াশুনা করছে বলে মনে হয়।"

১৮৫৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৮৫৮ সালের মে মাস পর্যন্ত বিদ্যা-সাগর মোট ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেছিলেন যার মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ১৩০০। গভর্ণমেণ্টকে সাহায্যদানের নিয়মগুলি কিছু পরিবর্তন করবার জন্য অনুরোধ করা হল যাতে কেবলমাত্র স্কুল বাড়ীর সংস্থান হলে ও কুড়িটি ছাত্রী পাওয়ার সম্ভাবনা হলেই বিদ্যালয়ের সমস্ত খরচ সরকার বহন করতে পারেন। কিন্তু গভর্ণমেণ্ট সাহায্যদানের নিয়ম বদলাতে অস্বীকার করে বললেন যে যদি স্কুলগুলি জনসাধারণের স্বতঃ প্রবৃত্ত আর্থিক সাহায্যে চলতে না পারে তাহলে সে সব স্কুল স্থাপন না করাই ভাল।

গভর্ণমেণ্টের এই আদেশে বিদ্যাসাগরের স্ত্রী শিক্ষা প্রচেষ্টা বাধা পেল। স্থানীয় অধিবাসীরা স্কুল বাড়ীর সংস্থান করে দেবে এবং স্কুল চালানোর অন্যান্য খরচ গভর্ণমেণ্ট বহন করবেন, এই ধারণা নিয়ে তিনি বিদ্যালয়গুলি স্থাপন করেছিলেন। গভর্ণমেণ্টের উপরোক্ত আদেশ জারী হওয়ার পর তিনি বুঝতে পারলেন যে তাঁর সমস্ত প্রচেষ্টা বৃথা হয়েছে এবং তাঁর প্রতিষ্ঠিত বালিকা বিদ্যালয়গুলি অবিলম্বে বন্ধ করে দিতে হবে। ইতিপূর্বেই শিক্ষয়িত্রীদের বেতন প্রভৃতি নিয়ে স্কুল চালানোর কিছু খরচ তাঁর নিজেকেই বহন করতে হয়েছিল। কর্তৃপক্ষকে এই জটিল অবস্থার কথা জানানো হল। অবশেষে দীর্ঘ পত্র বিনিময়ের পর ভারত সরকার ঐ খরচটি মঞ্জুর করে ঈশ্বরচন্দ্রকে আর্থিক দুশ্চিন্তা থেকে রেহাই দিলেন। স্ত্রী শিক্ষা সম্বন্ধে গভর্ণমেণ্টের এই ঔদাসীন্যে বিদ্যাসাগর মর্মাহত হয়েছিলেন বটে, কিন্তু তিনি সমান উৎসাহের সঙ্গে তাঁর উদ্দেশ্যসাধনের চেষ্টা করতে লাগলেন। তিনি বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে আর্থিক সাহায্য দেওয়ার জন্য একটি তহবিল খুললেন এবং কলকাতার ধনী সমাজের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করলেন।

ইতিমধ্যে বেথুন স্কুলে পরিচালক সমিতি গঠিত হওয়ার পর তিনি ১৮৫৬ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতা ও শহরতলীর প্রধান প্রধান হিন্দু পরিবারগুলির জন্য একটি বিজ্ঞপ্তি প্রচার করে জানিয়ে দিলেন বেথুন স্কুলে কি উদ্দেশ্যে এবং কি পদ্ধতিতে শিক্ষা দেওয়া হবে : "সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের মেয়েদের ছাড়া ভর্তি করা হয় না এবং পড়া, লেখা, গণিত, প্রাকৃতিক বিজ্ঞান, ভূগোল ও সূচীশিল্প শেখানো হয়। এই সব বিষয়গুলি বাংলা ভাষার মাধ্যমে শেখানো হয় এবং কেবলমাত্র অভিভাবকদের অনুমতি অনুসারে ইংরাজী শেখানো হয়। মেয়েদের কাছ থেকে কোনও মাসিক বেতন নেওয়া হয় না। পাঠ্যপুস্তক বিনামূল্যে সরবরাহ করা হয়। যে সব ছাত্রী দূরে থাকে এবং যানবাহনের খরচ বহন করতে পারে না, তাদের জন্য বিনামূল্যে স্কুলের গাড়ী বা পাল্কীতে আসবার ব্যবস্থা থাকবে।"

সুপণ্ডিত বিদ্যাসাগর মনুসংহিতা থেকে একটি সুন্দর শ্লোক নির্বাচন করে পাল্কী ও গাড়ীর দরজায় লিখিয়ে দিলেন। এর অর্থ হল যে পুত্রদের

মত কন্যারাও লেখাপড়া শিখবার সমান দাবী করতে পারে। মনুসংহিতার মত প্রাচীন শাস্ত্রের এই শ্লোক পড়লে হিন্দু গৃহস্থরা মেয়েদের লেখাপড়া শেখানোর প্রয়োজনীয়তা অনেক সহজেই উপলব্ধি করবে। অন্যথায় হাজার যুক্তি দেখালেও তাদের এইভাবে বোঝানো সম্ভব হত না।

বিদ্যাসাগর একই সঙ্গে সংস্কৃত কলেজের দায়িত্বপূর্ণ কাজ করছিলেন, আবার এই সব শিক্ষাবিস্তারমূলক কাজও করছিলেন। ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষতা ছেড়ে দেওয়ার পরও তিনি বেথুন কলেজের সম্পাদক হিসাবে কাজ করছিলেন। ১৮৬৯ সালের জানুয়ারী মাসে যখন বেথুন স্কুল কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হয় তখন পর্যন্ত তিনি তার সম্পাদক ছিলেন।

১৮৬২ সালে তিনি যে রিপোর্ট দিয়েছিলেন তা থেকে বুঝতে পারা যায় যে তাঁর পরিচালনায় বিদ্যালয়টি কত উন্নতি করেছিল: "ছাত্রী সংখ্যা সম্বন্ধে সমিতির বক্তব্য এই যে তা ১৮৫৯ এর তুলনায় ক্রমশঃ বাড়ছে। কমিটি যদি যানবাহনের যথেষ্ট সুবিধা করে দিতে পারতেন তবে ইতিপূর্বেই ছাত্রী সংখ্যা শতাধিক হয়ে যেত। তারপর অবশ্য এই অসুবিধা দূর করা হয়েছে। সব মিলিয়ে বর্তমানে তিনটি গাড়ীর ব্যবস্থা হয়েছে। অতএব শীঘ্রই ছাত্রী সংখ্যা প্রত্যাশিতভাবে বাড়বে বলে মনে হয়……যে সব মেয়েরা অল্প বয়সে ভর্তি হয়ে এগার বার বছর বয়স পর্যন্ত স্কুলে পড়াশোনা করতে পারে তারা বিভিন্ন পাঠ্যবিষয় সম্বন্ধে বেশ ভালই জ্ঞান অর্জন করে।

"যে ভাবে ছাত্রী সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে তাতে কমিটির ধারণা হয়েছে যে সমাজের যে শ্রেণীর লোকের উপকারের জন্য বিদ্যালয়টি স্থাপন করা হয়েছে এই প্রতিষ্ঠানটি তাদের বিশ্বাস অর্জন করতে পেরেছে।……কমিটি একটি জিনিস সানন্দে লক্ষ্য করেছে,—আজকাল অনেক ধনী পরিবারের মেয়েদের গৃহশিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। কমিটির ধারণা যে অনেক পরিমাণে বেথুন স্কুলের কল্যাণকর প্রভাবে এ ব্যাপার সম্ভব হয়েছে।"

এই রিপোর্ট থেকে বুঝতে পারা যায় যে প্রবল সামাজিক কুসংস্কারের জন্য স্ত্রী শিক্ষা বিশেষ প্রসার লাভ করতে পারছিল না। এ কথা ঠিক যে ১৮৬৬-৬৭ সালে শিক্ষা বিভাগের তত্ত্বাবধানে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা বেড়ে তিন শত হয়েছিল এবং ছাত্রী সংখ্যা হয়েছিল ৬,০০০। কিন্তু অভিভাবকেরা মেয়েদের তাড়াতাড়ি স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়ার জন্য খুব কম ছাত্রীই একটি সাধারণ মান পর্যন্ত লেখাপড়া শিখবার সুযোগ পেত। প্রাথমিক পড়া ও লেখা, গণিত ও কিছু সেলাইএর কাজ,—স্কুলের এইটুকু শিক্ষাই অভিভাবকেরা তাদের পেতে দিতেন। সাধারণতঃ ন'দশ বছর বয়সে তাদের স্কুল থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হত, প্রধানতঃ বাল্যবিবাহের রীতি রক্ষার জন্য। আর এই প্রথা মধ্যবিত্ত বা নিম্নশ্রেণীর চেয়ে উচ্চশ্রেণীর পরিবারে বেশী মানা হত। এঁরা মেয়েদের জন্য বিদ্যালয়ের শিক্ষার চেয়ে অন্তঃপুরের শিক্ষা বেশী পছন্দ করতেন। এ কথা যে কতটা সত্য তা উড্রোর ১৮৬৩-৬৪ সালের বিবরণী থেকে বোঝা যায়। "মেয়েরা ধনী পরিবারের বলে মনে হয় না, কারণ সম্প্রতি পাঠ্যপুস্তকের দাম দিতে হবে বলে যে আদেশ জারী করা হয়েছিল তার বিরুদ্ধে বেশ প্রতিবাদ হয়েছিল এবং আমি যে একটা সামান্য মাসিক বেতন ধার্য করার প্রস্তাব করেছিলাম সবাই একবাক্যে তার বিরোধিতা করেছিলেন। বেথুন স্কুলে লেখাপড়া শেখাতে ধনীরা তাঁদের মেয়েদের পাঠান না, যাঁরা পাঠান তাঁরা হচ্ছেন ভদ্রলোক শ্রেণীর।" স্ত্রী শিক্ষা যতটুকু অগ্রসর হয়েছিল তা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত একদল তরুণের প্রভাব ও প্রচেষ্টায় সম্ভব হয়েছিল। তাঁদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন শহরে যে নতুন মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠেছিল সেই সব পরিবারের ছেলে। "অর্থ" ছাড়া এই শ্রেণীর আর একটি নতুন বৈশিষ্ট্য ছিল "শিক্ষা"। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়াংশে শহর অঞ্চলের এই শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীই ছিল স্ত্রী শিক্ষার প্রধান সমর্থক।

ষষ্ঠ দশকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলাদেশে স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে নতুন প্রেরণা সঞ্চার করলেন মিস মেরী কার্পেণ্টার। তিনি ছিলেন জনসেবিকা ও ভারতের প্রতি সহানুভূতিশীল। তিনি ১৮৬৬ সালের ২০শে নভেম্বর কলকাতায় এসে পৌঁছান এবং বিদ্যাসাগর, কেশবচন্দ্র সেন প্রভৃতি স্ত্রী

শিক্ষার সমর্থকদের সঙ্গে পরিচিত হন। শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য তিনি একটি নর্মাল স্কুল স্থাপনের পরিকল্পনা করে গভর্ণমেণ্টের কাছে পাঠিয়ে দেন। কর্তৃপক্ষ এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের মত চাইলেন। বিদ্যাসাগর ১৮৬৭ সালের ১লা অক্টোবর এক পত্র লিখে লেফটেনাণ্ট গভর্ণরকে জানিয়ে দিলেন কেন তিনি এই প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেন না। "আপনার সঙ্গে দেখা হওয়ার পর আমি এ বিষয়ে অনেক চিন্তা করেছি। মিস কার্পেণ্টা-রের পরিকল্পনা হচ্ছে বেথুন স্কুলে অথবা পৃথকভাবে একদল এদেশীয় মেয়েদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণ দিয়ে শিক্ষকতা কাজের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। এই পরিকল্পনা বাস্তবে রূপায়িত করা এবং মোটামুটিভাবে হিন্দু সমাজের কাছে গ্রহণীয় করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার বলে আমি যে মত দিয়েছিলাম দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি যে সে মত পরিবর্তন করার কোনও কারণ পাচ্ছি না। বস্তুতপক্ষে দেশীয় সমাজের বর্তমান অবস্থায় যে পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে বলে আমার বিশ্বাস গভর্ণমেণ্টকে সে রূপ কোনও পরিকল্পনা কার্যকর করার দায়িত্ব নেওয়ার কথা বলতে আমার বিবেকে বাধে। বর্তমানে সম্ভ্রান্ত হিন্দু ঘরের দশ এগার বছরের মেয়েদের বিবাহের পর অন্তঃপুরের বাইরে আসতে দেওয়া হয় না। এই অবস্থায় তাঁরা তাঁদের বয়স্কা আত্মীয়াদের অন্তঃপুরের শালীনতা ত্যাগ করে শিক্ষায়িত্রীর কাজে যেতে দেবেন কিনা তা সহজেই অনুমেয়। একমাত্র অভিভাবকহীন, নিরাশ্রয় বিধবারা এ কাজে অগ্রণী হতে পারেন। নৈতিক দিক দিয়ে তাঁরা একাজের উপযুক্ত হবেন কিনা সে কথা আমি ছেড়ে দিচ্ছি। কিন্তু তাঁরা অন্তঃপুর ছেড়ে জনসাধারণের সামনে এসে শিক্ষায়িত্রীর কাজ গ্রহণ করলে লোকে তাঁদের সন্দেহ ও অবিশ্বাসের চোখে দেখবে এবং তার ফলে এই মহৎ পরিকল্পনার উদ্দেশ্য নষ্ট হয়ে যাবে……

"এ কথা বলা বাহুল্য যে ছাত্রীদের পড়ানোর জন্য শিক্ষিকার প্রয়োজন আমি সম্পূর্ণ উপলব্ধি করি। কিন্তু আমার দেশের সামাজিক কুসংস্কার কঠিন বাধার সৃষ্টি না করলে সবার আগে আমি এই পরিকল্পনা সমর্থন করতাম এবং একে কার্যকরী করবার জন্য সমস্ত রকম সাহায্য করতাম। কিন্তু আমি যখন দেখছি এই পরিকল্পনার সাফল্য অনিশ্চিত

এবং একে কার্যকরী করতে গিয়ে গভর্ণমেণ্ট একটা অপ্রীতিকর অবস্থার মধ্যে পড়তে পারেন, তখন আমি এই পরীক্ষামূলক প্রস্তাব সমর্থন করতে পারি না।"

তিনি অবশ্য বেথুন স্কুল চালু রাখবার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করতে ভোলেন নি। উপসংহারে তিনি লিখেছিলেন : "আমি আপনার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে বেথুন স্কুলের জন্য যে পরিমাণে অর্থ ব্যয় করা হচ্ছে সে অনুপাতে সুফল পাওয়া যায় নি। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি একথাও বলব যে বেথুন স্কুল একেবারে তুলে দেওয়া উচিত হবে না। স্ত্রী শিক্ষার জন্য মানব প্রেমিক বেথুন যে মহান কাজ করে গেছেন অন্ততঃ তাঁর স্মৃতি রক্ষার জন্য তাঁর নামাঙ্কিত এই প্রতিষ্ঠানের সরকারী সাহায্য পাওয়ার দাবী আছে—এই আমার নিবেদন। এ ছাড়া আরও একটি কথা আছে। এই কলকাতা শহরের কেন্দ্রস্থলে একটি ভাল বালিকা বিদ্যালয় থাকা দরকার। অন্যান্য অঞ্চলের বালিকা বিদ্যালয়গুলি তাকে আদর্শ স্কুল হিসাবে গ্রহণ করবে। দেশীয় সমাজের উপর এই প্রতিষ্ঠানের নৈতিক প্রভাব খুব বেশী হয়েছে। এই প্রতিষ্ঠান নিকটবর্ত্তী জেলাগুলিতে স্ত্রী শিক্ষার পথ প্রশস্ত করে দিয়েছে এবং আমার নিজস্ব অভিমত এই যে, সেদিক দিয়ে এর জন্য অর্থ ব্যয় করা অনেক পরিমাণে সফল হয়েছে।

বিদ্যাসাগর মিস কারপেণ্টারের পরিকল্পনা সমর্থন না করলেও এ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের সঙ্গে সর্বতোভাবে সহযোগিতা করেছিলেন। ১৮৬৯ সালের ২রা মার্চ তারিখে জনশিক্ষা অধিকর্তাকে লেখা মিঃ উড্রোর চিঠি থেকে জানা যায় : "আমার বিনীত নিবেদন এই যে পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাকে বেথুন স্কুল সংক্রান্ত দলিল দিয়ে দেন……তিনি অনেকক্ষণ ধরে আমার সঙ্গে স্কুল ও তার সংলগ্ন জমি পরিদর্শন করেন এবং কিভাবে সেখানে হিন্দু মহিলাদের থাকবার উপযুক্ত গৃহ নির্মাণ করা যায় তা আলোচনা করেন। শিক্ষিকাদের প্রশিক্ষণ দানের জন্য স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে তিনি যথাসাধ্য সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন, যদিও এই স্কুলের সাফল্য সম্বন্ধে তিনি নিজে একেবারেই আশান্বিত নন … …।"

মিস কারপেণ্টারের পরিকল্পনা কার্যকরী হয় কিনা তা দেখবার একটা সুযোগ দিতে গভর্ণমেণ্ট রাজী ছিলেন। বিদ্যাসাগর পরিচালিত বেথুন স্কুল কমিটি ঐ পরিকল্পনার ব্যাপারে কোনও অংশ গ্রহণ করতে অস্বীকার করলেন। ১৮৬৯ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখের এক সরকারী আদেশে ঐ কমিটি ভেঙ্গে দেওয়া হ'ল। শিক্ষয়িত্রী প্রশিক্ষণের জন্য বেথুন স্কুল গৃহে একটি নর্মাল স্কুল খোলা হল এবং 'সেটি চালানোর জন্য গভর্ণমেণ্ট বাৎসরিক ১২,০০০ টাকা ব্যয় মঞ্জুর করলেন। স্কুলটি চলল না। জনশিক্ষা সম্বন্ধে ১৮৬৯-৭০ সালের রিপোর্টে স্কুল না চলার কথা স্বীকার করে নিয়ে বলা হয়েছে: "বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেথুন স্কুলে যে চেষ্টা চলছে তা এখন পর্যন্ত সফল হয় নি।" পরবর্তী স্তরের রিপোর্টেও সেই ব্যর্থতার কথা বলা হয়েছিল: "বয়স্কা মেয়েদের শিক্ষিকা হিসাবে শিক্ষা দেওয়ার জন্য বেথুন স্কুলে যে বিভাগ খোলা হয়েছে তাতে ছাত্রী সংখ্যা এত কম যে তার কোনও অস্তিত্ব নেই বললেই চলে।" গভর্ণমেণ্ট ১৮৭২ সালের ২৪শে জানুয়ারী তারিখের এক পত্রে জনশিক্ষা অধিকর্তাকে নর্মাল স্কুলটি বন্ধ করে দেওয়ার আদেশ দিয়ে লিখলেন: "সাধারণভাবে পুনর্বিচার করে দেখা গেল যে তিন বছর ধরে পরীক্ষামূলকভাবে মেয়েদের জন্য যে নর্মাল স্কুল চালানো হচ্ছে তা নিঃসন্দেহে বৃথা হয়েছে।" বিদ্যা-সাগরের ভবিষ্যদ্বাণী এইভাবে সত্য হল।

বিদ্যাসাগর বেথুন স্কুল কমিটির সঙ্গে সম্পর্ক ছেদ করার পর স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে ঐ স্কুলের নেতৃত্ব আর বজায় রইল না। ১৮৭৩ সালের নভেম্বর মাসে কলকাতার পূর্বাঞ্চলে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। ১৮৭৬ সালে পুনর্গঠিত হওয়ার পর এই প্রতিষ্ঠানের নতুন নামকরণ হয়েছিল বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়। স্ত্রী শিক্ষার ব্যাপারে এই প্রতিষ্ঠানই নেতৃত্ব গ্রহণ করল। মিস এ্যাকরয়েড এই প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার দায়িত্ব নিলেন। তিনি এ বিষয়ে কয়েকজন শিক্ষিত ও প্রগতিশীল বাঙালী তরুণের সাহায্য পেয়েছিলেন, যেমন মনমোহন ঘোষ, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলী, দুর্গা মোহন দাশ, আনন্দ মোহন বসু প্রভৃতি। ১৮৭৬-৭৭ সালের জনশিক্ষা সম্বন্ধে বিবরণীতে গভর্ণমেণ্ট স্বীকার করলেন যে বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয় "সব দিক দিয়ে বাংলা

দেশের সবচেয়ে উন্নত বা অগ্রসর স্কুল।" দেখা গেল যে শিক্ষা ও পরিচালনা প্রভৃতি সব ব্যাপারেই গভর্ণমেণ্ট সমথিত বেথুন স্কুল বঙ্গ মহিলা বিদ্যালয়ের তুলনায় অনেক পিছনে পড়ে গেছে। অতএব বেথুন বিদ্যালয়ের পরিচালক সমিতির সভাপতি ও বিচারপতি ফিয়ার প্রস্তাব করলেন যে দু'টি স্কুলকে একত্রিত করে সরাসরি গভর্ণমেণ্টের তত্ত্বাবধানে আনা হোক। শেষ পর্যন্ত ১৮৭৮ সালের ১লা আগষ্ট তারিখে তাই করা হল। বেথুন স্কুল পুনর্গঠিত হল এবং সেখান থেকে কুমারী কাদম্বিনী বসু ১৮৭৮ সালে সর্বপ্রথম কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষা দিলেন। কাদম্বিনী দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর এই সাফল্য ছিল ভারতের স্ত্রী শিক্ষার ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। সেই বছর এপ্রিল মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য নির্বাহক সভায় (সেনেটে) সর্বপ্রথম এই মর্মে একটি মন্তব্য পাশ হয়েছিল যে "কতকগুলি নিয়ম সাপেক্ষভাবে মহিলাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হবে।"

কুমারী কাদম্বিনী বসু প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাশ করায় বেথুন স্কুলের ইতিহাসে বৃহত্তর স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হল। "কাদম্বিনী বসু প্রবেশিকা পাশ করে ফার্ষ্ট আর্টস পড়ার ইচ্ছা প্রকাশ করায় বিদ্যালয়টির মান আরও উঁচু করার প্রস্তাব হয়। লেফটেনাণ্ট গভর্ণর বেথুন স্কুলে ফার্ষ্ট আর্টস পড়ানোর উপযুক্ত একজন অধ্যাপক নিযুক্ত করে স্কুলটির মান উন্নত করার প্রস্তাবে সম্মত হলেন।"

বিদ্যাসাগর ও তাঁর সমসাময়িক কয়েকজন বহুদিন ধরে স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের যে স্বপ্ন দেখেছিলেন তা সফল হল গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে। ১৮৮৩-৮৪ সালের জনশিক্ষা বিষয়ক বিবরণীতে বাংলা দেশের মেয়েদের উচ্চশিক্ষার অগ্রগতি সম্বন্ধে উল্লেখ করা হয়েছে। "যেসব অল্প বয়স্কা মহিলা বাংলা দেশের উচ্চশিক্ষিত স্ত্রীলোকদের মধ্যে অগ্রগামী ছিলেন তাঁদের মধ্যে কাদম্বিনী বসু (বর্তমানে শ্রীমতী গাঙ্গুলী) ১৮৮৩ সালের জানুয়ারী মাসে বি. এ পাশ করে বর্তমানে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ডাক্তারি পড়ছেন। চন্দ্রমুখী বসু ইংরাজীতে অনার্স নিয়ে এম. এ. পাশ

করেন। তিনি সম্প্রতি বেথুন স্কুলের কলেজ বিভাগে অধ্যাপিকা নিযুক্ত হয়েছেন।”

ব্যাধিগ্রস্ত বিদ্যাসাগর তখন জীবনের শেষ স্তরে পেঁ ৗছেছেন। তাঁর জীবনব্যাপী সমাজ সংস্কার সংগ্রামের ব্যর্থতা ও হতাশার কথা স্বভাবতই সেদিন তাঁর মনে জেগে উঠেছিল। হয়ত এই কথা ভেবে তিনি সান্ত্বনা লাভ করছিলেন যে, যেসব মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি সারা জীবন এত কঠিন সংগ্রাম করেছেন তার মধ্যে অন্তত: একটি অর্থাৎ স্ত্রী শিক্ষা, তাঁর জীবদ্দশাতেই সাফল্যলাভ করেছে। চন্দ্রমুখী বসু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ পরীক্ষা এম. এ. পাশ করলে বিদ্যাসাগর তাঁকে ক্যাসেলের সচিত্র সেক্সপীয়ার গ্রন্থটি উপহার দেন।

১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। তাঁর মৃত্যুর পর শিক্ষিত মহিলারা মিলে একটি স্মৃতিরক্ষা সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন এবং নিজেদের মধ্যে ১,৬৭০ টাকা চাঁদা তুলে সেই টাকা বেথুন স্কুলের কর্তৃপক্ষের হাতে দেন বিদ্যাসাগরের নামে একটি বৃত্তি দেওয়ার জন্য। স্ত্রী শিক্ষা ও স্ত্রী স্বাধীনতার জন্য যিনি সবচেয়ে কঠিন সংগ্রাম করেছিলেন তাঁর প্রতি এইভাবে তাঁরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। ১৮৯৪ সালের বার্ষিক বিবরণীতে বেথুন কলেজ কমিটি এ সম্বন্ধে মন্তব্য করেন: “পরলোকগত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এই স্কুল প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে মিঃ বেথুনের সাহায্যকারী ও সহকর্মী ছিলেন এবং পরে যতদিন তিনি জীবিত ছিলেন ততদিন এই প্রতিষ্ঠানের উন্নতি সম্বন্ধে আগ্রহশীল ছিলেন। অতএব কলকাতার হিন্দু মহিলারা যে পরলোকগত পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের স্মৃতি রক্ষার জন্য এইভাবে সচেষ্ট হয়েছেন তাতে এই কমিটি অত্যন্ত আনন্দিত হয়েছেন; কেননা বিদ্যাসাগর সারাজীবন বিভিন্ন লোকহিতকর কাজ ছাড়াও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারের জন্য বিশেষ সচেষ্ট ছিলেন……।”

দশম অধ্যায়

সমাজ সংস্কার : বিধবা বিবাহ

বিদ্যাসাগর যখন বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন আরম্ভ করলেন তখন বাংলাদেশে এই নিয়ে জল্পনা কল্পনা সুরু হল। সকলে ভাবলেন, এই বিদগ্ধ পণ্ডিত কেন এই কাজে হাত দিলেন।

এই নিয়ে জল্পনা কল্পনা যে কতদূর গড়িয়েছিল তার প্রমাণ স্বরূপ এ সম্বন্ধে প্রচলিত দু'একটি কাল্পনিক গল্প এখানে সংক্ষেপে দেওয়া হল। একটি গল্প এইরকম। বীরসিংহ গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যাসাগরের খেলার সাথী ছিল। বালিকাটি বালবিধবা। বিদ্যাসাগর তাকে খুব পছন্দ করতেন এবং মনে হয় বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে পরস্পরের মধ্যে অনুরাগের সঞ্চার হয়েছিল। বিদ্যাসাগর যখন জানতে পারলেন যে সে বিধবা এবং শাস্ত্রের নির্দেশে সেই বিধবা বালিকাকে আজীবন কঠোর ব্রহ্মচর্য পালন করতে হবে, তখন তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রবর্তন করার সঙ্কল্প করলেন। আর একটি কাহিনী হল এই যে একটি বিধবা রমণী কঠোর বৈধব্য দশা পালন করতে না পারায় সমাজচ্যুত হয়েছিল। এই অবস্থা সহ্য করতে না পেরে সে আত্মহত্যা করে। বিদ্যাসাগর যখন সেই অসহায় বিধবার শোচনীয় পরিণামের কথা জানতে পারলেন তখন তিনি শপথ করলেন যে তিনি হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার সমাজে প্রচলিত করে সরকারকে দিয়ে তা বিধিবদ্ধ করাবেন।

গত শতাব্দীর মধ্য ভাগে বিধবা বিবাহ প্রবর্তনের মহান প্রচেষ্টার পিছনে কোনও না কোন আকস্মিক কারণ ছিল বলে বিদ্যাসাগরের জীবনী-কারেরা সকলেই ভুল করেছেন। "সমাজ সম্বন্ধে মানুষের মনোভাব"

সহসা সক্রিয় হয়ে ওঠে না, সে মনোভাব বাস্তব ক্ষেত্রে রূপায়িত হতে সময় লাগে। বিদ্যাসাগরের যুগে যে বিধবা বিবাহের সমর্থনে এবং বহু বিবাহের বিপক্ষে সামাজিক মনোভাব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল, তার পিছনে একটা দীর্ঘ ইতিহাস ছিল। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে রাজা রামমোহন রায়ের যুগে এই মনোভাব সর্বপ্রথম রূপ গ্রহণ করতে সুরু করে। ১৮১৫ সালে রামমোহন আত্মীয় সভা প্রতিষ্ঠা করেন। সেই সভায় প্রথম থেকেই এই সব সমস্যা নিয়ে আলোচনা হত। ১৮১৯ সালে এই সভার এক অধিবেশনের বিবরণীতে বলা হয়েছে : "এই সভায়……বালবিধবাদের সারাজীবন ব্রহ্মচর্য পালনের বাধ্যবাধকতা, বহু বিবাহ ও সহমরণ রূপ কুপ্রথাগুলির তীব্র নিন্দা করা হয়েছিল"।* সতীদাহের মত নৃশংস প্রথা দূর করার জন্য আমরা রামমোহন রায়ের কাছে অনেক পরিমাণে ঋণী। তিনি যখন বিলাত যান তখন বাংলাদেশের সব পরিবারেই এই কথা বলাবলি হত যে হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রবর্তন করার শপথ নিয়েই তিনি ইংলণ্ডে গেছেন। গল্প আছে যে এমনকি বৃদ্ধা বিধবারা ঠাট্টা করে বলাবলি করতেন যে রামমোহন বিদেশ থেকে ফিরে এলেই তাঁদের বিবাহ হবে। বলা বাহুল্য বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে রামমোহন সম্পূর্ণ সচেতন ছিলেন, কিন্তু সতীদাহ প্রথা উচ্ছেদ করার পর এই সমস্যা সমাধান করার মত যথেষ্ট সময় তিনি পান নি।

শুধু রামমোহন নয়, গত শতাব্দীর তৃতীয় দশকে তরুণ ডিরোজীয়র ছাত্র শিষ্যেরা বিধবা বিবাহ ও অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে আলোচনা করতেন এবং জনমত গঠন করার চেষ্টা করতেন। তাঁদের দু'খানি সাময়িক পত্র ইংরাজী "দি এনকোয়ারার" ও বাংলা "জ্ঞানান্বেষণ" এর পৃষ্ঠাতেও এই সমস্যা নিয়ে চর্চা হ'ত। তাঁদের এই সব আলোচনায় এইটুকু ফল হয়েছিল যে ভারতীয় আইন কমিশন বিষয়টি বিবেচনা করেছিলেন। কমিশনের সম্পাদক জে. পি. গ্র্যাণ্ট একটি বিজ্ঞপ্তি মারফৎ এ বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা করেছিলেন এবং চারটি প্রেসিডেন্সীর (শাসনের সুবিধার জন্য বিভাগ)

*দি ক্যালকাটা জার্নাল, তৃতীয় খণ্ড, ১৮ই মে, ১৮১৯

সদর আদালতগুলির মতামত চেয়েছিলেন। এই ব্যাপারে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল এই যে, বিভিন্ন আদালতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধিকাংশ উচ্চপদস্থ বৃটিশ কর্মচারীই বিধবা বিবাহের প্রস্তাব সমর্থন করেন নি। কলকাতা সদর আদালতের অস্থায়ী রেজিষ্ট্রার আর. ম্যাকান উত্তর দিয়েছিলেন: "বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ হওয়ার কুফল সম্বন্ধে এই আদালত সম্পূর্ণ সচেতন, কিন্তু তবু এই আদালতের নিশ্চিত মত এই যে বিধবা বিবাহের প্রস্তাবিত আইন পাশ করলে গভর্ণমেণ্টের পক্ষে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করা হবে।" এলাহাবাদ সদর কোর্টের রেজিষ্ট্রার এইচ. বি. হ্যারিংটন ১৮৩৭ সালের ১১ই আগষ্ট তারিখে লিখেছিলেন: "প্রস্তাবিত আইন প্রণয়নের উদ্দেশ্য খুবই ভাল সন্দেহ নেই। কিন্তু এ আইন প্রত্যক্ষভাবে হিন্দু আচারের বিরোধী হবে। এই সব আচার যে পরিমাণ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হয় তাতে এ আইন হিন্দুদের ধর্ম বিশ্বাসে আঘাত দিতে পারে। অতএব এই আদালত এ আইন পাশের যুক্তিযুক্ততা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করছে।" মাদ্রাজ সদর আদালতের রেজিষ্ট্রার মিঃ ডবলিউ ডগলাস ১৮৩৭ সালের ৩১শে জুলাই তারিখে লিখেছিলেন: "বিচারকদের মত যে দেশের এই অঞ্চলে যে আইনের প্রস্তাব হয়েছে তা পাশ করলেও চালু করা সম্ভব হবে না। উপরন্তু উচ্চবর্ণের লোকেদের মধ্যে গোঁড়ামি আরও বেড়ে যাবে এবং তারা দ্বিগুণভাবে বিধবা বিবাহের বিরোধিতা করবে······।"

দেখা যাচ্ছে যে সদর আদালতগুলি আইন করে বিধবা বিবাহ চালু করার সম্পূর্ণ বিপক্ষে ছিলেন, কেননা তাঁদের আশঙ্কা হয়েছিল যে এই আইন পাশ করলে হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতিতে হস্তক্ষেপ করা হবে। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠির আন্দোলনের এইটুকু ফল হয়েছিল যে কর্তৃপক্ষ বিষয়টি নিয়ে চিন্তা করেছিলেন এবং আইন দ্বারা বিধবা বিবাহ প্রচলন করা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞদের মত নিয়েছিলেন। চতুর্থ দশকে শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর প্রগতিশীল ব্যক্তিরা এই সব বিচার ও আলোচনা চালিয়ে যান। এই সব মধ্যবিত্ত শ্রেণীর কয়েকটি বিখ্যাত সংস্থা ছিল, যেমন সোসাইটি ফর দি এ্যাকুইজিশান অব জেনারেল নলেজ (সাধারণ জ্ঞান আহরণী সমিতি), তত্ত্ববোধিনী সভা ও বেথুন সমিতি। এ সব সভা সমিতিতে প্রায়ই এই

সমস্যার আলোচনা হত। এই সব প্রকাশ্য বিচার বিতর্ক অবিরত চলার ফলে পঞ্চম দশকে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে একটা নির্দিষ্ট মনোভাব গড়ে উঠেছিল। ঠিক সেই সময়ে বিদ্যাসাগর আইন দ্বারা বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ নিরোধের জন্য আন্দোলন সুরু করে সেই সমাজ সংস্কারমূলক মনোভাবকে কার্যকরী করে তোলেন।

এই আন্দোলনের জন্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অবস্থা অনুকূল হয়ে উঠেছিল। এই সংস্কারের প্রধান সমর্থনকারী মধ্যবিত্তশ্রেণী ততদিনে সমাজে বেশ শক্তিশালী হয়ে উঠেছিলেন। এঁরা দ্বিতীয় দশকের সুরু থেকেই বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বাধ্যতামূলক বৈধব্য দশা পালন সম্বন্ধে প্রকাশ্যে সমালোচনা করে আসছিলেন এবং এই সব প্রথার সংস্কারের দাবী জানাচ্ছিলেন। চতুর্থ দশকে এই দাবী খুবই প্রবল হয়ে ওঠে। ইয়ং বেঙ্গল দলের ইংরাজী ও বাংলায় প্রকাশিত দ্বিভাষিক পত্রিকা "দি বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর"-এ এই সব প্রথার বিলোপ দাবী করে উৎসাহের সঙ্গে প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল। এই পত্রিকায় ১৮৪২ সালের এপ্রিল মাসে প্রকাশিত প্রথম সংখ্যাতেই বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছিল। ১৮৫৪-৫৫ সালে বিদ্যাসাগর নিজে তাঁর বিধবা বিবাহ বিষয়ক প্রবন্ধে যে সব যুক্তি দিয়েছিলেন "বেঙ্গল স্পেক্‌টেটরের" লেখকও সেগুলির উপযুক্ত ব্যবহার করেছিলেন। হিন্দু সমাজের নেতৃস্থানীয়দের দ্বারা স্বাক্ষরিত একটি আবেদন পত্র গভর্ণমেন্টের কাছে পাঠানোর প্রস্তাবও সেই প্রবন্ধে করা হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে প্রয়োজন হলে আইনের দ্বারা বিধবাদের পুনর্বিবাহের অধিকার দেওয়া উচিত। ১৮৫৪ সালের কোনও এক সময় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান সোসাইটি ধর্মসভা ও তত্ত্ববোধিনী সভার সঙ্গে বিধবাদের পুনর্বিবাহ সম্বন্ধে পত্রালাপ করেন। "শেষোক্ত সংস্থা কোনও জবাব দেননি। ধর্মসভার সঙ্গে কিছুদিন পত্র বিনিময় চলেছিল বটে কিন্তু তাতে কোনও লাভ হয়নি।"* বছর দশেক পরে বিদ্যাসাগর নতুন উৎসাহ ও সাহস নিয়ে এই আলোচনা সুরু করলেন। আমরা পূর্বেই দেখেছি যে

*দি ক্যালকাটা রিভিউ ২৫শ তম খণ্ড, জুলাই-ডিসেম্বর ১৮৫০

বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বাদ প্রতিবাদ চতুর্থ দশকের সুরুতে সবচেয়ে প্রবল হয়ে ঐ দশকের শেষের দিকে কমে এসেছিল।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দ্বারা যথাক্রমে ১৮৩৯ ও ১৮৪৩ সালে প্রতিষ্ঠিত তত্ত্ববোধিনী সভা ও "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র প্রভাবে পঞ্চম দশকে সমাজে কিছু পরিবর্তন এসেছিল। তত্ত্ববোধিনী সভা মাত্র দশজন তরুণ সভ্য নিয়ে আরম্ভ হয়। এই সভার সাপ্তাহিক ও মাসিক অধিবেশনে সমাজ ও ধর্ম সম্বন্ধে নানারূপ প্রবন্ধ পড়া হত এবং তা নিয়ে আলোচনা চলত। এই সভা সুরুতে খুব ছোট ছিল। কিন্তু "এত কর্মশক্তি ও উৎসাহের সঙ্গে এই সভার কাজ চালান হত যে মাত্র দু বছরের মধ্যে এর সভ্য সংখ্যা হয়ে দাঁড়াল ৫০০ এবং আরও কয়েক বছরের মধ্যে বহু ধনী ও প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি এই সভার সভ্য হলেন বা এর সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল হয়ে উঠলেন।"* গত শতাব্দীর মধ্যভাগে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বাঙালীর মুখপাত্র হিসাবে এই সভা অত্যন্ত প্রভাবশালী সংস্থা হয়ে উঠেছিল। বিদ্যাসাগর এই সভার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন; বস্তুতপক্ষে তিনি এর সভ্য ছিলেন। এই সভা যখন নব প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজের সঙ্গে এক হয়ে যায় তার অব্যবহিত পূর্বে বিদ্যাসাগর এর সম্পাদক নিযুক্ত হয়েছিলেন (১৮৫৮-৫৯ সাল)। এ ছাড়া বিদ্যাসাগর "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র সম্পাদক মণ্ডলীর সভ্য ছিলেন এবং নিয়মিতভাবে ঐ পত্রিকায় লিখতেন। পত্রিকার প্রথম সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন এবং সমাজ সংস্কার ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে খুব সহযোগিতা করতেন। অক্ষয় কুমার একজন কঠোর যুক্তিবাদী ও বস্তুবাদী লোক ছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের মত তিনিও একজন শক্তিশালী গদ্য লেখক ছিলেন। তিনি বাংলা ভাষার মাধ্যমে ঐতিহাসিক ও বৈজ্ঞানিক আলোচনা সর্বপ্রথম সুরু করেন। অক্ষয় কুমারের অদম্য ইচ্ছাশক্তি ও অত্যন্ত স্পষ্ট দৃষ্টিভঙ্গী ছিল। অতএব তিনি "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" মাধ্যমে বিধবা বিবাহ প্রচলন, বহুবিবাহ নিরোধ প্রভৃতি বিদ্যাসাগরের সমস্ত সমাজ সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা সমর্থন করতেন।

---

*শিবনাথ শাস্ত্রী, হিস্টরি অব ব্রাহ্ম সমাজ, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা ৮৭

বিদ্যাসাগর নিজে বিধবা বিবাহ প্রচলনের প্রস্তাব করে "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা" ফাল্গুন ১৭৭৬ শক (১৮৫৪) সংখ্যায় একটি প্রবন্ধ লেখেন এবং অক্ষয় কুমার একটি সম্পাদকীয় লিখে এই প্রস্তাব বিশেষভাবে সমর্থন করেন।

সমাজের বিতর্কমূলক সমস্যাগুলি সম্বন্ধে তত্ত্ববোধিনী সভার তরুণ সভ্যদের আলাপ আলোচনা বাদপ্রতিবাদ চলল এবং তারই ভিতর দিয়ে একটা নতুন মনোভাব গড়ে উঠতে লাগল। এই মনোভাব "তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা"র বিভিন্ন প্রবন্ধের মধ্যে প্রকাশ পেল। স্ত্রীশিক্ষা ও বিধবা বিবাহ সমর্থন করে এবং বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ ও মদ্যপানের নিন্দা করে পত্রিকায় অনেক প্রবন্ধ লেখা হচ্ছিল।

এই পরিস্থিতিতে বিদ্যাসাগর সমাজ সংস্কারের কাজে নামলেন। তাঁর অনেক জীবনীকার তাঁকে বিধবা বিবাহের সৃষ্টিকর্তা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু এ ধারণা ভুল। "পরাশর সংহিতা"র যে কয়েকটি সুপরিচিত শ্লোকে বিশেষ বিশেষ অবস্থায় বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসম্মত বলা হয়েছে বিদ্যাসাগর যে তার আবিষ্কারক ছিলেন সে ধারণাও ভুল। এ কথা সত্য যে তিনি সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষের কক্ষে প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্র থেকে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে নজীর খুঁজে বের করবার জন্য বহুবিনিদ্র রজনী কাটিয়েছিলেন। কিন্তু এ কথা সত্য নয় যে হঠাৎ তিনি "পরাশর সংহিতা"র "নষ্টে মৃতে" শ্লোকটির সন্ধান পেয়ে বলে উঠেছিলেন, "এতদিনে আমি পেয়েছি, পেয়েছি।" এই গল্পের মধ্যে সংস্কৃত শাস্ত্রে বিদ্যাসাগরের প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের প্রতি সুবিচার করা হয়নি। কিন্তু বিধবা বিবাহ আন্দোলনকে সম্পূর্ণভাবে সফল করে তোলার যে কৃতিত্ব তা বিদ্যাসাগরেরই প্রাপ্য। এই ঐতিহাসিক আদর্শসাধনে তিনি অসামান্য সাহস ও দৃঢ়তার পরিচয় দিয়েছিলেন।

এ কথা মনে করার কোনও কারণ নেই যে বিদ্যাসাগরকে প্রাচীন শাস্ত্র থেকে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তি আহরণ করার জন্য বিশেষ বেগ পেতে হয়েছিল। "পরাশর সংহিতা"র যে শ্লোকের উপর ভিত্তি করে তিনি

বিধবা বিবাহ প্রচলনের চেষ্টা করেছিলেন বৌধায়ন, নারদ প্রভৃতি ঋষিরা তার পুনরাবৃত্তি করে গেছেন এবং অগ্নিপুরাণ ও অন্যান্য পুরাণে সমর্থিত হয়েছে। যে স্ত্রীলোক ক্লীব বা জাতিচ্যুত স্বামীকে পরিত্যাগ করে দ্বিতীয়-বার বিবাহ করে তার সন্তানকে বৌধায়ন "পৌনর্ভব" বলে অভিহিত করেছেন। সে যুগে সমাজে যদি বিধবা বিবাহ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ থাকত তা হলে "পৌনর্ভব" সন্তানের প্রশ্নও থাকত না। নারদ, পরাশর ও অগ্নি-পুরাণ বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে একই শ্লোক উল্লেখ করেছেন—"নষ্টে মৃতে প্রব্রজিতে ক্লীবে চ পতিতে পতৌ। পঞ্চাস্বাপৎসু নারীণাং পতিরন্য বিধীয়তে॥" "পরাশর সংহিতা"র এই শ্লোকের অর্থ হল : স্বামী যদি নিরুদ্দেশ হয়, মারা যায়, প্রব্রজ্যা অবলম্বন করে, ক্লীব অথবা পতিত হয়, তাহলে এই পঞ্চপ্রকার আপদে নারীর অন্য পতি গ্রহণ বিধেয়।* অতএব বিদ্যাসাগরের মত পণ্ডিত ব্যক্তিকে এই শাস্ত্রীয় বিধান খুঁজে বের করার জন্য খুব পরিশ্রম করতে হয়েছিল একথা সম্ভব বলে মনে হয় না।

বহু যুগ ধরে ব্রাহ্মণ বা তার সমতুল্য উচ্চ শ্রেণীর মধ্যে বিধবা বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল বটে, কিন্তু অন্যান্য জাতির মধ্যে তা ছিল না। শূদ্র বা ঐ শ্রেণীর লোকেদের মধ্যে বিধবা বিবাহের প্রথা অনুমোদিত ছিল এবং এখনও আছে যদিও কুমারী বিবাহের তুলনায় বিধবা বিবাহকে কিছুটা নিকৃষ্ট মনে করা হয়। এই সব শ্রেণীর মধ্যে স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীর দ্বিতীয় বার স্বামী গ্রহণের অনুমতি আছে, এমন কি স্বামীর জীবদ্দশায়ও তা হতে পারে, যদি স্বামী লিখিতভাবে স্ত্রীকে "ফারখৎ" বা "সোদচিট্টি" (মুক্তি-পত্র) দেয়। এই ধরনের বিবাহকে মহারাষ্ট্রে 'পত', গুজরাটে 'নাত্রা' এবং কর্ণাটকের জেলাগুলিতে 'উদকী' বলা হয়।** বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় নিম্নশ্রেণী, সাঁওতাল ও অন্যান্য উপজাতির মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রচলিত আছে। সাধারণ ভাষায় একে বলা হয় 'নিকা'। বিদ্যাসাগর যে গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং বড় হয়েছিলেন তার আশেপাশে এই সব শ্রেণীর

*পি. ভি. কানে : হিস্টরি অব ধর্মশাস্ত্র, ২য় খণ্ড, ১ম ভাগ, পৃষ্ঠা ৬১০-১১
**ঐ, পৃষ্ঠা ৬১৫

বহু সংখ্যক লোক বাস করত। সম্ভবতঃ প্রথম যৌবনে তিনি এই সব লোকেদের সামাজিক প্রথা থেকে বিধবা বিবাহ প্রচলন করার ব্যাপারে প্রেরণা পেয়েছিলেন। সম্ভবতঃ অল্প বয়সেই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে ১৮২৯ সালে বেন্টিঙ্ক সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার পর বিধবাদের সমস্যা অত্যন্ত কঠিন রূপ ধারণ করেছে। কৌলিন্য প্রথার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বহুবিবাহ প্রথা তখন সমাজে খুবই প্রচলিত, অথচ সতীদাহের নৃশংস প্রথা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। সুতরাং বিধবাদের সংখ্যা ভয়ঙ্করভাবে বেড়ে গিয়েছিল। আর এই সব বিধবাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অল্পবয়সী। গত শতাব্দীর মাঝামাঝি এই সমস্যা এত গুরুতর আকার ধারন করেছিল যে বিচক্ষণ ব্যক্তিরা আশঙ্কা করলেন হয়ত সমাজের নৈতিক ভিত্তিই ভেঙ্গে পড়বে। বিদ্যাসাগরও এ কথা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। কিন্তু অন্য লোকের মত তিনি শুধু উপলব্ধি করেই ক্ষান্ত হননি। তিনি তাঁর চিন্তা-ধারাকে বাস্তবরূপ দেওয়ার জন্য একান্তভাবে চেষ্টা সুরু করেছিলেন।

বিধবা বিবাহের সমর্থনে বিদ্যাসাগর তাঁর প্রথম পুস্তিকা প্রকাশ করেন ১৮৫৫ সালের জানুয়ারী মাসে। পরাশরের যে বিখ্যাত শ্লোকের উপর তিনি তাঁর সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা করে লিখলেন : "স্বামী অনুদ্দেশ হইলে, মরিলে, ক্লীব স্থির হইলে, সংসার ধর্ম পরিত্যাগ করিলে অথবা পতিত হইলে, স্ত্রীদিগের পুনর্ব্বার বিবাহ করা শাস্ত্রবিহিত।"

এ সম্বন্ধে তিনি মন্তব্য করলেন : "পরাশর কলিযুগে বিধবাদের পক্ষে তিন বিধি দিতেছেন, বিবাহ, ব্রহ্মচর্য্য, সহগমন। তন্মধ্যে রাজকীয় আদেশক্রমে সহগমনের প্রথা রহিত হইয়া গিয়াছে। এক্ষণে বিধবাদিগের দুইমাত্র পথ আছে, বিবাহ ও ব্রহ্মচর্য্য ; ইচ্ছা হয় বিবাহ করিবেক, ইচ্ছা হয় ব্রহ্মচর্য্য করিবেক। কলিযুগে, ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া, দেহযাত্রা নির্ব্বাহ করা বিধবাদের পক্ষে অত্যন্ত কঠিন হইয়া উঠিয়াছে। এই নিমিত্তই, লোকহিতৈষী ভগবান পরাশর সর্ব্বপ্রথম বিবাহেরই বিধি দিয়াছেন। সে যাহা হউক, স্বামীর অনুদ্দেশ প্রভৃতি পাঁচ প্রকার বৈগুণ্য ঘটিলে, স্ত্রীলোকের

পক্ষে বিবাহের স্পষ্ট বিধি প্রদর্শিত হওয়াতে, কলিযুগে, সেই সেই অবস্থায়, বিধবার পুনর্ব্বার বিবাহ শাস্ত্রসম্মত কর্ত্তব্য কর্ম্ম বলিয়া অবধারিত হইতেছে।"

এই ব্যাখ্যা নিয়ে তীব্র বাদানুবাদের সৃষ্টি হল। কয়েকজন পণ্ডিত বললেন যে এই শ্লোকে অন্য কোনও যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্বন্ধে বলা হয়েছে, অতএব তা কলিযুগ বা বর্তমান যুগ সম্বন্ধে প্রযোজ্য নয়। নবদ্বীপ ও ভাটপাড়ার প্রাচীন শাস্ত্র চর্চার কেন্দ্র থেকে পণ্ডিতেরা এসে উত্তর কলকাতায় রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে সম্মিলিত হলেন। শোভাবাজার রাজ পরিবারের সুযোগ্য সন্তান রাধাকান্ত দেব শুধু যে সংস্কৃত বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাই নয়, হিন্দু সমাজের অন্যতম ধনী ও অগাধ প্রতিপত্তি-শালী নেতা ছিলেন। রক্ষণশীল হিন্দুদের এই নেতা একটি সৌজন্যের কাজ করেছিলেন—তিনি বিদ্যাসাগরকে ঐ পণ্ডিত সম্মেলনে যোগ দিতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। প্রথম দিনের তর্কবিতর্কে তরুণ পণ্ডিত ও সংস্কারক বিদ্যাসাগর প্রধান বিদগ্ধ সমাজের কাছে তাঁর সিদ্ধান্ত অত্যন্ত জোরালোভাবে এবং দক্ষতার সঙ্গে প্রতিপন্ন করলেন। রাজা রাধাকান্ত এতে খুবই চমৎকৃত হয়েছিলেন। তিনি অবশ্য বিদ্যাসাগরের সঙ্গে অনেক বিষয়ে একমত হলেন না। তবুও সে দিনের শ্রেষ্ঠ বক্তা হিসাবে বিদ্যাসাগরকে এক জোড়া শাল উপহার দিয়েছিলেন। সংরক্ষণশীল দলের নেতারা ভাবলেন যে তাঁদের শ্রদ্ধেয় সমাজপতিকে বিদ্যাসাগর বশ করে ফেলেছেন। এর ফলে কলকাতার হিন্দু সমাজে একটা অভূতপূর্ব আলোড়ন সৃষ্টি হল এবং দলে দলে লোক রাজা রাধাকান্তের কাছে গিয়ে জানতে চাইল বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ প্রস্তাব সম্বন্ধে তাঁর মত কি? রাজা তাঁদের এই কথা বলে নিরস্ত করলেন যে তিনি কোনও মতেই বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন না এবং বিদ্যাসাগরের যুক্তিতে তিনি তাঁর মত পরিবর্তন করেন নি। বিদ্যাসাগরকে তিনি পুরস্কার দিয়েছেন একমাত্র তাঁর অসামান্য যুক্তি ও পাণ্ডিত্যের জন্য।

লোকেরা যাতে কোনও রূপ ভুল ধারণা না করে সেজন্য রাজা তাঁর বাড়ীতে দ্বিতীয় পণ্ডিত সম্মেলনের আয়োজন করলেন। সেই সভায় স্মৃতি শাস্ত্রে পারদর্শী বিখ্যাত পণ্ডিত ব্রজনাথ বিদ্যারত্ন উপস্থিত ছিলেন। এবারে

রাজা পণ্ডিত ব্রজনাথকেও এক জোড়া শাল উপহার দিলেন। ব্রজনাথ তীব্র ভাষায় বিদ্যাসাগরের প্রবল বিরোধিতা করেছিলেন। রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে এই সব পণ্ডিত সম্মেলন থেকে বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন যে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে এক ভয়ঙ্কর প্রতিবাদের ঝড় উঠবে।

পণ্ডিত সমাজ ও হিন্দুদের সভাসমিতির পক্ষ থেকে অনেক বির্তক-মূলক পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল। অনেক ব্যক্তি নিজের পক্ষ থেকেও পুস্তক পুস্তিকার মাধ্যমে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে লাগলেন। কলকাতার ধর্মসভা, যশোহরের হিন্দুধর্ম সংরক্ষিণী সভা ও অন্যান্য সঙ্ঘ তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এই উপলক্ষে বাংলা সাহিত্যে অনেক ব্যঙ্গ কবিতা, নাটক, পারিবারিক গল্প, নকশা জাতীয় রচনার সৃষ্টি হয়েছিল। সে যুগের প্রধান ব্যঙ্গ কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে কয়েকটি মজার কবিতা লিখেছিলেন। সে যুগের একজন জনপ্রিয় গীতিকার দাশরথি রায়ও এ সম্বন্ধে কতকগুলি গান বেঁধেছিলেন। সেগুলি গ্রামে ও শহরে মেলা বা উৎসব উপলক্ষে জনসাধারণ মজা করে গাইত। এমন কি শান্তিপুর, ঢাকা ও অন্যান্য স্থানের বিখ্যাত বাঙালী তাঁতীরা শাড়ীর পাড়ে বিধবা বিবাহের ছড়া বুনে দিত। জনসাধারণের মধ্যে থেকে এই যে অজস্র কবিতা, গান, নাটক ও কাহিনী উৎসারিত হয়ে উঠেছিল, এর মধ্যে বিধবা বিবাহের বিরুদ্ধে কোনও আক্রোশ ছিল না, ছিল এই মহান প্রচেষ্টা সম্বন্ধে এক সশ্রদ্ধ বিস্ময় আর বিদ্যাসাগরের প্রতি গভীর ভালবাসা ও সম্ভ্রম। জনসাধারণ বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে কখনও কোনও বিদ্বেষ প্রকাশ করেনি, একমাত্র গোঁড়া হিন্দু নেতা এবং প্রাচীন পন্থী পণ্ডিতেরা তাঁর নিন্দা ও কুৎসা করেছিলেন।

১৮৫৪ সালের অক্টোবর মাসে বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের দ্বিতীয় পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। এই পুস্তিকায় তিনি প্রতিপক্ষের যুক্তিগুলি অত্যন্ত সংযত এবং মার্জিত ভাষায় খণ্ডন করেন। কিন্তু এতে বিরুদ্ধ দল ক্ষান্ত হলেন না। তাঁদের আক্রোশ বেড়েই চলল। বিদ্যাসাগর বুঝলেন যে এ সব তর্ক বিতর্কে কোনও লাভ হবে না। অতএব তিনি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য প্রস্তুত হলেন।

১৮৫৫ সালের ৪ঠা অক্টোবর বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহকে বিধিসম্মত করবার জন্য ভারত সরকারের কাছে একটি আবেদন পত্র পাঠান। এই আবেদন পত্র বর্তমানে ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় (ন্যাশনাল আরকাইভস্) রক্ষিত আছে। এতে বিদ্যাসাগর ছাড়া ৯৮৭ জনের স্বাক্ষর ছিল। নিম্নলিখিত চিঠির সঙ্গে এই আবেদন পত্র পাঠান হয়েছিল।

ডবলিউ মরগ্যান, এস্কোয়্যার
ভারতের ব্যবস্থাপক সভার মাননীয় করণিক মহোদয় সমীপেষু—

মহাশয়,

আমি স্বাক্ষরকারীদের পক্ষে বাংলাদেশের কয়েকজন হিন্দু অধিবাসীর এই আবেদন পত্র সবিনয়ে প্রেরণ করছি। আমার অনুরোধ যে আপনি অনুগ্রহ করে এই পত্র মাননীয় ব্যবস্থাপক সভার আগামী অধিবেশনে উপস্থাপিত করবেন।

কলিকাতা,
সংস্কৃত কলেজ,
৪ঠা অক্টোবর,
১৮৫৫।

বিনীত নিবেদন—
আপনার একান্ত অনুগত ভৃত্য
স্বাঃ ঈশ্বরচন্দ্র শর্ম্মা

আবেদনপত্রের ৮ থেকে ১১ অনুচ্ছেদ ছিল এইরূপ :

৮। আপনার আবেদনকারীরা সবিনয়ে এই মত প্রকাশ করছে যে ব্যবস্থাপক সভার উচিত এমন সব প্রচলিত সামাজিক প্রথা দূরীকরণে সাহায্য করা যা হিন্দু জনসাধারণের অনেকের মতে অত্যন্ত ক্ষতিকর এবং হিন্দু শাস্ত্রের প্রকৃত তাৎপর্যের বিরোধী।

৯। বিধবা বিবাহের বিপক্ষে আইনগত বাধা দূর করাতে বহু সংখ্যক ধার্মিক ও রক্ষণশীল হিন্দুদেরও সমর্থন আছে এবং যাঁরা সত্যই বিধবা বিবাহ শাস্ত্রানুসারে নিষিদ্ধ মনে করেন অথবা সামাজিক সুবিধালাভের জন্য এই নিষেধ সমর্থন করেন তাঁদের কুসংস্কারে আঘাত লাগলেও সত্যকারের কোনও ক্ষতি হবে না।

১০। বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রকৃতি বিরুদ্ধ নয়, অথবা অন্য কোনও দেশের রীতি বিরুদ্ধ নয় বা পৃথিবীর অন্য কোনও সমাজে নিষিদ্ধ নয়।

১১। অতএব আবেদনকারীদের বিনীত প্রার্থনা এই যে মাননীয় ব্যবস্থাপক সভা যেন একটি আইন প্রণয়নের (আইনের খসড়া সংযুক্ত করে দেওয়া হল) যুক্তিযুক্ততা বিবেচনা করেন যাতে বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইনগত বাধা দূর হয় এবং এই বিবাহের সন্তান সন্ততিরা বৈধ বলে ঘোষিত হয়।

১৮৫৫ সালের ১৭ই নভেম্বর ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য মিঃ জে. পি. গ্র্যান্ট সভায় একটি বিল উপস্থাপিত করলেন যার নাম হল "এ্যান এ্যাক্ট টু রিমুভ অল অবষ্ট্যাক্‌ল্‌স্ টু দি ম্যারেজ অব হিন্দু উইডোজ" (হিন্দু বিধবাদের পুনর্বিবাহের সকল বাধা দূর করবার জন্য প্রণোদিত আইন)। এই বিল পেশ করার সময় তিনি বললেন : "বলা হয়ে থাকে যে এই প্রথা (বিধবা বিবাহ নিষেধ) অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও অস্বাভাবিক। শুধু নৈতিক দিক দিয়ে নয়, সামাজিক দিক দিয়েও অত্যন্ত ক্ষতিকর। এই কথা মেনে নিয়ে প্রস্তাবিত বিলে যুক্তি দেখান হয়েছে যে এমন একটি ক্ষতিকর প্রথা অনিচ্ছুক লোকেদের উপর জোর করে চাপানো উচিত নয় এবং এই প্রার্থনা করা হচ্ছে যে আবেদনকারীরা যখন বলছেন যে এই নিষেধাজ্ঞা হিন্দু শাস্ত্রের যথার্থ ব্যাখ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত নয়, তখনও এঁদের এবং যাঁরা এঁদের সঙ্গে একমত, তাঁদের উপর থেকে এই নিষেধাজ্ঞা তুলে নেওয়া হোক।"

বিল সম্বন্ধে কাউন্সিলে যখন আলোচনা চলছিল, তখন শুধু বাংলা দেশে নয় সারা ভারতবর্ষের লোকের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হয়েছিল। সর্বত্রই বিধবা বিবাহের সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের সিদ্ধান্ত নিয়ে বাদানুবাদ চলতে সুরু করেছিল। বহুলোক নিজেদের মতামত জানিয়ে কাউন্সিলের কাছে আবেদনপত্র পাঠাতে লাগল।

ভারতের জাতীয় মহাফেজখানায় (ন্যাশনাল আরকাইভস্ অব ইণ্ডিয়া) বিবা বিবাহ সম্বন্ধে যে সব দলিল পত্র রক্ষিত আছে তা থেকে

দেখা যায় যে বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে ও বিপক্ষে নানারকম যুক্তি দেখিয়ে পুনা, ভিনচুর, সেকেন্দ্রাবাদ, সাতারা, ধারওয়ারা, বোম্বাই, আমেদাবাদ, সুরাট এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে ব্যবস্থাপক সভার কাছে বহু আবেদনপত্র এসেছিল। ভিনচুরের মারাঠী সমাজের প্রধান ১২ই জানুয়ারী ১৮৫৬ সালে তাঁর আবেদনপত্রে লিখেছিলেন: "...... প্রস্তাবিত আইনের বিশদ বিবরণ নিয়ে আলোচনা করা আমরা অনাবশ্যক মনে করি। যে নীতি অনুসারে এই আইনের প্রস্তাব হয়েছে আমরা শুধু সে সম্বন্ধে আমাদের আন্তরিক সমর্থন জানাতে চাই এবং নিবেদন করতে চাই যে পুনর্বিবাহে যদি আইনগত কোনও বাধা থাকে তবে ব্যবস্থাপক সভা যেন তা দূর করেন।"

পুনা থেকে ১৮৫৫ সালের ৭ই নভেম্বর তারিখে লেখা ৪৬টি স্বাক্ষর সম্বলিত এক আবেদনপত্রে বলা হয়েছিল: "আমরা জানতে পারলাম যে আলোকপ্রাপ্ত হিন্দু অধিবাসীদের নেতৃত্বে বাংলা দেশে বিধবাদের পুনর্বিবাহের আইনগত বাধা দূর করবার জন্য একটি আন্দোলন চলছে। যাঁরা ভারতের সত্যকারের কল্যাণকামী তাঁরা এই প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা অবশ্য সমর্থন করবেন। এই প্রথায় হাজার হাজার নিরপরাধ এবং হতভাগ্য রমণীকে শুধু যে অসীম দুঃখভোগ করতে হয় তাই নয়, বর্তমানে সমাজে যে সব দুর্নীতি ও অপরাধ ঘটে থাকে তারও মূলে এই প্রথা। বিধবা বিবাহের বিধিগত বাধা দূর করলেই যে সমাজ অবিলম্বে সে কথা মেনে নেবে তা আমরা মনে করি না। হিন্দুদের মন থেকে কোনও প্রাচীন প্রথার প্রভাব দূর করার একমাত্র উপায় হচ্ছে চারিদিকে জ্ঞানের আলোক বিস্তার করা, লোকের মন থেকে ভ্রান্ত ধারণা দূর করা এবং ধীরে ধীরে হিন্দু সমাজের উন্নতি বিধান করা......।"

সেকেন্দ্রাবাদের ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এবং "ভদ্র হিন্দুরা" ১৮৫৬ সালের ২রা মার্চ তাঁদের আবেদন পত্রে লিখেছিলেন: "বাংলার কয়েকজন হিন্দু অধিবাসী বিধবা বিবাহকে বিধিসম্মত করবার জন্য যে আবেদনপত্র ও আইনের খসড়া দাখিল করেছেন আমরা তার একটি প্রতিলিপি পেশ করে ঐ আবেদন সমর্থন করবার অনুমতি প্রার্থনা করি।"

অনেক আবেদনপত্রে ভারতীয় ঐতিহ্য ও সামাজিক আচারে বৃটিশ গভর্ণমেণ্টের এই হস্তক্ষেপের প্রবল প্রতিবাদ করা হয়েছিল। এই সম্পর্কিত দলিল পত্র থেকে দেখা যায় যে বাংলার বাইরে মহারাষ্ট্রে এবং দক্ষিণ ভারতের কোনও কোনও অঞ্চলে বিধবা বিবাহ আন্দোলন সম্বন্ধে জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। বাংলা দেশ দুই দলে বিভক্ত হয়েছিল—বিদ্যাসাগর পন্থী ও ধর্মসভা পন্থী। কথাবার্তা ও আলোচনার ভিতর দিয়ে ধীরে ধীরে জনমত গড়ে উঠল। এই বিষয়ে অন্ততঃ ১০০ খানা পুস্তিকা প্রকাশিত হয়েছিল এবং বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে ৫০,০০০ স্বাক্ষরযুক্ত ২০ খানি দরখাস্ত ভারত সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। সংখ্যার দিক দিয়ে দেখতে গেলে বাংলা দেশের বেশী সংখ্যক আবেদনকারীই বিদ্যাসাগর ও তাঁর সংস্কার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে মত দিয়েছিলেন। আবেদনকারীদের মধ্যে মাত্র শতকরা দশজন বিদ্যাসাগরের পক্ষে ছিলেন এবং তাঁরা বিধবা বিবাহকে আইন সম্মত করবার প্রার্থনা জানিয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে প্রবলতম প্রতিবাদ এসেছিল সনাতন পন্থী হিন্দু সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেবের কাছে থেকে। ইনি ১৮৫৬ সালের ১৭ই মার্চ তারিখে বিদ্যাসাগরের প্রস্তাবের বিরোধিতা করে ৩৬,৭৬৩টি স্বাক্ষর সম্বলিত একটি আবেদনপত্র পাঠান। এই পত্রে অনেক কথা বলা হয়েছিল। তার মধ্যে একটি হল এই যে বিদ্যাসাগরের সমর্থনকারীদের সংখ্যা অত্যন্ত কম। অতএব এক তুচ্ছ সংখ্যালঘুগোষ্ঠির স্বার্থে সংখ্যাগরিষ্ঠদের অধিকার ক্ষুণ্ণ করে আইন তৈরী করা উচিত হবে না। বাংলা দেশ থেকে প্রায় এক হাজার জন পণ্ডিত দ্বারা স্বাক্ষরিত আর একটি দরখাস্ত পেশ করা হয়েছিল প্রস্তাবিত আইনের বিরুদ্ধে।

প্রস্তাবিত আইনের সমর্থনে বাংলা দেশ থেকে যে আবেদনপত্রগুলি পাঠানো হয়েছিল তার মধ্যে কয়েকটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য; যেমন, ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর মাসে প্রেরিত নদীয়ার জমিদার মহারাজ শ্রীশচন্দ্র ও তাঁর দেওয়ান কার্ত্তিকেয় চন্দ্র রায় (ডি. এল. রায়ের পিতা) ও কৃষ্ণনগরের ২৬জন বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরিত আবেদনপত্র, ১৮৫৫ সালের ডিসেম্বর

মাসে প্রেরিত কৃষ্ণনগর ও নিকটবর্ত্তী অঞ্চলের প্রায় ১২৯ জনের স্বাক্ষর সম্বলিত দরখাস্ত; বঙ্গীয় বৈষ্ণব সমাজের বিখ্যাত সাংস্কৃতিক কেন্দ্র শান্তি-পুর থেকে প্রেরিত দরখাস্ত; প্রস্তাবিত বিলের স্বপক্ষে ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষাল ১৮৫৬ সালে ৫৩১ জনের স্বাক্ষরযুক্ত এক প্রার্থনা পত্র পাঠান—বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রধান গোঁসাইরা এই দরখাস্তে সই করেছিলেন; মুর্শিদাবাদ থেকে সুরেশচন্দ্র বিদ্যারত্ন, মদনমোহন তর্কালঙ্কার প্রমুখ কয়েকজন পণ্ডি-তের স্বাক্ষর করা এক আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন—তর্কালঙ্কার ছিলেন শিক্ষা ও সমাজ সংস্কার ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠ সহযোগী। ১৮৫৬ সালের মার্চ মাসে প্রস্তাবিত বিলের সমর্থনে রাজনারায়ণ বসু মেদিনীপুর অঞ্চলের অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন —প্রসঙ্গত, রাজনারায়ণ ছিলেন একজন প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা এবং বাংলা দেশে আধুনিক জাতীয়তার জনক; বধমান, বাঁকুড়া ও ২৪ পরগণা জেলাগুলি থেকে বহুলোক বিল সমর্থন করে দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন; পূর্ববঙ্গের সুদূর চট্টগ্রাম জেলার হিন্দু অধিবাসীরা বিল সমর্থন করে ১৮৫৬ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি দরখাস্ত পাঠিয়েছিলেন।

বিধবা বিবাহ সম্পর্কিত দলিল পত্রের মধ্যে সবচেয়ে বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে আবেদন পত্রটি পাওয়া গেছে সেটি পাঠিয়েছিলেন রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, রাধানাথ শিকদার, প্যারীচাঁদ মিত্র ও অন্যান্য প্রধান ডিরোজীয় শিষ্যগণ। এই দরখাস্তে উল্লিখিত আইনের প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়টি সমর্থন করে প্রস্তাব করা হয়েছিল যে বর্তমান যুগের স্ত্রী পুরুষের সমান অধিকারের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ আইনের আমূল পরিবর্তন করা হোক। এই তথ্যটি আগে জানা ছিল না। আইনটি পরিবর্তন করবার কারণ হিসাবে বলা হয়েছিল: "এই প্রস্তাবিত আইনে বিধবা বিবাহ যে কি হলে বৈধ হবে তার কোনও সংজ্ঞা দেওয়া হয়নি। অথচ এই সংজ্ঞা অত্যন্ত প্রয়োজন। কেননা বিধবা বিবাহের প্রচলন হলে হিন্দু সমাজে একটা নতুন পরিস্থিতির উদ্ভব হবে এবং বিভিন্ন লোক বিভিন্ন অনুষ্ঠান অনুসারে বিধবা বিবাহের ব্যবস্থা করবেন, এমন কি এই সব বিবাহ নিয়ে আদালতে অনেক বিবাদ বিসংবাদও হবে।"

কথাটি অত্যন্ত যুক্তি সম্মত বলে মনে হয়। এইটেই ছিল বিধবা বিবাহ সম্বন্ধীয় আইনের খসড়ার সবচেয়ে বড় ক্রুটী এবং ডিরোজীয় শিষ্যরা চেয়েছিলেন আইন পাস হওয়ার পূর্বে এই ক্রুটী সংশোধন করতে। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠী প্রস্তাব করেছিলেন যে বিবাহের পূর্বে পাত্র ও পাত্রী ছুটি পৃথক ঘোষণা পত্রে সই করবে। বিবাহের কার্যক্রম এইরূপ হবে,—

ঘোষণাপত্র

"আমি………… ‥, বিপত্নীক বা অবিবাহিত পুরুষ এবং আমি ………………, বিধবা বা অবিবাহিতা মহিলা, যুক্তভাবে এবং একক ভাবে ঘোষণা করছি যে আমরা সম্পূর্ণ স্বাধীনভাবে এবং স্বেচ্ছায় আজ ……………তারিখে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হলাম……"

চুক্তিপত্র

"আমি………………আজ………………কে আমার বিবাহিত স্ত্রী রূপে গ্রহণ করে এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে আমি এর জীবদ্দশায় দ্বিতীয়বার বিবাহ করব না এবং আমি যদি এই চুক্তি ভঙ্গ করি তবে আমার দ্বিতীয় বিবাহের দিনে আমি একে কোম্পানীর টাকার হিসাবে …………টাকা ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকব।"

সংশোধন প্রস্তাবে এও বলা হয়েছিল যে আইনে একটি বিবাহ রেজিষ্ট্রেশন ধারা থাকা উচিত। "এই ধারা অনুসারে যে রীতিতেই হিন্দু বিধবার বিবাহ সম্পন্ন হোক না কেন সে বিবাহ তখনই বৈধ হবে যখন তা গভর্ণমেণ্ট দ্বারা নিযুক্ত কর্মচারীদের সামনে পাত্র পাত্রীর দ্বারা রেজিষ্ট্রী করা হবে।" বস্তুতপক্ষে বিধবা বিবাহের জন্য এই সংশোধিত প্রস্তাবটি ১৮৭২ সালের সিভিল ম্যারেজ এ্যাক্ট বা বিধানিক বিবাহ আইন নং ৩ যখন পাশ হয় তখন তাতে সংযোজিত হয়েছিল। ব্রাহ্ম বিবাহের রূপ ও রীতি নিয়ে অনেক বাদানুবাদের পর প্রধানতঃ কেশবচন্দ্র সেনের উদ্যোগে এই আইনপাশ হয়েছিল।

কিন্তু ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই যখন বিধবা বিবাহ বিল নিয়ে আলোচনা চলছিল, তখন এই অত্যন্ত জরুরী সংশোধন প্রস্তাব সে বিলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। বিদ্যাসাগর স্বয়ং বা ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা কেউই সেদিনে এ প্রস্তাবের গুরুত্ব বুঝতে পারেন নি। ডিরোজীয় শিষ্যদের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের খুবই সদ্ভাব ছিল এবং তাঁরা যে বিদ্যাসাগরকে তাঁদের সংশোধন প্রস্তাব সম্বন্ধে কিছু জানাননি তা বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হয় না। সম্ভবতঃ বিবাহ রেজিস্ট্রী করার ব্যাপারে বিদ্যাসাগর তাঁদের সঙ্গে একমত ছিলেন না।

বিদ্যাসাগর এবং ডিরোজীয় শিষ্যদের মধ্যে যে পার্থক্য ছিল তা অনুমান করা কঠিন নয়। হিন্দু বিবাহের অনুষ্ঠানের মধ্যে তিনি আমূল পরিবর্তন আনবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি হিন্দু বিবাহের প্রচলিত কাঠামোর সঙ্গে বিধবা বিবাহের পরিকল্পনাকে খাপ খাওয়াতে চেয়েছিলেন। সেই কাঠামোর সীমানার মধ্যে কাজ করার ফলে আইন পাশ হওয়ার পরে বিদ্যাসাগরকে অনেক বিশৃঙ্খল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। আইন যখন কাজে পরিণত হতে লাগল তখন ডিরোজীয় শিষ্যরা তার যে ত্রুটী দেখিয়েছিলেন তা প্রকট হয়ে উঠতে লাগল। বেশীরভাগ বিধবা বিবাহই শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল, কারণ স্বেচ্ছায় যে সব পুরুষ বিধবা বিবাহ করবার জন্য এগিয়ে এসেছিল শীঘ্রই দেখা গেল তারা অত্যন্ত সুবিধাবাদী ও কাপুরুষ। অবস্থার সুযোগ নিয়ে তারা বিধবা বিবাহের পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করতে লাগল। এমন কি বিদ্যাসাগর নিজে অনেক টাকা খরচ না করে অব্যাহতি পেলেন না। এখানে উল্লেখযোগ্য যে জীবনের শেষ ভাগে তাঁকে ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর প্রস্তাব পরোক্ষভাবে মেনে নিতে হয়েছিল। তিনি নিজে একটি চুক্তিপত্রের খসড়া করে পাত্র পাত্রীকে বিবাহের পূর্বে তা'তে সই করতে বাধ্য করেছিলেন। হিন্দু বিবাহের আনুষ্ঠানিক রূপটি থেকে গেল, বহু বিবাহও রদ হল না। এ অবস্থায় কেবলমাত্র বিধবা বিবাহ আইনসঙ্গত করলেই যে কোন সুবিধা হবে না তা সুনিশ্চিত ছিল।

১৮৫৬ সালের ১৯শে জুলাই তারিখে বিধবা পুনর্বিবাহ বিধেয়ক বিল তৃতীয়বার আলোচনার পর ১৮৫৬ সালের পঞ্চদশতম আইন হিসাবে পাশ হল। ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই বড়লাট এই আইনে স্বাক্ষর করে একে চালু করলেন। এতে ঘোষণা করা হল : "পাত্রী বিধবা বা কোনও (অধুনা) মৃত ব্যক্তির বাগদত্তা, কেবল মাত্র এই কারণে কোনও হিন্দু বিবাহ আইন বিরুদ্ধ হবে না এবং এরকম বিবাহের সন্তান অবৈধ বলে বিবেচিত হবে না। এর বিরুদ্ধে হিন্দুশাস্ত্রের কোনও ব্যাখ্যা বা কোনও প্রথা থাকলেও এই আইন বলবৎ থাকবে।"

সুহৃদ সমিতি (দি এ্যাসোসিয়েশান অব ফ্রেণ্ডস্ ফর দি সোশ্যাল ইমপ্রুভমেণ্ট অব বেঙ্গল) তখনকার দিনে প্রগতিশীল সংস্কারকদের একটি প্রধান প্রতিষ্ঠান ছিল। এই সমিতির ১৮৫৬-৫৭ সালের বার্ষিক বিবরণীতে লেখা হয়েছিল : "এই আইনে বিধবা বিবাহের অনুমতি দেওয়া হয়েছে মাত্র এবং তাইই হওয়া উচিত। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই আইনে রেজিষ্ট্রেশান বা অন্য কোন পন্থার কথা বলা হয়নি যার দ্বারা এইরূপ বিবাহের বৈধতা প্রতিষ্ঠিত করা যেতে পারে। আমাদের দেশে সচরাচর মিথ্যা দোষারোপ করা হয়ে থাকে এবং স্বার্থান্বেষী ব্যক্তিরা নানারকম গোলমাল করতে পারে। অতএব এই সমিতি প্রস্তাব করছে যে এর পর আরও উদার বা ব্যাপক ধরনের বিবাহ বিষয়ক আইন করা উচিত। ১৮৫৬ সালের ত্রুটিপূর্ণ বিবাহ আইন সংস্কারের যে পরিকল্পনা এই সমিতি করেছিলেন সেই অনুসারে আর একটি আইন হওয়া উচিত।"

কিন্তু কোন কিছুতেই বিদ্যাসাগর পশ্চাৎপদ হলেন না,—তিনি এই আইনকে বাস্তবক্ষেত্রে চালু করতে উদ্যোগী হলেন। আইন পাশ হওয়ার পর চার মাস পর্যন্ত কেউই বিধবা বিবাহ করবার জন্য এগিয়ে এল না। এই আইনে প্রথম বিধবা বিবাহ হল ১৮৫৬ সালের ৭ই ডিসেম্বর। ভারতীয় নারীর সামাজিক অধিকারের ইতিহাসে সে দিনটি স্মরণীয় হয়ে আছে। পাত্র ছিলেন পণ্ডিত শ্রীশচন্দ্র বিদ্যারত্ন। তিনি ছিলেন ২৪ পরগণা জেলার

খাটুরা গ্রামের বিখ্যাত কথক রামধন তর্কবাগীশের পুত্র। পাত্রী ছিলেন দশ বছর বয়স্কা বাল বিধবা কালীমতী দেবী, নিবাস বধমান জেলার পলাশ-ডাঙ্গা গ্রামে। বিবাহের দিন পূর্বেই স্থির হয়েছিল। কিন্তু বাংলা সাময়িক পত্র 'সংবাদ ভাস্কর' এবং ২৭শে নভেম্বর ১৮৫৬, তারিখের 'ইংলিশ ম্যান' সংবাদপত্র মারফৎ জানা গেল যে সামাজিক অত্যাচারের ভয়ে শ্রীশচন্দ্র বিয়ে এড়াতে চাইছিলেন। কিন্তু পাত্রীপক্ষ বিয়ে দিতে দৃঢ় সঙ্কল্প ছিলেন। খবরটা তখন চারদিকে ছড়িয়ে পড়েছে। পাত্রীপক্ষ পাত্রের বিরুদ্ধে সুপ্রীম কোর্টে মোকর্দ্দমা দায়ের করলেন উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ আদায়ের জন্য। 'সংবাদ ভাস্কর' এবং 'ইংলিশ ম্যান' শ্রীশচন্দ্রের দুর্বলচিত্ততা নিয়ে বিদ্রূপ করলেন এবং পাত্রীর মা লক্ষ্মীমণি দেবীর দৃঢ়তার প্রশংসা করলেন। পরে পাত্র মত পরিবর্তন করে বিবাহ করতে রাজী হলেন। সম্ভবতঃ তাঁর বন্ধুরা, বিশেষ করে বিদ্যাসাগর, তাঁকে বুঝিয়ে সুজিয়ে রাজী করিয়েছিলেন। শ্রীশচন্দ্র সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক ও বিদ্যাসাগরের সহকর্মী ছিলেন। পরে মুর্শিদাবাদের জজ পণ্ডিতের পদে উন্নীত হয়েছিলেন।

এ ঘটনা জনসাধারণের মনে যে কতটা কৌতূহল ও আগ্রহের সৃষ্টি করেছিল তা সংবাদপত্রের ও কয়েকজন ভাগ্যবান প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ থেকে বুঝতে পারা যায়। বিদ্যাসাগরের অন্তরঙ্গ বন্ধু রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জীর উত্তর কলকাতার সুকিয়া স্ট্রীটের বাড়ীতে এই বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল নেতৃবর্গ ও বুদ্ধিজীবী ব্যক্তিরা প্রায় সকলেই বিবাহ সভায় উপস্থিত থেকে পাত্র পাত্রীকে উৎসাহিত করেছিলেন এবং বিদ্যাসাগরের এই প্রথম প্রচেষ্টার কঠিন মুহূর্তে তাঁর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। বিবাহ সভায় উপস্থিত ব্যক্তিদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ছিলেন ডিরোজীয় শিষ্যদের অন্যতম প্রধান রাম গোপাল ঘোষ, রাজা রামমোহন রায়ের পুত্র রমাপ্রসাদ রায়, বিশিষ্ট ডিরোজীয় ছাত্র শিষ্য রাজা দিগম্বর মিত্র, বাংলা সাহিত্যের প্রথম ঔপন্যাসিক ও বিখ্যাত সংস্কারক প্যারীচাঁদ মিত্র, শক্তিশালী ব্যঙ্গ রচয়িতা ও প্রগতিশীল মনোভাবাপন্ন

কালী প্রসন্ন সিংহ এবং 'সংবাদ ভাস্কর পত্রিকা'র সম্পাদক পণ্ডিত গৌরী শঙ্কর ভট্টাচার্য। রাত্রি প্রায় ১১টার সময় রাজকৃষ্ণবাবুর সুকিয়া স্ট্রীট ভবনে পাল্কী চড়ে বর পৌঁছানর সঙ্গে সঙ্গে চারিদিকে বিপুল হর্ষধ্বনি উঠল। ধর্মসভার লোকেরা কোনও গোলমাল করতে পারে বা বরযাত্রীদের উপর আক্রমণ করতে পারে আশঙ্কা করে বিদ্যাসাগর নিজে রাম গোপাল ঘোষের মত কয়েকজন বন্ধুকে নিয়ে পাল্কীর সঙ্গে সঙ্গে ভিড়ের ভিতর দিয়ে বরকে বিবাহ সভায় নিয়ে এলেন।

ঊনবিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ব্রাহ্মনেতা শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'মেন আই হ্যাভ সীন'* নামক গ্রন্থে প্রথম বিধবা বিবাহের বর্ণনা দিয়েছেন: "এই ভাবে কিছুদিন চলবার পর ১৮৫৬ সালের শীতকালে বাবু রাজকৃষ্ণ ব্যানার্জীর বাড়ীতে প্রথম হিন্দু বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হল। সে দিনের কথা আমি কখনও ভুলব না। যখন বিদ্যাসাগর মহাশয় শোভাযাত্রা করে তাঁর বন্ধু অর্থাৎ বরকে নিয়ে উপস্থিত হলেন তখন লোকের এত ভীড় হয়েছিল যে রাস্তায় এক ইঞ্চি জায়গা ছিলনা এবং অনেকে রাস্তার ধারের নর্দমার মধ্যে পড়ে গিয়েছিল। অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়ে যাবার পর এই বিবাহ নিয়ে জল্পনা কল্পনা চলতে লাগল বাজারে, দোকানে, পথেঘাটে, পার্কে, ছাত্রাবাসে, বৈঠকখানায়, অফিসে এবং সুদূর গ্রামাঞ্চলের গৃহে গৃহে। এমন কি মহিলারাও এ বিষয়ে উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করতে লাগলেন। শান্তিপুরের তাঁতীরা যে সব নতুন শাড়ী বুনতে সুরু করল তার পাড়ে একটি নতুন গানের প্রথম লাইন "বেঁচে থাক বিদ্যাসাগর" বুনে দিতে লাগল। এইভাবে এমন ভাবে একটা আন্দোলন সুরু হল যা এ দেশে কখনও দেখা যায় নি।"

পরদিনই দ্বিতীয় বিবাহ সম্পন্ন হল। বিবাহ হয়েছিল উচ্চবর্ণের কায়স্থ পরিবারের পাত্রপাত্রীর মধ্যে। এই দ্বিতীয় বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে

*কলিকাতা ১৯১৯

'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' নিম্নলিখিত মন্তব্য করেছিলেন "আমরা পরম আহ্লাদের সহিত জ্ঞাপন করিতেছি যে আমাদের চিরবাঞ্ছিত বিধবা বিবাহের প্রথা প্রচলিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে।...ইহার (কন্যার) জননী...তাহার পুনঃ পরিণয় ক্রিয়া সম্পাদনার্থে অতীব যত্নশীলা হয়েন এবং সেই যত্নানুসারে এই শুভকর্ম্ম সম্পন্ন হয়।" এই পত্রিকা আবেগপূর্ণ ভাষায় বিদ্যাসাগরের মহান স্বার্থত্যাগের প্রশংসা করেছিলেন এবং বিধবা বিবাহের বিরোধীদের সম্বন্ধে অত্যন্ত বিদ্রূপাত্মক মন্তব্য করেছিলেন। বিশেষ করে গোঁড়া সম্প্রদায়ের উপর 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' আক্রমণ চালিয়েছিলেন।

"......ইহাতে হিন্দু ধর্ম্মাভিমানী প্রতিপক্ষীয় মহাশয়রা কি জন্য যে উৎসাহিত না হইয়া বিষণ্ণ হইবেন তাহা আমাদিগের বুঝিবার শক্তি নাই .. ..কিন্তু যাঁহারা বুদ্ধিমান বলিয়া মনে মনে অভিমান করেন, পণ্ডিত বলিয়া পরিচয় দেন এবং ধর্ম্মপালক বলিয়া দম্ভ করেন এমন মঙ্গল বিষয়েও এ প্রকার আনন্দের স্থলে তাঁহাদিগের দুঃখিত ও অনাহ্লাদ প্রকাশ করা কোন ক্রমেই উপযুক্ত হয় না।" (তত্ত্ববোধিনী পৌষ, শকাব্দ ১৭৭৮)। কিন্তু এই সব মন্তব্যে রক্ষণশীলদের মত পরিবর্তন হল না। 'সমাচার চন্দ্রিকা' ও 'সংবাদ প্রভাকর' প্রভৃতি গোঁড়া সাময়িক পত্রের প্রচারিত গালি ও কুৎসা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। বিদ্যাসাগরপন্থীদের আওয়াজ ক্ষীণ হয়ে গেল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'সংবাদ ভাস্কর' অবশ্য বরাবরই বিধবা বিবাহ সমর্থন করে চলেছিল।

বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও বিধবা বিবাহ আন্দোলন সাময়িকভাবে শক্তিশালী হয়েছিল। তৃতীয় এবং চতুর্থ বিধবা বিবাহ হয়েছিল প্রবীণ ব্রাহ্মনেতা রাজনারায়ণ বসুর পরিবারে। তাঁর দুই ভাই দুর্গানারায়ণ বসু ও মনমোহন বসু দুই বিধবাকে বিবাহ করেন। এর ফলে তাঁদের বাসস্থান বোড়াল গ্রামে (কলকাতার চার মাইল দক্ষিণে অবস্থিত) বিশেষ চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। গ্রামের লোকেরা এত ক্ষিপ্ত হয়েছিল যে তারা রাজনারায়ণ বসুকে হত্যা করবে বলে ভয় দেখিয়েছিল। তিনি তাঁর আত্মজীবনীতে

লিখেছেন যে তিনি অনেক ভয় দেখানো চিঠি পেতেন। কিন্তু তিনি এতে ভয় না পেয়ে বরং সান্ত্বনা পেয়েছিলেন এইভেবে যে শেষে বাঙালীরা স্বভাবগত নিষ্ক্রিয়তা ঝেড়ে ফেলে অন্ততঃ তাঁর মত একজন অহিংসাপন্থী ব্রাহ্ম ধর্মযাজককে আক্রমণ করার মত সাহস সংগ্রহ করেছে। বিদ্যাসাগরকে যে ভয়ানক শত্রুতার সম্মুখীন হতে হয়েছিল তা সহজেই অনুমান করা যায়। ১৮৯১ সালে বিদ্যাসাগর যখন মারা যান তখন বাংলা 'হিতবাদী' পত্রিকায় এই শত্রুতার একটি বিবরণ প্রকাশিত হয়। যখনই বিদ্যাসাগর বাড়ীর বাইরে আসতেন তখনই লোকজন তাঁকে ঘিরে ধরত এবং তাঁর সম্বন্ধে তীব্র মন্তব্য করত। অনেক সময় তাঁকে দৈহিক আক্রমণের ভয় দেখাত। তাঁকে লক্ষ্য করে ইঁট ও কাদা নিক্ষিপ্ত হত। কলকাতার কয়েকজন ধনী হিন্দুর পৃষ্ঠপোষকতায় বিদ্যাসাগরের উপর এইরকম দলবদ্ধভাবে আক্রমণ চলত। শোনা যায়, বিদ্যাসাগর একদিন হঠাৎ তাঁর পরিচিত কলকাতার এক ধনী ভদ্রলোকের বাড়ীতে এসে উপস্থিত হলেন; সেখানে দেখলেন যে শহরের গুণ্ডা সর্দারদের নিয়ে পরামর্শ চলছে কি করে কোনও এক অন্ধকার রাত্রে বিদ্যাসাগরকে হত্যা করা যায়। ধনী ভদ্রলোক হঠাৎ বিদ্যাসাগরকে দেখে অত্যন্ত অবাক হয়ে গেলেন। তিনি থতমত খেয়ে বললেন, "অসম্ভব! অসম্ভব! আপনি হঠাৎ এখানে কি করে উপস্থিত হলেন?" বিদ্যাসাগর তাঁর স্বভাবগত পরিহাসপ্রিয়তার সঙ্গে জবাব দিলেন, "আমি জানতে পেরেছি যে আপনি উত্তর কলকাতার ভাড়াটে গুণ্ডাদের দিয়ে আমাকে একটু শিক্ষা দিতে চান। আমি তাই নিজেই আপনার বাড়ীতে এসেছি আপনার কষ্ট লাঘব করবার জন্য। এবার আপনি আমার এই ক্ষীণ দেহের উপর খুসীমত আক্রমণ চালাতে পারেন।" কথাটা শুনে ষড়যন্ত্রকারী ধনী ভদ্রলোক লজ্জায় মাথা নীচু করে রইলেন।

বিদ্যাসাগর তাঁর শত্রুদের সামনে গিয়ে মাথা তুলে দাঁড়াবার পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি কখনও তাদের এড়িয়ে যেতে চাইতেন না। বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময় যখন তাঁর প্রাণহানির আশঙ্কা দেখা দিয়েছিল তখন

তাঁর পিতা গ্রাম থেকে একজন লাঠিয়াল পাঠিয়েছিলেন তাঁর দেহরক্ষী হিসাবে কাজ করবার জন্য। লোকটি খুব বিশ্বাসী হওয়া সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর কখনও তাকে হাতে লাঠি নিয়ে তাঁর সঙ্গে পথে ঘাটে আসতে দিতেন না। লোকটি যখন বিদ্যাসাগরের সঙ্গে আসার জিদ ধরত তখন তিনি তাকে বলতেন যে তাঁর দেহে পাতলা চামড়া দিয়ে ঢাকা কয়েকখানি হাড় আছে মাত্র কিন্তু প্রত্যেকটি হাড় লাঠিয়ালের লাঠির চেয়ে শতগুণে শক্তিশালী।

বিদ্যাসাগর তাঁর বিরোধী দলের লোকের সঙ্গে পরিহাসপূর্ণ ব্যবহার করতেন। আবার তাদের প্রতি উদারতাও দেখাতেন। এ সম্বন্ধে অনেক মজার গল্প আছে। একবার তিনি ট্রেনে করে কলকাতায় আসছিলেন। সেই সময় একজন পণ্ডিত তাঁর কামরায় উঠে সহযাত্রীদের সঙ্গে আলোচনা করতে করতে বিদ্যাসাগরের এবং বিধবা বিবাহের তীব্র নিন্দা করতে লাগলেন। সহযাত্রীদের মধ্যে যে বিদ্যাসাগর নিজেই উপস্থিত রয়েছেন তা তিনি জানতেন না। হাওড়া ষ্টেশনে পৌঁছলে কোনও এক ব্যক্তি তাঁকে জানাল যে যাঁর সঙ্গে তিনি অত্যন্ত উৎসাহের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তিনি স্বয়ং বিদ্যাসাগর। এই আকস্মিক সংবাদের ধাক্কায় সেই পণ্ডিত মূর্চ্ছিত হয়ে প্লাটফর্মের উপর পড়ে গেলেন। তাঁর জ্ঞান ফিরে এলে দেখলেন, সেই ভয়ঙ্কর লোকটিই তাঁর সেবা করছেন।

বিধবা বিবাহ আন্দোলন যখন চরমে পৌঁছেছে তখন মিঃ প্র্যাট নামে একজন স্কুল পরিদর্শক বিদ্যাসাগরকে জিজ্ঞাসা করলেন যে তাঁর বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে যুক্তিগুলি কে সবচেয়ে ভালভাবে খণ্ডন করেছে। যে ব্যক্তি বিদ্যাসাগরকে সবচেয়ে বেশী গালি দিয়েছিল তিনি তাঁর নাম বললেন। বিদ্যাসাগরের এই জবাবের অন্তর্নিহিত পরিহাসটা বুঝতে না পেরে মিঃ প্র্যাট অবিলম্বে সেই ব্যক্তিকে ডাকিয়ে এনে তাকে বিদ্যালয়ের উপ-পরিদর্শকের পদটা দিতে চাইলেন। লোকটি তার এই সৌভাগ্যের কারণ জানতে পেরে বিদ্যাসাগরের কাছে গিয়ে উপস্থিত হল এবং তাঁকে

অনুরোধ করল যাতে সে চাকরীটি পায় সে জন্য তিনি যেন চেষ্টা করেন। বিদ্যাসাগর একটু হেসে তাঁকে আশ্বস্ত করলেন। এই সব গল্পগুলি অতিরঞ্জিত হতে পারে কিন্তু এগুলি থেকে বোঝা যায় যে সব রকম প্ররোচনার মধ্যেও বিদ্যাসাগর অবিচলিত থাকতেন।

বিদ্যাসাগরের মুষ্টিমেয় সমর্থনকারীরা মাঝে মাঝে এখানে ওখানে বিধবা বিবাহের আয়োজন করছিলেন। কিন্তু ধীরে ধীরে গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকের পর যতই হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব বাড়তে লাগল ততই বিধবা বিবাহের উৎসাহ কমতে লাগল। ঐ দশকের শেষভাগে স্পষ্টই বোঝা গেল যে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান প্রবল হয়ে উঠেছে। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে চতুর্থ ও পঞ্চম দশকে এবং কেশবচন্দ্র সেনের নেতৃত্বে ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে ব্রাহ্ম সমাজ আন্দোলন বিশেষ শক্তিশালী হয়েছিল। কিন্তু আদর্শগত পার্থক্য ও দলাদলির ফলে উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ব্রাহ্ম আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ল। তখনকার নবজাগ্রত প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব সম্পর্কে বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর "মেময়র্স অব মাই লাইফ এ্যাণ্ড টাইমস" নামক গ্রন্থে লিখেছেন: "অনেক কারণেই এই প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাব জেগে উঠেছিল। ব্রাহ্ম সমাজের মধ্যে মধ্যযুগীয় আবহাওয়ার আমদানী যে এর একটি প্রধান কারণ ছিল এ কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়"। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে যে হিন্দু প্রতিক্রিয়াশীল ভাবধারা দেশে এত ছড়িয়ে পড়েছিল তার একটা কারণ হল, ব্রাহ্ম আন্দোলন দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যাওয়াতে দেশের প্রগতিশীল শক্তিগুলি দুর্বল হয়ে গিয়েছিল। প্রধানতঃ রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রভাবে কেশব চন্দ্রের একদল ব্রাহ্ম শিষ্য পৌরাণিক অবতারবাদ এবং ভক্তিবাদের দিকে ঝুঁকে পড়লেন। তাঁরা ব্রাহ্ম ধর্মের কঠোর যুক্তিবাদ ও একেশ্বরবাদ বর্জন করলেন। এই সামাজিক পরিস্থিতিতে বিধবা বিবাহ আন্দোলন ধীরে ধীরে দুর্বল হয়ে পড়ল।

কিন্তু বিদ্যাসাগর কোনমতেই এ বিষয়ে নিরুৎসাহ হলেন না। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর আত্মচরিত থেকে এ সম্পর্কে কয়েকটি ঘটনার

উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি লিখছেন: "এই বিবাহ ১৮৬৮ সালের প্রথম ভাগে হয় .....আমার সহধ্যায়ী যোগেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বিপত্নীক হইলেন। তাঁহার প্রথমা স্ত্রীর পরলোকগমনের দশ দিনের মধ্যেই তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পুনরায় দার পরিগ্রহ করিবার জন্য অস্থির করিয়া তুলিলেন। যোগেন্দ্র আসিয়া আমাকে সেই কথা জানাইলেন এবং আমার পরামর্শ চাহিলেন।......আমি তাঁহাকে বিধবা বিবাহ করিবার জন্য নাচাইয়া তুলিলাম। তিনি তাহাতে সম্মত হইলেন।......বিবাহ স্থির হইলে আমি সেই সংবাদ লইয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকটে গেলাম। আমার মুখে মহালক্ষ্মীর সহিত যোগেনের বিবাহের সংবাদ পাইয়া তিনি আনন্দিত হইয়া উঠিলেন এবং নিজে উপস্থিত থাকিয়া বিবাহ দিবেন বলিলেন।.....বিদ্যাসাগর মহাশয় বিবাহের সমুদয় ব্যয় দিলেন এবং আমার যতদূর স্মরণ হয় কন্যাকে কিছু গহনা দিলেন।.....'' সেদিন একটা ছোট্ট ঘটনা ঘটেছিল যা থেকে বিদ্যাসাগরের পরিহাসপ্রিয়তার পরিচয় পাওয়া যায়। নিমন্ত্রিতদের মধ্যে বিদ্যাসাগরের একজন বন্ধু ছিলেন। তিনি তাঁর ৯/১০ বছরের মেয়েকে নিয়ে বিবাহে এসেছিলেন। তিনি মেয়েটিকে বল্লেন বিদ্যাসাগরকে প্রণাম করতে। তখন বিদ্যাসাগর তাকে আশীর্বাদ করে বল্লেন. "তুমি দীর্ঘজীবী হও মা, তোমার ভাল বিয়ে হোক, তারপর তুমি বিধবা হও, আর তখন যেন আমি তোমার দ্বিতীয়বার বিয়ে দিতে পারি।" এই অদ্ভুত আশীর্বাদ শুনে সবাই হাসতে লাগলেন। বিদ্যাসাগরও খুব হাসতে লাগলেন। তিনি বল্লেন যে সমাজে বিধবা বিবাহ আর চলছে না, অতএব তাঁর বন্ধুবান্ধবের মেয়েরা যদি বিধবা না হয় তবে কি করে তিনি বিধবা বিবাহ প্রচলন করবেন।

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী লিখেছেন, "এই বিবাহের পরেই ভয়ানক নির্য্যাতন আরম্ভ হইল। যোগেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে পরিত্যাগ করিলেন।......তদুপরি চাকর চাকরাণী কেহই থাকে না, দিন চলা ভার। এই অবস্থাতে তাঁহারা আমাকে গিয়া তাঁহাদের সহিত থাকিতে অনুরোধ

করিলেন।……সুতরাং আমি বাবাকে সমুদয় বিবরণ লিখিয়া দিয়া তাহাদের সঙ্গে জুটিলাম।……যোগেনের বিবাহের কিছুদিন পরে আমরা চাঁপাতলার দীঘির পূর্ব্ববর্ত্তী একটি বাড়ীতে গিয়া প্রতিষ্ঠিত হইলাম। সেখানে বিদ্যাসাগর মহাশয় সপ্তাহে দুই তিন দিন আসিয়া আমাদিগকে দেখিতে লাগিলেন এবং আবশ্যকমত সাহায্য করিতে লাগিলেন।"

পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী এই সম্বন্ধে আর একটি 'স্মরণীয় ঘটনা'র উল্লেখ করেছেন : "সেই পাড়াতেই পাশের বাড়ীতে একটি ছুতোর জাতীয় বিধবা স্ত্রীলোক থাকিত। তাহার একটি ছয় সাত বৎসর বয়স্কা মেয়ে ছিল, সেটিও বিধবা। তাহার মা যখন শুনিল যে আমরা মহালক্ষ্মীর বিধবা বিবাহ দিয়াছি তখন তাহার ইচ্ছা হইল যে নিজের বিধবা মেয়েটির আবার বিবাহ দিবে, আমাদিগকে সেই ইচ্ছা জানাইল। মেয়েটি সকাল বিকাল আমাদের বাড়ীতে আসিত ও আমাদের সঙ্গে কাল যাপন করিতে লাগিল। আমাকে দাদা বলিয়া ডাকিত এবং আমার গলা জড়াইয়া আমার কোলে বসিয়া থাকিত। একদিন প্রাতে সে আমার গলা জড়াইয়া কোলে বসিয়া আছে, এমন সময় বিদ্যাসাগর মহাশয় আসিলেন। মেয়েটিকে অগ্রে তিনি দেখেন নাই, আমার কোলে তাহাকে দেখিয়া বলিলেন, 'ও মেয়েটি কে হে? বাঃ বেশ সুন্দর মেয়েটি তো!' আমি বলিলাম, 'এটি পাশের বাড়ীর একটি ছুতোরের মেয়ে, আমাকে দাদা বলে, আমার কোলে বসতে ভালবাসে। ওটি বিধবা, ওর মা ওর বিয়ে দিতে চায়, তাই আমাদের কাছে দিয়েছে।' এই কথা শুনিয়াই বিদ্যাসাগর চমকাইয়া উঠিলেন, 'বল কি! ওইটুকু মেয়ে বিধবা।' তাহার পর তাহাকে ডাকিলেন, 'আয় মা আমার কোলে আয়।' সেত লজ্জায় যাইতে চায় না। আমি কোলে করিয়া তাঁহার কোলে বসাইয়া দিলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় তাহাকে বুকে ধরিয়া আদর করিতে লাগিলেন। শেষে যাইবার সময় মেয়েটিকে ও তাঁর মাকে পাল্কী করিয়া তৎ পরদিন বৈকালে তাঁহার ভবনে পাঠাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া গেলেন এবং আমাকে বলিয়া গেলেন, 'মেয়েটিকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করিয়া

দেও মাহিনা আমি দেব।' পরদিন বৈকালে মেয়েটিকে ও তাহার মাকে পাল্কী করিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাটীতে পাঠানো গেল। তাহারা সন্ধ্যার সময় আসিয়া বিদ্যাসাগর মহাশয়ের জননী ভগবতী দেবীর যে প্রশংসা করিল তাহা শুনিয়া আমাদের মন পুলকিত হইয়া উঠিল…… দুঃখের বিষয় এই মেয়েটিকে বেথুন স্কুলে ভর্তি করিবার পূর্বেই সেই বাড়ীতে বিষম কলেরা রোগে মহালক্ষ্মীর মৃত্যু হইল……।"

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিদ্যাসাগর কখনও বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে উৎসাহ হারান নি। বাংলা দেশে ব্রাহ্মসমাজবাদীরা বরাবরই বিদ্যাসাগরের সমস্ত সংস্কার প্রচেষ্টা সমর্থন করতেন। হিন্দুধর্মের পুনরুত্থানের যুগে যখন রামমোহন, বিদ্যাসাগর ও ইয়ং বেঙ্গল প্রবর্তিত সমাজ সংস্কার লোকের কাছে অত্যন্ত অপ্রিয় হয়ে উঠল, তখন সেই তীব্র প্রতিক্রিয়াশীল আবহাওয়ার মধ্যেও তরুণ ব্রাহ্মরা সমাজ সংস্কারের মনোভাব সজাগ রেখেছিল। বিপিন চন্দ্র পাল তাঁর আত্মজীবনীতে এ বিষয়ে লিখেছেন : "তখনকার দিনে সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে, বিশেষ করে বিধবা বিবাহের ব্যাপারে ব্রাহ্মসমাজ খুব সক্রিয় হয়ে উঠেছিল। বহু হিন্দু বিধবা ব্রাহ্ম পরিবারে আশ্রয় পেত এবং সেখান থেকে শেষ পর্যন্ত তাদের বিবাহ হয়ে যেত। আমরা অনেক অল্পবয়সী হিন্দু বিধবাদের বাড়ী থেকে চলে আসতে সাহায্য করতাম, তাদের আশ্রয় ও শিক্ষা দিতাম এবং সম্ভব হলে ব্রাহ্ম রীতি অনুসারে তাদের পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা করে দিতাম।"* বিপিন চন্দ্র একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনার কথা বলেছেন। ১৮৮৪ সালের মাঝামাঝি সময়ে তিনি কোন্নগরের এক উচ্চপরিবারভুক্ত অল্পবয়সী কায়স্থ বিধবার কাছ থেকে একটি চিঠি পেলেন। তাকে তার বাড়ী থেকে পালিয়ে আসতে সাহায্য করা হল। কলকাতায় বিপিন চন্দ্র যেখানে তাঁর বন্ধুবান্ধব নিয়ে বাস করছিলেন সেখানে নিয়ে আসা হল। বিধবাটির বড় ভাই পরদিন এসে উপস্থিত হল এবং মেয়েটিকে বাড়ী ফিরে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি

*পৃষ্ঠা ৪৪৬/৬

করতে লাগল। কিন্তু মেয়েটি ফিরে যেতে রাজী হল না। বড় ভাই তখন ভাড়াটে গুণ্ডা নিয়ে এসে হাজির হল ভয় দেখিয়ে মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য। অকস্মাৎ শ'দুই গুণ্ডা এসে বিপিন চন্দ্রকে ঘিরে ফেলল। বিপিন চন্দ্র লিখেছেন : "আমি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম এবং বাড়ীর অন্তঃপুরের প্রবেশ পথে দাঁড়িয়ে তাদের বললাম যে তারা যদি জোর করে মেয়েটিকে কেড়ে নিয়ে যেতে চায় তবে একমাত্র আমার মৃতদেহের উপর দিয়ে তা করতে হবে। তাছাড়া আমারও বন্ধুবান্ধবেরা আছে, তারাও তাদের সহজে ছেড়ে দেবে না। আমার কাছ থেকে এ ধরনের কথা শুনবার জন্য তারা প্রস্তুত ছিল না। তাদের মধ্যে কয়েকজন বলল যে তারা আমাকে জুতো মেরে মেয়েটিকে ছেড়ে দিতে রাজী করাবে। আমি তখন সেই মারমুখী জনতার মধ্যে এগিয়ে গিয়ে আমার নিজের জুতো খুলে নিয়ে তাদের হাতে দিয়ে বললাম, এই নাও আমার জুতো, যদি পার ত আমাকে মার। এই সামান্য ব্যাপারের জন্য তোমরা তোমাদের জুতো নষ্ট করবে কেন? এ কথা শুনে তারা খুব অবাক হয়ে গেল। ধীরে ধীরে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। পরে সীতানাথ দত্তের সঙ্গে মেয়েটির বিবাহ হয়ে গেল।" সীতানাথ দত্ত পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ নামে অধিক পরিচিত ছিলেন। ইনি ছিলেন ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকের একজন নাম করা ব্রাহ্ম বুদ্ধিজীবী। বিপিন চন্দ্র লিখেছেন : "ব্রাহ্ম সমাজের সমাজ সংস্কার প্রচেষ্টার ব্যাপারে এরকম অনেক ঘটনা ঘটেছিল। তারমধ্যে এটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

বিদ্যাসাগরের জীবদ্দশাতেই তাঁর সমাজ সংস্কারের আদর্শ সারা বাংলা দেশে এবং বাংলার বাইরে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সমাজ ও ধর্ম সংস্কারমূলক আন্দোলনে বাংলা দেশই অগ্রণী হয়েছিল। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে এই আন্দোলন ভারতের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ল। তখন বাংলা দেশে সেকেলে হিন্দু ধর্মকে জাগিয়ে তোলার মনোবৃত্তি প্রবল হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মনোবৃত্তির ফলে

জাতীয় জাগরণের খুব সাহায্য হয়েছিল সন্দেহ নেই, কিন্তু বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যেই বাংলা দেশে সমাজ বিবর্তনের গতি সংস্কারবাদের চূড়ান্ত সীমা থেকে পুনরুত্থানের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। ঐ শতাব্দীর শেষের দিকে সংস্কার আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিল মহারাষ্ট্র।

বাংলার ব্রাহ্ম সমাজের ঐতিহ্য গ্রহণ করলেন বোম্বাইএর প্রার্থনা সমাজ। এঁদের কাজ ছিল বিভিন্ন জাতির মধ্যে আন্তঃভোজন, আন্তঃ বিবাহ ও বিধবাদের পুনর্বিবাহ প্রচলন। ১৮৭৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সত্যশোধক সমাজ উৎসাহের সঙ্গে সমাজ সংস্কারের ভাবধারা প্রচার করছিলেন। রানাডে, ফুলে, মালাবারী, বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত প্রভৃতি সমাজ সংস্কারক হিন্দু ধর্মের সমস্ত প্রাচীন, জরাজীর্ণ প্রথার বিরুদ্ধে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছিলেন। বিধবা বিবাহ সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের দু'টি পুস্তিকা বিষ্ণু শাস্ত্রী পণ্ডিত মারাঠী ভাষায় অনুবাদ করেছিলেন তিনি ১৮৬১ সালে মহারাষ্ট্রে 'উইডো ম্যারেজ এ্যাসোসিয়েশান' (বিধবা বিবাহ সমিতি) স্থাপন করেন। তিনি খুবই উৎসাহের সঙ্গে বিধবা বিবাহ আন্দোলন চালিয়েছিলেন। তার ফলে ১৮৬১ সালে মহারাষ্ট্রের সর্বপ্রথম বিধবা বিবাহ সম্পন্ন হয়। সংরক্ষণশীল দল তাঁকে জাতিচ্যুত করবার ভয় দেখানো সত্বেও তিনি সেই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেছিলেন। গণেশ বাসুদেব যোশী ১৮৭০ সালে পুনায় সার্বজনিক সভা প্রতিষ্ঠা করবার পর বিষ্ণু শাস্ত্রী সেই সভার অত্যন্ত উৎসাহী কর্মী হয়ে ওঠেন। মহারাষ্ট্রের সামাজিক ও রাজনৈতিক পুনরুত্থানের উপর তিনি খুবই প্রভাব বিস্তার করছিলেন।*

এ ব্যাপারে এবং বিশেষ করে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের ব্যাপারে ধোনডো কেশব কারভের নাম উল্লেখযোগ্য। বিপত্নীক হওয়ার পর কারভে ·৮৯৩ সালে একজন ব্রাহ্ম বিধবাকে বিবাহ করেন। এ ঘটনা ঘটেছিল

*এইচ. সি. ই. জ্যাকেরিয়াস্, রেনাসেন্ট ইণ্ডিয়া, পৃঃ ৪২-৭০

বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর ঠিক দু'বছর পরে। কারভে তাঁর 'মাই টোয়েন্টি ইয়ার্স ইন দি কজ অব ইণ্ডিয়ান উইমেন' (স্ত্রী জাতির সেবায় আমার বিশ বছরের অভিজ্ঞতা) পুস্তকে লিখছেন : "পুনা ছিল গোঁড়ামীর দুর্গ বিশেষ। সেখানে যখন একটি বিধবা বিবাহ হল তখন আশঙ্কা করা গিয়েছিল যে বেশ গোলমাল হবে। কিন্তু ভালোয় ভালোয় বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল।" এই ঘটনার পর বিধবাদের উন্নতি সাধনের জন্য তিনি দৃঢ়ভাবে চেষ্টা সুরু করলেন। ১৮৯৩ সালে তিনি 'উইডো ম্যারেজ এ্যাসোসিয়েশন'কে আবার গড়ে তুলেছিলেন এবং নিজে তার সম্পাদক হলেন। ১৮৯৯ সালে তিনি পুনায় বিধবাদের থাকবার জন্য একটি নিবাস স্থাপন করেন। পরে সেই বিধবা নিবাস শহর থেকে ১০ মাইল দূরে স্থানান্তরিত করেন। এই নিবাস একটি ক্ষুদ্র কুটীর মাত্র। এটি এখনও রক্ষিত আছে। সেখানে গেলে শুধু যে কারভে, বিষ্ণু শাস্ত্রী প্রভৃতি মহারাষ্ট্রীয় সমাজ সংস্কারকদের কথা মনে পড়বে তাই নয়, মনে পড়বে বাংলা দেশের মহান সমাজ সংস্কারক বিদ্যাসাগর ও তাঁর বিধবা বিবাহ আন্দোলনের কথা।

এই সব ঘটনা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে বিধবা বিবাহ আন্দোলন উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বা বিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে সম্পূর্ণ থেমে যায় নি। তবে এ কথা সত্য যে বিদ্যাসাগর যে পূর্ণ বিশ্বাস ও আশা নিয়ে কাজ সুরু করেছিলেন অনেক কারণে তা তাঁর জীবনের শেষ দিকে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল। একটা কারণ এই ছিল যে অনেক লোক অসাধু উদ্দেশ্য নিয়ে বিধবা বিবাহের সমর্থক সেজে বসেছিল। তাদের নীতি বলে কোনও জিনিষ ছিল না। একদিকে তারা হিন্দু ধর্ম অনুমোদিত বহু বিবাহের সুযোগ নিত এবং অন্যদিকে বিধবা বিবাহের ধনী পৃষ্ঠপোষকদের কাছ থেকে টাকা আদায় করবার লোভে বিধবা বিবাহ করবার জন্য উৎসাহী হয়ে উঠত। লোকের এই ব্যবহারে বিদ্যাসাগর অত্যন্ত মর্মাহত হয়েছিলেন। বিধবা বিবাহ আইন পাশ হবার অল্প কিছুদিনের মধ্যে ১৮৫৮ সালের নভেম্বর মাসে জনশিক্ষা বিভাগের ইংরাজ কর্মচারীদের সঙ্গে মতের

অমিল হওয়ার জন্য বিদ্যাসাগর মাসিক পাঁচশত টাকা বেতনের সরকারী চাকরী ছেড়ে দেন। এতদিন ধরে যে চাকরী করে এসেছিলেন তার জন্য তিনি কোনও পেন্সন বা গ্র্যাচুইটী পান নি। জনশিক্ষা অধিকর্তা গর্ডন ইয়ংকে তিনি লিখেছিলেন : "আমার কাজের জন্য যতটা অধ্যবসায়পূর্ণ মনোযোগ দেওয়া দরকার তা আমি আর দিয়ে উঠতে পারছি না। আমি এখন বিশ্রাম চাই। সুতরাং জনসাধারণের স্বার্থে এবং আমার নিজের বিশ্রামের জন্য এখন আমার সরকারী কাজ থেকে অবসর গ্রহণ করা উচিত।" প্রথম ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের অব্যবহিত পরে তিনি এই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যখন বিধবা বিবাহ চালু করবার জন্য তাঁর অর্থের বিশেষ প্রয়োজন ছিল। এই অবস্থায় তাঁকে বন্ধুবান্ধব ও গুণগ্রাহী-দের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হ'ত। অনেক লোক বিধবা বিবাহ করবার অজুহাতে তাঁর কাছ থেকে টাকা নিয়ে তাঁকে প্রতারিত করেছিল। বলা বাহুল্য তিনি এতে খুবই মর্মাহত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর ঋণভার-গ্রস্ত হয়ে পড়েছিলেন এবং মানুষের চরিত্র সম্বন্ধে বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। রাষ্ট্রগুরু সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের পিতা এবং তাঁর বন্ধু ডাঃ দুর্গাচরণ বন্দোপাধ্যায়কে তিনি নিম্নলিখিত পত্র লিখেছিলেন : "দুঃখের সঙ্গে তোমাকে জানাচ্ছি যে বিশেষ চেষ্টা করা সত্বেও আমি তোমার দেনা শোধ করবার কোনও ব্যবস্থা করতে পারিনি। অদূর ভবিষ্যতে যে তোমার টাকা ফেরৎ দিতে পারব এমন কোনও আশ্বাসও তোমাকে বর্তমান অবস্থায় দিতে পারছি না। তুমি ভালভাবেই জানো যে এই টাকা আমি আমার নিজের জন্য ধার করিনি। বিধবা বিবাহের খরচ মেটানোর জন্য আমি এই টাকা ধার করেছিলাম এবং একমাত্র তোমার কাছ থেকে নয় আরও অনেকের কাছ থেকেই এইভাবে টাকা নিয়েছিলাম। আমার আশা ছিল যে বিধবা বিবাহের পৃষ্ঠপোষকেরা তাঁদের প্রতিশ্রুতি মত আমাকে অর্থ সাহায্য করবেন এবং সেই অর্থ দিয়ে আমি আমার দেনা শোধ করব। দুর্ভাগ্যক্রমে সেই সব ধনী পৃষ্ঠপোষকদের মধ্যে বেশীর ভাগই তাঁদের কথা রাখেন নি। অপরদিকে বিধবা বিবাহের খরচ প্রতিদিনই বেড়ে চলছে

এবং আমি অসহায়ভাবে ধার করে যাচ্ছি, যদিও আমি জানি যে সে দেনা শোধ করবার কোনও আশা নেই। যদি সেই ভদ্রলোকেরা তাঁদের আর্থিক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতেন, তবে আমাকে এই সঙ্কটের মধ্যে পড়তে হত না। অন্য অনেকের মত তুমিও আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলে যে তুমি আমাকে মাসিক সাহায্য করবে এবং এককালীন কিছু দানও করবে······যত শীঘ্র পারি এই কঠিন অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার চেষ্টা করব আমি। যদি কারও কাছ থেকে আমি টাকা না পাই তবে আমার নিজের যা কিছু জিনিষপত্র আছে তা বিক্রী করে দেনা শোধ করতেও দ্বিধা করব না। কিন্তু এই মুহূর্তে যখন তোমার নিজের এত প্রয়োজন তখন তোমাকে কিছু টাকাও দিতে না পারায় আমি অত্যন্ত দুঃখিত। আমি যদি জানতাম যে আমাদের দেশের বড়লোকেরা এত অপদার্থ এবং এত আন্তরিকতাহীন ও অসাধু, তবে আমি বোধহয় এই বিধবা বিবাহ ব্যাপারে হাত দিতাম না। এসব কথা আমি আমার শত্রুদের সম্বন্ধে বলছি না, বলছি আমার তথাকথিত বন্ধু ও সমর্থকদের সম্বন্ধে, —যাঁরা আমাকে ঠকিয়েছেন এবং বিধবা বিবাহ আন্দোলনের বিশেষ ক্ষতি করেছেন। যাঁরা বড় বড় আদর্শবাদের কথা বলতেন তাঁদের আন্তরিকতায় বিশ্বাস করে আমি দুঃখ ও অপমান ভোগ করছি। আমাকে কোনরকম সাহায্য করা দূরে থাক, এমন কি আমি বেঁচে আছি না মরে গেছি এ খোঁজও এখন তাঁরা নেন না।"

বলা বাহুল্য বিদ্যাসাগরের মন গভীর হতাশায় ভরে গিয়েছিল। মানুষের, বিশেষ করে "বড় মানুষের" সততা সম্বন্ধে তিনি প্রায় বিশ্বাস হারিয়ে ফেলেছিলেন। তিনি যে আদর্শকে কার্যে রূপায়িত করবার জন্য কঠিন পরিশ্রম করেছিলেন, তার পরিবর্তে তিনি শুধু নিন্দা এবং অপবাদই কুড়োন নি, আর্থিক কষ্টও ভোগ করেছিলেন। কিন্তু তিনি জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত বিধবা বিবাহে বিশ্বাসী ছিলেন। যখনই তিনি কোথাও কোন বিধবা বিবাহের খবর পেতেন, তখনই তাঁর মুখ আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে

উঠত। যখন তাঁর পুত্র নারায়ণ চন্দ্র বিধবা বিবাহ করেন তখন তিনি তাঁর ভাই শম্ভুচন্দ্রকে একটি চিঠি লেখেন। সেই চিঠি থেকে বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য তাঁর গভীর আগ্রহ ও অদম্য আন্তরিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মীয়স্বজনদের লেখা বিদ্যাসাগরের যতগুলি পত্র পাওয়া যায় তার মধ্যে এটাই সর্বশ্রেষ্ঠ। চিঠিখানি এইরূপ : "মাতৃদেবী ও অন্যান্যকে অবগত করাইও যে নারায়ণ গত ২৭শে শ্রাবণ, ১২৭৭ সন, বৃহস্পতিবার, ভবসুন্দরীকে বিবাহ করিয়াছে। ইতিপূর্বে তুমি লিখিয়াছিলে নারায়ণ বিধবা বিবাহ করিলে আমাদের কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, অতএব নারায়ণের বিবাহ নিবারণ করা আবশ্যক। এ বিষয়ে আমার বক্তব্য এই যে, নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়াছে; আমার ইচ্ছা বা অনুরোধে করে নাই। যখন শুনলাম, সে বিবাহ করা স্থির করিয়াছে এবং কন্যাও উপস্থিত হইয়াছে, তখন সে বিষয়ে সম্মতি না দিয়া প্রতিবন্ধকতাচরণ করা, আমার পক্ষে কোনও মতেই উচিত কর্ম্ম হইত না। আমি বিধবা বিবাহের প্রবর্ত্তক, আমরা উদ্যোগ করিয়া অনেকের বিবাহ দিয়াছি, এমন স্থলে আমার পুত্র বিধবা বিবাহ না করিয়া আমার কথায় কুমারী বিবাহ করিলে, আমি লোকের নিকট মুখ দেখাইতে পারিতাম না। ভদ্রসমাজে নিতান্ত হেয় ও অশ্রদ্ধেয় হইতাম। নারায়ণ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করিয়া আমার মুখ উজ্জ্বল করিয়াছে এবং লোকের নিকট আমার পুত্র বলিয়া পরিচয় দিতে পারিবে, তাহার পথ করিয়াছে। বিধবা বিবাহ প্রবর্ত্তন আমার জীবনের সর্ব্বপ্রধান সৎকর্ম্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোনও সৎকর্ম্ম করিতে পারিব তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি। সে বিবেচনায় কুটুম্ব বিচ্ছেদ অতি সামান্য কথা। কুটুম্ব মহাশয়েরা আহার ব্যবহার পরিত্যাগ করিবেন, এই ভয়ে যদি আমি পুত্রকে তাহার অভিপ্রেত বিধবা বিবাহ হইতে বিরত করিতাম, তাহা হইলে আমা অপেক্ষা নরাধম আর কেহ হইত না। অধিক আর কি বলিব, সে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এই বিবাহ করাতে, আমি আপনাকে

চরিতার্থ জ্ঞান করিয়াছি। আমি দেশাচারের নিতান্ত দাস নহি; নিজের বা সমাজের মঙ্গলের নিমিত্ত যাহা উচিত ও আবশ্যক বোধ হইবে, তাহা করিব, লোকের বা কুটুম্বের ভয়ে কদাচ সঙ্কুচিত হইব না। অবশেষে আমার বক্তব্য এই যে, সমাজের ভয়ে বা অন্য কোন কারণে নারায়ণের সহিত আহার ব্যবহার করিতে যাঁহাদের সাহস বা প্রবৃত্তি না হইবে, তাঁহারা স্বচ্ছন্দে তাহা রহিত করিবেন, সে জন্য নারায়ণ কিছুমাত্র দুঃখিত হইবে এরূপ বোধ হয় না এবং আমিও তজ্জন্য বিরক্ত বা অসন্তুষ্ট হইব না।...... আমি মনে করি প্রত্যেক ব্যক্তির নিজের বিবেকবুদ্ধি অনুসারে কাজ করিবার স্বাধীনতা থাকা উচিত, এবং কাহারও নিজের মত অন্য ব্যক্তির উপর জোর করিয়া চাপানো উচিত নয়।"

যারা বিদ্যাসাগরের বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সমালোচনা করে বলেন যে বিদ্যাসাগর ক্ষেত্র প্রস্তুত না করেই ঐ আন্দোলন সুরু করেছিলেন, তাদের আমরা কয়েকটি কথা বলতে চাই। কয়েকজন প্রধান বাঙালী বুদ্ধিজীবীর মত ছিল এই যে সামাজিক অবস্থার পরিবর্তন না হলে বিধবা বিবাহের মত একটি বহু প্রাচীন প্রথা দূর করা সম্ভব নয়। এর জন্য প্রয়োজন শিক্ষা বিস্তার এবং লোকের মধ্যে যুক্তিবাদ ও বৈজ্ঞানিক মনোভাব সৃষ্টি করা। যুক্তি হিসাবে এ কথার মধ্যে কোনও ফাঁক নেই, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে এ কথা সত্য নয়। মানব সভ্যতার সুরু থেকে সমস্ত প্রগতিমূলক সংস্কার প্রচেষ্টাই অনুকূল অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার আগেই হয়েছিল, অর্থাৎ লোক মনে মনে সেই সব সংস্কারের জন্য প্রস্তুত হওয়ার আগেই সেগুলি প্রবর্তিত হয়েছিল। অবস্থা অনুকূল হওয়া পর্যন্ত যদি সব সংস্কার বন্ধ থাকত তবে সমাজ এগোতেই পারত না। পুরানো প্রথা নির্মূল করা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার সন্দেহ নেই। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, যে সব কুপ্রথা সামাজিক অগ্রগতি রোধ করছে সেগুলি নির্মূল করা হবে না। যুগের তুলনায় বিদ্যাসাগরের দৃষ্টি অনেক সুদূরপ্রসারী ছিল।

একাদশ অধ্যায়

সমাজ সংস্কার : বহু বিবাহের বিরুদ্ধে

বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে বিদ্যাসাগর বাংলা দেশে কুলীনদের বহুবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধেও আন্দোলন সুরু করেছিলেন। তিনি নিজে ছিলেন কুলীন ব্রাহ্মণ। তাই এ প্রথার কুফল তিনি ভালভাবেই জানতেন। তাঁর আত্মীয়দের মধ্যে অনেকে এই কুপ্রথার ফলে দুঃখভোগ করছিলেন। এই প্রথার জন্য দেশে বিধবাদের সংখ্যা খুব বেড়ে গিয়ে একটা গুরুতর সামাজিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছিল। তাই বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সঙ্গে এই বহুবিবাহ প্রথার ব্যাপারটি ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল।

বিধবা বিবাহের স্বপক্ষে আইন তৈরী করবার জন্য সরকারের কাছে দরখাস্ত দেওয়ার কয়েক মাসের মধ্যেই বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালের ২৭শে ডিসেম্বর বহু বিবাহ বন্ধ করার জন্য আর একটি দরখাস্ত দিলেন। এই আবেদনপত্রে ২৫,০০০ ব্যক্তি স্বাক্ষর করেছিলেন। তার মধ্যে বর্ধমানের মহারাজা মহতাবচাঁদ ও বাংলা দেশের অন্যান্য কয়েক জন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি ছিলেন। এই দরখাস্তের মধ্যে লেখা ছিল : "কুলীনেরা কেবল টাকার জন্য বিবাহ করে। বিবাহ বলতে যে সব দায়িত্ব বোঝায় সেগুলি পালন করার বিন্দুমাত্র উদ্দেশ্য তাদের থাকে না। এই নামমাত্র বিবাহে স্ত্রীলোকেরা বিবাহিত জীবনের সকল রকম সুখ থেকে বঞ্চিত হয়। তাদের হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত স্নেহ ভালবাসা অর্পণের জন্য যোগ্য পাত্রের অভাবে তিলে তিলে তারা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যায়, কিম্বা কামনার আবেগে ও শিক্ষার অভাবে নৈতিক অধঃপতন ঘটে।......এর প্রতিকার কি তা স্পষ্ট জানা থাকলেও এবং সে ব্যবস্থা হিন্দুধর্ম-সম্মত হলেও হিন্দু সমাজের বর্তমান

সম্বন্ধহীন অবস্থার মধ্যে জনমতের সাহায্যে বা অন্যভাবে সে ব্যবস্থা চালু করা সম্ভব নয়। একমাত্র আইনের শক্তির দ্বারা তা করা সম্ভব।"

উপরের বক্তব্যের প্রথম বাক্য দু'টির অর্থ ভাল করে বুঝতে হলে বাংলা দেশের কুলীন প্রথা ও বহু বিবাহের ইতিহাস সংক্ষেপে আলোচনা করা প্রয়োজন। এদেশে কুলজী বা কুলশাস্ত্র বলে একটি গ্রন্থমালা আছে। ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য কয়েকটি প্রধান জাতির মোটামুটি ইতিহাস এবং কয়েকটি বিখ্যাত কুলীন পরিবারের বংশ পরম্পরার পরিচয় এই বইতে আছে। রাঢ়ীয় ('রাঢ়ীয়' কথাটি 'রাঢ়' শব্দ থেকে এসেছে। আগেকার কালে বাংলা দেশের পশ্চিম অংশকে 'রাঢ়' দেশ বলা হত) ব্রাহ্মণদের কুলজীতে আছে যে অষ্টম বা নবম শতাব্দীতে রাজা আদিশূর যে পাঁচজন ব্রাহ্মণকে এদেশে নিয়ে আসেন কুলীনরা তাঁদের বংশধর। রাজা আদিশূরের পরিচয় এখনও ইতিহাসে নিদিষ্টভাবে ধার্য হয় নি। বারেন্দ্র (উত্তর বঙ্গকে বারেন্দ্রভূমি বলা হত) ব্রাহ্মণদের কুলজীর মতে ১১৫৮-৭৯ খৃষ্টাব্দে সেন রাজা বল্লাল সেন বাংলা দেশে কুলীন প্রথা সৃষ্টি করেন। রাজা বল্লাল সেন বলেন যে কুলীনদের নয়টি গুণ থাকা উচিত। যাদের এই সব কটি গুণ আছে তাদের শ্রেষ্ঠ, যাদের আটটি গুণ আছে তাদের 'সিদ্ধ শ্রোত্রীয়' ও যাদের সাতটি গুণ আছে তাদের 'সাধ্য শ্রোত্রীয়' বলে অভিহিত করেন। বাকী কুলীনদের তিনি নাম দেন 'কাষ্ঠ শ্রোত্রীয়'। 'কুলজী' গ্রন্থে কৌলীন্য পরীক্ষার এরকম কোনও নির্দেশ নেই। সব কুলজাতেই বলা হয়েছে যে কৌলীন্য হল ব্যক্তিগত সম্মানের ব্যাপার এবং বল্লাল সেন সব কুলীনকেই সমান স্থান দিয়েছিলেন। তিনি তাদের অকুলীন কন্যা বিবাহেও কোন বাধা আরোপ করেন নি। বল্লাল সেনের উত্তরাধিকারী রাজা লক্ষ্মণ সেন কুলীনদের বিবাহে বাধা নিষেধ সৃষ্টি করে কৌলীন্য প্রথাকে জটিল করে তোলেন।

এই বিবরণ থেকে এইটুকু ঐতিহাসিক সত্য আহরণ করা যায় যে বাংলা দেশে বৌদ্ধ ধর্ম সমর্থক পাল রাজাদের রাজত্ব শেষ হলে দ্বাদশ শতাব্দী থেকে সেন রাজাদের রাজত্ব সুরু হয় এবং সেন রাজাদের সময়ে

হিন্দু ধর্মের পুনরুত্থান ঘটে। সে সময়ে জাতি প্রথার উপর প্রতিষ্ঠিত হিন্দু সমাজকে পুনর্গঠন করবার প্রয়োজন হয় এবং উচ্চবর্ণের, বিশেষ করে ব্রাহ্মণ জাতির পবিত্রতা রক্ষার জন্য কতকগুলি কঠিন নিয়ম করা হয়।

প্রথমে যা ছিল জাতিগত গুণের ভিত্তিতে সামাজিক মর্যাদা মাত্র, কয়েক পুরুষের মধ্যেই তা সামাজিক অধিকারে রূপান্তরিত হল এবং সেই সুবিধার সুযোগ নিয়ে প্রায় দু'শতাব্দীর মধ্যে কৌলীন্য বংশগত মর্যাদা হয়ে দাঁড়াল। মুসলমান আক্রমণের ফলে জাতি প্রথার নিয়মগুলিকে খুব কঠিনভাবে প্রয়োগ করার প্রয়োজন হয়ে উঠল। জাতিপ্রথাকে কড়াকড়িভাবে মেনে চলার জন্য বাংলা দেশের উচ্চ জাতিরা, বিশেষ করে ব্রাহ্মণরা, এই কৌলীন্য প্রথার দোহাই দিয়ে সামাজিক সুবিধা আদায় করতে লাগলেন। ক্রমে এই কৌলীন্য প্রথা থেকে সৃষ্টি হল কন্যাকে উচ্চবর্ণে বিবাহ দেওয়ার রীতি—যার অবশ্যম্ভাবী ফল হল বহু বিবাহ। কন্যাকে উচ্চ শ্রেণীর পাত্রে বিবাহ দেওয়ার নিয়মের জন্য পাত্রের তুলনায় বিবাহযোগ্যা কন্যার সংখ্যা বেশী হয়ে পড়ল। উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণদের মধ্যে নিয়ম আছে যে ঋতুমতী হওয়ার আগে কন্যার বিবাহ দিতেই হবে। এই দুই নিয়মের চাপে কুলীনদের মধ্যে বহু বিবাহের মত একটি অনিষ্টকর কুপ্রথা প্রচলিত হল। এক একজন কুলীন ব্রাহ্মণ বহু কন্যার পাণি গ্রহণ করতে লাগলেন। এই স্ত্রীদের ভরণপোষণের দায়িত্ব নেওয়ার কোনও প্রশ্নই ছিল না। ঋতুমতী হওয়ার আগে কন্যার বিবাহ দেওয়ার বাধ্যবাধকতা ও বিবাহ দিতে না পারলে পিতামাতার যে সামাজিক অমর্যাদা হত তা থেকে নিষ্কৃতি দেওয়ার জন্যই কুলীন ব্রাহ্মণেরা এই সব কন্যাদের বিবাহ করতেন। অতএব বিবাহ বেশ লাভজনক পেশা হয়ে উঠল। কুলীন ব্রাহ্মণ কন্যাদের অসহায় পিতামাতারা দু'তিন ডজন স্ত্রী থাকা সত্ত্বেও ৭০/৮০ বছরের বৃদ্ধ কুলীন ব্রাহ্মণদের উপযুক্ত পাত্র বলে বিবেচনা করতেন। এক একটি কুলীন কন্যার পাণি গ্রহণের জন্য এই সব পাত্রেরা পাঁচ থেকে পাঁচশত টাকা পর্যন্ত দাবী করতেন। মৃতপ্রায় অশীতিপর বৃদ্ধের সঙ্গে নিতান্ত নাবালিকা কন্যাদের বিবাহ হত। মৃত্যুর আগে সেই বৃদ্ধের লাভ হত সামান্য কয়েকটি টাকা।

কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে অনেকে যাঁরা বহু বিবাহের বিরুদ্ধতা করেছিলেন তাঁরা তাঁদের পরিবারের শোচনীয় দুর্গতির কথা লিখে রেখে গেছেন। তাঁদের মধ্যে পূর্ব বঙ্গের (বর্তমানে বাংলাদেশ) রাস বিহারী মুখোপাধ্যায় ছিলেন কৌলীন্য প্রথা ও বহু বিবাহের বিরোধী একজন বিশেষ উল্লেখযোগ্য নেতা। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নির্দেশে তিনি গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে ঢাকা জেলায় আন্দোলন সুরু করেছিলেন। অল্পদিনের মধ্যেই এই আন্দোলন পূর্ব বঙ্গের অন্যান্য জেলাতেও ছড়িয়ে পড়েছিল। বিদ্যাসাগর তাঁকে এই আন্দোলনের বিবরণ লিপিবদ্ধ করে রাখতে বলেছিলেন। সেই কথা মত তিনি নিজের জীবনের কিছু তথ্য দিয়ে আন্দোলনের ইতিহাস লিখে রেখেছিলেন। এই ইতিহাস ১৮৮১ সালে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়। এটি বহু বিবাহের বিরুদ্ধে আন্দোলনের একটি জরুরী দলিল। তিনি লিখেছেন, "......পিতাঠাকুর মহাশয় আমাকে অতি শৈশবাবস্থায় রাখিয়া স্বর্গারোহণ করেন। তখন পিতৃব্য শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মহাশয়ই আমার অভিভাবক ছিলেন। দরিদ্রতাবশত আমাকে অল্পকাল মধ্যেই তিনি ৮টি বিবাহ করান। আমি বাল্যকাল হইতেই বহু বিবাহের প্রতি বিদ্বেষী ছিলাম, সুতরাং সম্বন্ধ নিয়া ঘটক আসিলেই নানাস্থানে পলাইয়া যাইতাম। বহু বিবাহে সম্মতি থাকিলে বোধহয় আমাকে শতাধিক রমণীর পাণিগ্রহণ করিতে হইত। অভিভাবক মহাশয়, প্রতিকূলমতি দেখিয়া প্রায় তিনশত টাকা ঋণভার অর্পণপূর্ব্বক আমাকে পৃথগন্ন করিয়া দেন। তখন আমার বিদ্যাবুদ্ধি অথবা এরূপ কোনো ক্ষমতা ছিল না যে ঐ ঋণ পরিশোধ বা পরিজন সকলের ভরণপোষণ করিতে পারি, সুতরাং অনন্যোপায় হইয়া আরও ছয়টি পরিণয় স্বীকার করিতে হইল, তাহাতে আমার ঋণ পরিশোধ ও পরিবারবর্গের কিঞ্চিৎ কালের ভরণপোষণের সংস্থান হইলে আমি সাধারণরূপ যৎকিঞ্চিৎ বাংলা লেখা শিক্ষা করিয়া পরগণা হুসেন সাহীর জমিদারদিগের আশ্রয় গ্রহণপূর্ব্বক তহশীলদারী কর্ম্মে নিযুক্ত হইলাম।" (রাস বিহারী মুখোপাধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত, ১৮৮১)। গভর্ণমেণ্টের কাছে আবেদনপত্রে বিদ্যাসাগর লিখেছিলেন, "কুলীনেরা কেবল অর্থের জন্যই বিবাহ করে, বিবাহের কোনও দায়িত্ব পালন করবার কিছুমাত্র

উদ্দেশ্য তাদের থাকে না"। রাস বিহারী মুখোপাধ্যায়ের আত্মকথা থেকে বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগরের এই উক্তি সম্পূর্ণ সত্য।

১৮৫৬-৫৭ সালে বহু বিবাহের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন সুরু হয়েছিল তা ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলে তখনকার মত ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। জে. পি. গ্র্যাণ্ট প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে ১৮৫৭ সালে বহু বিবাহ রদ করবার জন্য তিনি একটি বিল আনবেন। কিন্তু বিদ্রোহের ফলে কাজ আর এগোতে পারেনি। সরকারী তথ্যে হিসাব আছে যে বাংলা দেশের নানা জেলায় অসংখ্য লোকের স্বাক্ষরসহ প্রায় ১২৭টি বহুবিবাহবিরোধী আবেদনপত্র সরকারের কাছে এসেছিল। বেনারস থেকেও একটি অনুরূপ আবেদনপত্র এসেছিল। রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের নেতা রাজা রাধাকান্ত দেব যথারীতি বহু বিবাহের সমর্থনে সরকারের কাছে একটি আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। ভারত সরকারের কাছে বাংলা সরকার এ বিষয়ে যে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন তাতে লিখেছিলেন: "স্যার জে. পি. গ্র্যাণ্টের সঙ্গে পরামর্শ করে স্বর্গীয় বাবু রমাপ্রসাদ রায় যে খসড়া বিল তৈরী করেছিলেন তা পরিষদে উত্থাপন হতে যাচ্ছিল। কিন্তু সে সময় বাংলা দেশে সিপাহী বিদ্রোহ সুরু হওয়াতে এবং তার পরবর্তী ঘটনার ফলে তখনকার মত এ ব্যাপারটা স্থগিত হয়ে যায়। কিন্তু রাজনৈতিক বিদ্রোহজনিত বিক্ষোভের জন্য আন্দোলনটি একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। বিদ্রোহের পর পাঁচ বৎসরের মধ্যে আবার আন্দোলনের ফলে সমস্যাটি সমাজের সামনে উত্থাপিত হল। ১৮৬৩ সালে বহু বিবাহ প্রথার অপব্যবহারের বিরুদ্ধে আইন তৈরী করার অনুরোধ জানিয়ে বাংলা দেশের প্রায় ২১,০০০ ব্যক্তি সরকারের কাছে আবেদনপত্র পাঠিয়েছিলেন। এই আবেদনপত্রগুলির একটিতে ছিল, "এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষরকারীদের বিশ্বাস যে হিন্দু রমণীদের জীবনব্যাপী বৈধব্য যন্ত্রণার চেয়েও কষ্টকর এবং গার্হস্থ্য সুখনাশক এই বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে বাংলা দেশের সমাজের সকলের একমত হওয়ার যথেষ্ট কারণ আছে।"

১৮৬৬ সালের ১লা ফেব্রুয়ারী বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে ২১,০০০ ব্যক্তির স্বাক্ষরযুক্ত আবার একটি দরখাস্ত পেশ করেন। এই দরখাস্তে স্বাক্ষরকারী প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মধ্যে ছিলেন নদীয়ার মহারাজা সতীশ চন্দ্র রায় বাহাদুর, ভূকৈলাসের (খিদিরপুর, কলকাতা) রাজা সত্য শরণ ঘোষাল ও কান্দীর (মুরশিদাবাদ) রাজা প্রতাপ চন্দ্র সিংহ। এই আবেদন পত্রের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল এইরূপ,—"মাননীয় মহোদয় তাঁর কাজের দায়িত্ব অপরের হাতে সমর্পণ করার আগে তাঁর দীর্ঘ ও সফল চাকুরী জীবনের সমাপ্তির স্মারক চিহ্ন হিসাবে বাংলা দেশের নারী জাতিকে বহু বিবাহের ন্যায় ঘৃণ্য কুপ্রথাজনিত দুঃখ, নিষ্ঠুরতা ও অন্যান্য অত্যাচারের হাত থেকে মুক্ত করবেন বলে আবেদনকারীরা সাগ্রহে আশা করেছেন ও প্রার্থনা জানাচ্ছেন।"

জাষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, বিখ্যাত শিক্ষা সংস্কারক প্যারীচরণ সরকার, বিখ্যাত রাজনৈতিক নেতা কৃষ্টদাস পাল প্রভৃতিদের নিয়ে ১৮৬৬ সালের ১৯শে মার্চ পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর গভর্ণমেণ্টের কাছে উপস্থিত হলেন। দলের নেতা আবেদনপত্রটি পাঠ করে শোনালেন। লেফটেনাণ্ট গভর্ণর সিসিল বিডন তার উত্তরে বলেন, "বহুলোকের স্বাক্ষরযুক্ত এই আবেদনপত্র পেয়ে আমি অত্যন্ত আনন্দিত হলাম। আপনাকে ও আপনার দলের সম্মানিত ব্যক্তিদের সকলকে আমি আশ্বাস দিচ্ছি যে হিন্দুদের মধ্যে বহু বিবাহ প্রথার অপব্যবহার বন্ধ করবার জন্য আইন প্রণয়নের ব্যাপারে আমি সানন্দে আমার সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করব। শিক্ষিত হিন্দু সমাজের যুক্তিপূর্ণ মত ও ইচ্ছার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে যতদূর সম্ভব এ প্রথা নিয়ন্ত্রণ করার ব্যবস্থা করব। আমি নিজেও মনে করি যে এই প্রথা মানুষের নীতিজ্ঞানকে নষ্ট করে দিচ্ছে।"

ইংরাজী শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের মুখপাত্র "হিন্দু পেট্রিয়ট" এই আন্দোলনের পুনঃ প্রচেষ্টা সম্বন্ধে ১৮৬৬ সালের ২৬শে মার্চ লিখেছিলেন, "উৎসাহী সমাজ সংস্কারক পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের নেতৃত্বে কুলীনদের

বহু বিবাহ প্রথার অপব্যবহার নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আবার এক দশক পরে নতুন করে আন্দোলন সুরু হয়েছে। তাঁর এই প্রচেষ্টায় বাঙালা হিন্দু সমাজের ধনী, শিক্ষিত, সনাতনী ও আধুনিক মনোভাবাপন্ন সকল ব্যক্তির অনুমোদন আছে।······লক্ষ্য করা যায় যে আবেদনপত্রে সমাজের সকল শ্রেণীর ও সবরকম মতাবলম্বী ব্যক্তিদের স্বাক্ষর আছে। এই আবেদনপত্রে যে সব বড় জমিদারদের নাম আছে তাঁরা সকলে মিলে দেশের প্রায় অর্ধেক অংশের মালিক। নদীয়া, কলকাতা ও অন্যান্য জায়গার যে সব পণ্ডিতেরা আমাদের শাস্ত্রের ব্যাখ্যা করে থাকেন এবং যাঁরা আমাদের অতীতের জ্ঞান ও বিদ্যা সযত্নে রক্ষা করে রেখেছেন, তাঁরা এই আবেদনপত্রে স্বাক্ষর করেছেন। শহর ও মফঃস্বলের গোঁড়া সমাজের প্রতিনিধিদের, শিক্ষিত সমাজের মান্য নেতাদের এবং সর্বশেষে ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী সংস্কার পন্থী দলের নেতা ও অন্যান্য সদস্যদের স্বাক্ষরও এই আবেদনপত্রে আছে। সর্বশেষে উল্লেখ করলেও এঁদের গুরুত্ব কম নয়। বহু বিবাহ রীতির অপব্যবহারের প্রশ্ন নিয়ে আবেদনপত্রে কোনও যুক্তি তর্ক করা হয়নি। এ বিষয়ে কোনও আলোচনা না করার কারণ এই যে ১৮৬৬ সালে যে ৩২টি আবেদনপত্র দেওয়া হয়েছিল তাতে এ বিষয়ে অনেক আলোচনা ছিল। যে যুক্তি ও বিবেচনা অনুসারে এই প্রথার অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য দশ বছর আগে আন্দোলন সুরু হয়েছিল সেগুলির এখন পুনরুল্লেখ করলে কিছু অবান্তর হত না। কারণ এখন আরও অনেক ব্যক্তি স্বাধীনভাবে বিচার করে নিজস্ব মত দেওয়ার উপযুক্ত হয়েছে,—যারা দশ বছর আগে স্কুলের ছাত্র ছিল। আবার অনেক স্বাক্ষরকারী হয়ত দশ বছর আগে তাঁদের স্বাক্ষরিত দরখাস্তে যা লেখা হয়েছিল তা ভুলে গেছেন। এ অবস্থায় দরখাস্তটি সংক্ষিপ্ত হওয়ার ফলে যে কেউ কেউ মনে করেছেন যে বহু বিবাহ রীতিকে একেবারে তুলে দেওয়ার জন্য আবেদন জানানো হয়েছে, যদিও আসলে কেবলমাত্র এই রীতির অপব্যবহার বন্ধ করার জন্য এই দরখাস্ত করা হয়েছে, এতে বিস্মিত হওয়ায় কিছু নেই।"

প্রথম ও দ্বিতীয় আন্দোলনের দশ বছরের ব্যবধানের (১৮৫৬ ১৮৬৬) মধ্যে অনেক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত বাঙালী হিন্দু এই বহু বিবাহ রীতি সম্বন্ধে মত পরিবর্তন করেছিলেন। তাঁরা এই মত পোষণ করছিলেন যে দেশবাসীর মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের ফলে আপনা থেকেই বহু বিবাহের অপব্যবহারের বিরোধী মনোভাব গড়ে উঠবে।

সরকার যখন দেখলেন যে শিক্ষিত সম্প্রদায়ের বেশ বৃহৎ একটি অংশ বহু বিবাহ রীতিকে সংযত করার ব্যাপারে মধ্যবর্তী পথ নিতে চান, তখন এ বিষয়ে তাঁরা কোনও আইন করতে চাইলেন না। সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে এখনই কোনও বিল না এনে বরং এ বিষয়ে আরও অনুসন্ধান করা হোক। ১৮৬৬ সালের ৮ই আগষ্ট তারিখে তিনি বাংলা সরকারকে এক পত্রে জানালেন, "ভারতবর্ষে প্রচলিত বহু বিবাহ প্রথা একটি সামাজিক ও ধর্মীয় বিধান……এবং এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করলে ভারতবর্ষে এমন কি বাংলা দেশে, কি পরিমাণ বাধা আসতে পারে সে কথা সম্পূর্ণভাবে বিবেচনা করা হয়েছে বলে সপরিষদ গভর্ণর জেনারেল মনে করেন না। সপরিষদ গভর্ণর জেনারেলের মতে সরকারের কাছে যে কাগজপত্র আছে তা থেকে কোনও নিরপেক্ষ ব্যক্তি এই সিদ্ধান্ত করতে পারবেন না যে, বাংলা দেশের শিক্ষিত ও আধুনিক ব্যক্তিদের অধিকাংশ কুলীন ব্রাহ্মণদের অপব্যবহারের কথা ছেড়ে দিলে আন্তরিকভাবে এই প্রথার বিরোধিতা করেন।"

ভারত সরকারের নির্দেশে বাংলা দেশের লেফটেনাণ্ট গভর্ণর কয়েকজন বিশিষ্ট বাঙালীকে নিয়ে একটি কমিটি নিয়োগ করলেন। এই কমিটিতে সি. হবহাউস ও এইচ. টি. প্রিন্সেপকে নেওয়া হল। হিন্দুদের একাধিক স্ত্রী গ্রহণের স্বাধীনতাকে খর্ব না করে বহু বিবাহ প্রথা রদ করার জন্য কোনও আইন তৈরী করা সম্ভব কিনা এই কমিটিকে সে বিষয়ে তদন্ত করবার নির্দেশ দেওয়া হল। ১৮৬৭ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারী কমিটি তার রিপোর্ট দিলেন। এই রিপোর্টে কুলীন ব্রাহ্মণদের উৎপত্তি ও বিভিন্ন

শ্রেণী সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস দেওয়া হল। যে রীতি থেকে বহু বিবাহ প্রথার এই অপব্যবহার সুরু হয়েছে রিপোর্টে তার বিশ্লেষণ করা হয়েছিল। কমিটি নিম্নলিখিত অবস্থার কথা নির্দেশ করলেন :

হিন্দুদের বিবাহে যৌতুক দেওয়ার প্রথা আছে। কুলীন ব্রাহ্মণেরা কন্যাপক্ষের কাছ থেকে অন্যদের তুলনায় অনেক বেশী যৌতুক আদায় করেন। কেবল বদল বিয়ের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পাত্রীর ভাইএর সঙ্গে পাত্রের বোনের বিবাহ হলে সেখানে বেশী যৌতুক দেওয়ার কথা ওঠে না।

কুলীন জামাতারা যখনই শ্বশুরগৃহে যান তখনই তাঁদের সম্মানার্থে শ্বশুরকে কিছু অর্থ বা কোনও উপহার দিতে হয়। এই প্রথার ফলে বিবাহ বেশ লাভজনক পেশা হয়ে উঠেছে। একটি ব্রাহ্মণের যদি ত্রিশটি স্ত্রী থাকে তবে প্রতিমাসে কয়েকদিনের জন্য শ্বশুরালয়ে গিয়ে থাকলেই ভাল খেয়ে ও উপহার পেয়ে এবং জীবিকা অর্জনের কোনও চেষ্টা না করে তাঁর সারা বৎসর কেটে যেতে পারে। বহু বিবাহ প্রথার ফলে কুলীন ব্রাহ্মণেরা এক নিষ্কর্মা, পরভুক্‌শ্রেণী হয়ে উঠেছে এবং বিবাহের মত একটি সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানকে নীতিহীনতার উৎস করে তুলেছে।

অতএব অনেক কুলীন ব্রাহ্মণের জীবনধারণের একমাত্র অবলম্বন বহু বিবাহ করা।

কুলীনরা বৃদ্ধ বয়সেও বিবাহ করে। অনেক সময় স্ত্রীদের সঙ্গে তাদের সাক্ষাৎই হয় না অথবা বড় জোর ৩/৪ বৎসর পরে একবারের জন্য দেখা হয়।

এমন কথা শোনা যায় যে একজন কুলীন ব্রাহ্মণ একদিনেই ৩/৪টি বিবাহ করেছেন।

কোনও কোনও সময় একজনের সব কয়টি কন্যার ও অবিবাহিত ভগিনীদের একই ব্যক্তির সঙ্গে বিবাহ দেওয়া হয়।

কুলীন কন্যাদের জন্য পাত্র পাওয়ার খুব অসুবিধা থাকায় বহু কুলীন কন্যাকে অবিবাহিত থাকতে হয়।

কুলীনের ঘরের বিবাহিত বা কুমারী কন্যাদের খুব দুঃখের মধ্যে দিন কাটাতে হয়। কুলীনদের এই ধরনের বহু বিবাহের ফলে ব্যভিচার, গর্ভপাত, শিশুহত্যা ও বেশ্যাবৃত্তির মত জঘন্য সব অপরাধ সংঘটিত হয়।

৮২, ৭২, ৬৫, ৬০ ও ৪২টি করে স্ত্রী আছে এমন ব্যক্তিদের কথা জানা গেছে। তাদের ১৮, ৩২, ৪১, ২৫ ও ৩২টি পুত্র সন্তান ও ২৬, ২৭, ২৫, ১৫ ও ১৬টি কন্যা সন্তান আছে। বর্ধমান ও হুগলী জেলা থেকে তথ্য সংগ্রহ করে এক এক ব্যক্তির এতগুলি করে স্ত্রীর অস্তিত্ব জানা গেছে। এ ছাড়া আরও অনেক ক্ষেত্রেই যে এইরকম অবস্থা আছে তাও জানা গেছে।

কমিটির মতে কৌলিন্য প্রথা ও বহু বিবাহের কুফলগুলি এই : "স্ত্রী জাতিকে বৈধভাবে বাসনা তৃপ্তির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা, স্বাভাবিক ও আইন সঙ্গত রক্ষাকর্তা স্বামী কর্তৃক স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা, স্ত্রী জাতিকে কৌমার্য পালনে উদ্বুদ্ধ করা, স্ত্রীদের ভরণপোষণ না করা, স্বামীর খেয়াল ও খুসীমত স্ত্রীকে পরিত্যাগ করা বা তাদের প্রতি অত্যাচার করা, কেবলমাত্র অর্থলোভে বিবাহ করা, অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা না থাকলে দাম্পত্য সম্পর্ক থেকে বঞ্চিত করা, পারিবারিক সম্পত্তি নাশ, বিবাহের কোনও রকম কর্তব্য পালনের বিন্দুমাত্র দায়িত্ব না নিয়ে বিবাহ করা, বিবাহিত জীবনের সকল রকম দায়িত্ব ও রীতির বন্ধনে স্ত্রী জাতিকে আবদ্ধ রাখা অথচ তাদের বিবাহিত জীবনের সকল রকম সুবিধা থেকে বঞ্চিত করা, বেশ্যাবৃত্তি, ব্যভিচার, গর্ভপাত ও শিশু হত্যায় প্রবৃত্ত করা এবং সে অপরাধ গোপন রাখতে প্ররোচিত করা।"

হিন্দুশাস্ত্র থেকে প্রাসঙ্গিক উদ্ধৃতি দিয়ে কমিটি পরিষ্কারভাবে প্রমাণ করলেন যে, যে সব ধর্মশাস্ত্র হিন্দুরা মেনে চলেন তার মধ্যে এই প্রথার

কোনও বিধান বা নির্দেশ নেই। কমিটির মতে এ সম্বন্ধে একটি ঘোষণা-মূলক আইন করা কঠিন নয়। এই আইন অমান্য করলে শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু কমিটি দুঃখের সঙ্গে জানালেন যে তাঁদের সীমাবদ্ধ ক্ষমতার দরুণ একটি ঘোষণামূলক আইন করার সুপারিশও করতে পারছেন না। কমিটির বাঙালী সভ্যদের মধ্যে রামনাথ ঠাকুর, জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও দিগম্বর মিত্র মত দিলেন যে হিন্দুদের বহু বিবাহ প্রথার উপর কোনও আইনগত বাধা আরোপ করার প্রয়োজন নেই, শিক্ষার ফলে ও সামাজিক চাপে কুলীন ব্রাহ্মণেরা ক্রমশঃ এক বিবাহে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর এ বিষয়ে নিজের মতানৈক্য জানিয়ে নিম্নলিখিত মন্তব্যসহ নিজের নাম স্বাক্ষর করলেন। তিনি লিখলেন, "আমার মতে বহু বিবাহ প্রথার কুফল সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে……তা মোটেই অতিরঞ্জিত নয়। এই কুফল কিছু হ্রাস পেলেই যে আইন করার প্রয়োজন থাকবে না তা আমি মনে করি না।……

"কমিটির অন্যান্য সদস্যদের সিদ্ধান্তের সঙ্গে আমি একমত হতে পারছি না। আমার মতে হিন্দুদের এখন একাধিক বিবাহ করার যে স্বাধীনতা আছে তাকে ক্ষুণ্ণ না করে একটি ঘোষণামূলক আইন করা যেতে পারে।"

বাংলা দেশের লেফটেনাণ্ট গভর্ণর অন্ততপক্ষে একটা ঘোষণামূলক আইন করে বহু বিবাহ প্রথার বাড়াবাড়ি বন্ধ করার পক্ষপাতী ছিলেন। ভারত সরকারের কাছে ১৮৬৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী কমিটির রিপোর্টের সঙ্গে তিনি যে মন্তব্য লিখে পাঠিয়েছিলেন তা থেকে জানা যায় যে তিনি বিদ্যাসাগরের মতের প্রতিই বেশী সহানুভূতিশীল ছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : "তিন জন ভারতীয় সদস্য এ বিষয়ে আলাদাভাবে নিজেদের মত প্রকাশ করেছেন। তাঁরা আশা করেন যে শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে ও সামাজিক বিরোধিতার ফলে ক্রমশ কুলীন ব্রাহ্মণেরা এক বিবাহে অভ্যস্ত হয়ে উঠবে। কিন্তু আমি তাঁদের মত একথা নিশ্চিন্তভাবে মনে করতে

পারি না। হিন্দু সমাজে এই কয় বৎসরে এ বিষয়ে মনোভাবের অনেক পরিবর্তন হয়েছে যার ফলে জীবিকা নির্বাহের জন্য কুলীনদের একাধিক বিবাহ করা এখন খুব নিন্দনীয় হয়ে উঠেছে। উপরোক্ত তিনজন সদস্যদের কাছ থেকে এ কথা জেনে আমি খুশী হলাম। আশা করা যেতে পারে যে কুসংস্কারমুক্ত মনোভাব ক্রমশঃ প্রসারিত হবে এবং এই দুর্নীতি বন্ধ করার জন্য আইন প্রণয়নকেই একমাত্র কার্যকরী পন্থা বলে অদূর ভবিষ্যতেই স্বীকৃত হবে।"

বাংলা দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ কমিটির উপ-রোক্ত তিনজন ভারতীয় সদস্যের অনুরূপ অভিমত পোষণ করেন দেখে ভারত সরকার বহু বিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে কোনও ঘোষণামুলক আইন করতে রাজী হলেন না। ইতিমধ্যে ভারত সচিবের (সেক্রেটারী অব স্টেট) কাছ থেকে একটি সরকারী বার্তা (ডেস্‌প্যাচ্‌) পাওয়া গেল। তিনিও আইন করার ব্যাপারে অগ্রসর হতে আপত্তি জানালেন। কারণ কুলীন ব্রাহ্মণদের অপব্যবহারের কথা ছেড়ে দিলে, এমনকি বাংলা দেশেরও একটি বড় অংশ বহু বিবাহ প্রথার বিরোধী বলে তাঁর মনে হয় নি।

কিন্তু বিদ্যাসাগর কিছুতেই নিরস্ত হওয়ার মত লোক ছিলেন না। যদিও ১৫ বছর ধরে বিধবা বিবাহ আন্দোলন করে তাঁর যে তিক্ত অভিজ্ঞতা হয়েছিল তাতে সমাজ সংস্কার সম্বন্ধে দেশের লোকের মত গড়ে তোলার ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু দেখা গেল গত শতাব্দীর সপ্তম দশকে তিনি বহু বিবাহের বিরুদ্ধে প্রবল আন্দোলন চালাচ্ছিলেন, অবশ্য প্রধানতঃ লেখার মাধ্যমেই। ১৮৭১ ও ১৮৭৩ সালে বহু বিবাহ সম্বন্ধে তিনি দু'খানি গুরুত্বপূর্ণ পুস্তিকা প্রকাশ করেন। বিভিন্ন শাস্ত্র থেকে অসংখ্য উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি প্রমাণ করে দিলেন যে কৌলীন্য প্রথা বা বাংলা দেশের কুলীন ব্রাহ্মণদের মধ্যে যে উচ্চবর্ণের কন্যাদানের বিশেষ রীতি আছে, তার পিছনে কোনও শাস্ত্রীয় বিধান

নেই। তাঁর বিরোধী পক্ষের সমস্ত যুক্তি তিনি এইভাবে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করলেন। কলকাতা শহরের সবচেয়ে নিকটবর্তী হুগলী জেলায় কুলীনরা কি ভাবে বহু বিবাহ করে থাকেন তার একটা তথ্য তিনি সংগ্রহ করে-ছিলেন। এইসব কুলীনদের নাম ও তাঁদের স্ত্রীদের একটা সংখ্যাতালিকা তাঁর বইতে সংযোজন করেছিলেন।

অনেক কুলীন ব্রাহ্মণ হিসাবও রাখতেন না যে তাঁরা ক'টি মেয়েকে বিবাহ করেছেন। তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ অবশ্য একটি ছোট খাতায় বিয়ের ও বিয়েতে পাওয়া যৌতুকের তালিকা লিখে নিজেদের কাছে রেখে দিতেন। পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন শ্বশুরালয়ে গেলে শ্বশুররা তাঁদের কি কি জিনিস দিতেন তারও একটা তালিকা রাখতেন। বহু বিবাহ বিরোধী ব্যক্তিদের বিবৃতির সঙ্গে এ সব তথ্যও সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছিল। কিন্তু ১৮৫৭ সালের বিদ্রোহের ফলে বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট একটু বেশী সতর্ক হয়ে পড়েছিলেন। ভারতবাসীরা সমাজ ও ধর্ম সংস্কারে আঘাত লাগতে পারে এমন কোনও বিষয়ে তাঁরা আইন করতে চাইলেন না।

কিন্তু বিদ্যাসাগর বহু বিবাহ ও উচ্চশ্রেণীর কুলীনের ঘরে কন্যাদানের বাধ্যতামুলক প্রথার বিরুদ্ধে অক্লান্তভাবে সংগ্রাম করে যেতে লাগলেন। তিনি দেশবাসীর কাছে বিশেষভাবে আবেদন জানাতে লাগলেন যে সমাজের কল্যাণের জন্য তাঁরা যেন এ রীতি বর্জন করেন।

বহু বিবাহ সম্বন্ধে ১৮৭১ সালে প্রকাশিত প্রথম পুস্তকে তিনি লিখেছিলেন, "বহু বিবাহ প্রচলিত থাকাতে, অশেষ প্রকারে হিন্দু সমাজের অনিষ্ট ঘটিতেছে। সহস্র সহস্র বিবাহিতা নারী, যারপরনাই, যন্ত্রণা ভোগ করিতেছেন। ব্যভিচার দোষের ও ভ্রূণহত্যাপাপের স্রোত প্রবল বেগে প্রবাহিত হইতেছে। দেশের লোকের যত্নে ও চেষ্টায় ইহার প্রতিকার হওয়া কোনও মতে সম্ভাবিত নহে। সম্ভাবনা থাকিলে, তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিবার কিছু মাত্র প্রয়োজন থাকিত না। এক্ষণে, বহু বিবাহ

প্রথা রহিত হওয়া আবশ্যক, এই বিবেচনায়, রাজদ্বারে আবেদন করা উচিত ; অথবা এরূপ বিষয়ে রাজদ্বারে আবেদন করা ভাল নয়, অতএব তাহা প্রচলিত থাকুক, এই বিবেচনায় ক্ষান্ত থাকা উচিত। এই জঘন্য ও নৃশংস প্রথা প্রচলিত থাকাতে, সমাজে যে গরীয়সী অনিষ্ট পরম্পরা ঘটিতেছে, যাঁহারা তাহা অহরহঃ প্রত্যক্ষ করিতেছেন এবং তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া যাঁহাদের অন্তঃকরণ দুঃখানলে দগ্ধ হইতেছে, তাঁহাদের বিবেচনায় যে উপায়ে হউক এই প্রথা রহিত হইলেই, সমাজের মঙ্গল। বস্তুতঃ, রাজশাসন দ্বারা এই নৃশংস প্রথার উচ্ছেদ হইলে, সমাজের মঙ্গল ভিন্ন অমঙ্গল ঘটিবেক, তাহার কোনও হেতু বা সম্ভাবনা দেখিতে পাওয়া যায় না। আর যাঁহারা তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিয়াছেন, তাঁহাদের যে কোনও প্রকারে অন্যায় বা অবিবেচনার কর্ম্ম করা হইয়াছে, তর্ক দ্বারা তাহা প্রতিপন্ন করাও নিতান্ত সহজ বোধ হয় না। আমাদের ক্ষমতা গভর্ণমেণ্টের হস্তে দেওয়া উচিত নয়, এ কথা বলা বালকতা প্রদর্শন মাত্র। আমাদের ক্ষমতা কোথায়। ক্ষমতা থাকিলে ঈদৃশ বিষয়ে গভর্ণমেণ্টের নিকটে যাওয়া কদাচ উচিত ও আবশ্যক হইত না ; আমরা নিজেরাই সমাজের সংশোধন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারিতাম। ইচ্ছা নাই, চেষ্টা নাই, ক্ষমতা নাই, সুতরাং সমাজের দোষ সংশোধন করিতে পারিবেন না ; কিন্তু তদর্থে রাজদ্বারে আবেদন করিলে অপমানবোধ বা সর্বনাশজ্ঞান করিবেন, এরূপ লোকের সংখ্যা, বোধ করি অধিক নহে এবং অধিক না হইলেই মঙ্গল।”

এই আবেদনে কেউ কর্ণপাত করলেন না। কেবল তাঁর উপর নিন্দা আর গালি বর্ষিত হল। বিখ্যাত পণ্ডিতেরা লেখনীর মাধ্যমে এই গালি বর্ষণ করতে লাগলেন। তখন বিদ্যাসাগরের বয়স ৫২ বৎসর, তিনি নানা-রূপ ব্যাধিতে ভুগছিলেন। ১৮৫৫-৫৬ সালে বিধবা বিবাহ আন্দোলনের সময় তাঁর যে যৌবনসুলভ উৎসাহ ও শক্তি ছিল পরে তা অন্তর্হিত হয়েছিল। ঋণের দায় ও হতাশার দুঃখ তখন তাঁর উপরে ভারী বোঝার মত চেপে বসেছিল। কিন্তু যখন তাঁর উদ্দেশ্য সাধনে বাধা আসতে লাগল

এবং চতুর্দিক থেকে সমালোচকের দল বহু বিবাহ প্রথা রদ করার আন্দোলনের জন্য তাঁকে আক্রমণ করতে লাগল, তখন তিনি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে সকল শক্তি দিয়ে নিজেকে সমর্থন করলেন। বহু বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর দ্বিতীয় পুস্তক ১৮৭৩ সালে প্রকাশিত হয়। এই পুস্তকে তিনি তাঁর সমালোচকদের মত রূঢ় ভাষা ব্যবহার না করেই তাদের গালির উচিত জবাব দিলেন। কিন্তু গত শতাব্দীর অষ্টম দশকে হিন্দু ধর্মের পুনরভ্যুত্থান যখন চরম সীমায় পৌঁছল, তখন সেই উত্তেজনার মধ্যে বিদ্যাসাগরের এই প্রচেষ্টা আর অগ্রসর হতে পারল না। বিদ্যাসাগরের তখন শেষ জীবন। তাঁর এই প্রচেষ্টাই ছিল সেই শতাব্দীতে প্রগতিশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির মধ্যে শেষ সংগ্রাম। অবশ্য উনবিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে আবার আমরা এই সংগ্রাম সুরু হতে দেখি। কিন্তু তখনও প্রগতিশীল শক্তি সম্পূর্ণভাবে জয়ী হতে পারেনি।

দ্বাদশ অধ্যায়

জনসেবার বিভিন্ন ক্ষেত্রে

বিধবা বিবাহ প্রচলন ও বহু বিবাহ নিবারণের মত এত বড় ব্যাপারের জন্য সংগ্রাম করতে করতে বিদ্যাসাগর অন্যান্য জনসেবার কাজ করারও সময় করে নিয়েছিলেন। একটি স্বাধীন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান চালানোর নানাবিধ সমস্যা সমাধান, অসহায় বিধবা ও আশ্রিতদের রক্ষা করার জন্য হিন্দু এ্যান্নুইটী ফাণ্ড গঠন ও নাবালক জমিদারদের নিরাপত্তার জন্য ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশন পুনর্গঠন প্রভৃতি কাজ তিনি দেখাশোনা করতেন। মদ্যপান নিবারণী প্রচেষ্টার কাজেও বিদ্যাসাগর যোগ দিয়েছিলেন। মৃত্যুর কয়েক মাস পূর্বেও তিনি 'সহবাস সম্মতিবিল' পরীক্ষা করে সরকারের কাছে তাঁর অভিমত পাঠিয়েছিলেন। মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তাঁর কোনও বিশ্রাম ছিল না।

১৮৫৯ সালে উত্তর কলকাতায় স্থানীয় কয়েকজন বাঙালী ভদ্রলোক 'ক্যালকাটা ট্রেণিং স্কুল' নামে একটি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করে তার পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। আর্থিক লাভের কোন উদ্দেশ্য তাঁদের ছিল না। সরকারী ও মিশনারী শিক্ষায়তনের চেয়ে অল্প বেতনে মধ্যবিত্ত হিন্দু যুবকদের ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া ছিল তাঁদের লক্ষ্য। বিদ্যাসাগর ও তাঁর বন্ধু রাজকৃষ্ণ বন্দোপাধ্যায় এই বিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহক সমিতির সভ্য হলেন। বিদ্যাসাগরের পরিচালনায় বিদ্যালয়টির দ্রুত উন্নতি হতে লাগল। ১৮৬১ সালে নতুন কার্য নির্বাহক সমিতি গঠিত হল। বিদ্যাসাগর সমিতির সম্পাদক হলেন ও এই শিক্ষায়তনের সম্পূর্ণ কর্তৃত্ব গ্রহণ করলেন। ১৮৬৪ সালের প্রথম দিকে বিদ্যালয়ের নাম পরিবর্তন করে 'দি হিন্দু মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন' রাখা হল। সাহিত্য শাখায় উচ্চতর শিক্ষা দেওয়ার উদ্দেশ্যে

বিদ্যালয়টিকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করার জন্য ঐ বছর এপ্রিল মাসে আবেদনপত্র পাঠান হল।

আবেদনপত্রটি বাতিল হয়ে গেল সিণ্ডিকেটের বেশীর ভাগ ইউরোপীয় সদস্যের বিরুদ্ধতার জন্য। সম্পূর্ণভাবে এদেশীয় লোকেদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে তাঁরা উচ্চতর ইংরাজী শিক্ষাদানের অনুমতি দেওয়ার পক্ষপাতী ছিলেন না। কিন্তু বিদ্যাসাগর এ ধরনের পরাজয় মেনে নিতে অভ্যস্ত ছিলেন না। বিদ্যালয়ের পৃষ্ঠপোষক ও সভাপতি পাইকপাড়ার রাজ পরিবারের প্রতাপচন্দ্র সিংহের মৃত্যুর পর এই বিদ্যালয়ের পরিচালনার সমস্ত দায়িত্ব বিদ্যাসাগরের উপরে পড়ল। বিধবা বিবাহের জন্য তাঁর অনেক দেনা ছিল বলে তখন এ দায়িত্ব তাঁর পক্ষে খুব গুরুতর হয়ে পড়ল। কিন্তু বিদ্যালয়ের মঙ্গলের কথা ভেবে তিনি তা গ্রহণ করতে দ্বিধা করলেন না।

ফাষ্ট´ আর্টস পরীক্ষা পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি চেয়ে ১৮৭২ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে দ্বিতীয়বার আবেদন জানানো হল। এবারে বিদ্যাসাগর শুধু নিয়মমাফিক দরখাস্ত দিয়েই ক্ষান্ত থাকলেন না। সিণ্ডিকেটের একজন প্রভাবশালী সদস্য ই. সি. বেইলীর কাছে একটি ব্যক্তিগত পত্রও দিলেন। ১৮৭২ সালের ২৭শে জানুয়ারী তারিখে লিখিত এই পত্রে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে তিনি লিখেছিলেন: "এই বিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা সকলেই এদেশীয় বলে সিণ্ডিকেট সদস্যেরা যদি মনে করেন যে এখানকার শিক্ষার মান নীচু, তবে আমি আপনার অনুমতি নিয়ে আপনাকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে সংস্কৃত কলেজে বি. এ. পর্যন্ত পড়ানো হয়ে থাকে এবং সে কলেজের শিক্ষকেরা সকলেই এদেশীয়। যদি বিশেষ বিচার ও বিবেচনা করে অধ্যাপক নির্বাচন করা যায়, তবে উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যাবে। ইংরাজী শিক্ষা দেওয়ার জন্য যদি ইংরাজ অধ্যাপক নিয়োগের প্রয়োজন অনুভব করা যায়, তবে নিশ্চয়ই আমরা একজন ইংরাজ অধ্যাপক নিয়োগ করব……আমাদের উদ্দেশ্য যোগ্যতা ও মিতব্যয়িতার সমন্বয়.

করা। আমি প্রায় সারাজীবন ধরে বিদ্যালয় পরিচালনার কাজ করেছি। আশা করি অধ্যাপক নির্বাচন ও তাঁদের বেতন সংক্রান্ত ব্যাপারে আমার নিজের বিবেচনা মত কাজ করবার স্বাধীনতা আপনারা আমাকে দেবেন।

"......প্রেসিডেন্সী কলেজের মাসিক বেতন এত বেশী যে অনেক মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলে অত টাকা ব্যয় করতে পারে না। অথচ তাদের পিতামাতা মিশনারী কলেজে তাদের পাঠাতেও রাজী নন। এই সব যুবক তাই ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করার পর লেখাপড়া ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাদের পক্ষে এই বিদ্যালয় ভগবানের আশীর্বাদ স্বরূপ।

"মিঃ জাষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, কৃষ্টদাস পাল ও আমি এই বিদ্যালয়ের পরিচালক। আমাদের এখন যেরকম আর্থিক অবস্থা তাতে মনে হয় বিদ্যালয়ের প্রয়োজনীয় খরচ আমরা চালাতে পারব। যদি কোনও বিষয়ে অকুলান হয় তবে আমরা নিজেরা সে খরচ বহন করব। পাঁচ বছরের জন্য এই বিদ্যালয়ের ভার বহন করার যে আশ্বাস আমরা দিচ্ছি তাতে সিণ্ডিকেট সন্তুষ্ট ও নিশ্চিন্ত বোধ করতে পারেন বলে আমার বিশ্বাস।"

এবার আবেদন মঞ্জুর হল এবং এফ. এ. পর্যন্ত পড়ানোর অনুমতি দেওয়া হল। বাংলা দেশের অনেক বিশিষ্ট বিদ্বান ব্যক্তি এই শিক্ষায়তনে অধ্যাপক হিসাবে যোগ দিলেন। বেতনের কথা তাঁরা চিন্তা করলেন না। এ প্রশ্ন তাঁদের কাছে গৌণ ছিল। তাঁদের কাছে প্রধান আকর্ষণ ছিল বিদ্যাসাগরের ব্যক্তিত্ব ও তাঁর স্বাধীন জাতীয়তাবাদী মনোভাব, যে কারণে তিনি এই শিক্ষায়তনের দায়িত্ব নিজের উপরে তুলে নিয়েছিলেন। বিশ্ব-বিদ্যালয়ের পরীক্ষায় এই বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা গৌরবময় কৃতিত্ব দেখাল। এ দেশীয় লোকেদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্যালয়ে এ রকম ভাল ইংরাজী শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে দেখে ইউরোপীয়রা অত্যন্ত বিস্মিত হলেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার ও প্রেসিডেন্সী কলেজের প্রিন্সিপ্যাল মিঃ সাট্‌ক্লিফ স্বীকার করলেন যে 'পণ্ডিত' সত্যই বিস্ময়কর কাজ করেছেন। কর্মজীবন

থেকে অবসর নেওয়ার পর এই বিদ্যালয় গঠন করা ও কৃতিত্বের সঙ্গে এর পরিচালনা করাই ছিল বিদ্যাসাগরের অন্যতম স্থায়ী কৃতিত্ব। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বিদ্যাসাগর চরিত'-এ এই কৃতিত্বের সম্বন্ধে বলেছেন, "বাঙালির নিজের চেষ্টায় এবং নিজের অধীনে উচ্চতর শিক্ষার কলেজ স্থাপন এই প্রথম। আমাদের দেশে ইংরাজী শিক্ষাকে স্বাধীনভাবে স্থায়ী করিবার এই প্রথম ভিত্তি বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইল। যিনি দরিদ্র ছিলেন, তিনি দেশের প্রধান দাতা হইলেন ; যিনি লোকাচাররক্ষক ব্রাহ্মণপণ্ডিতের বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি লোকাচারের একটি সুদৃঢ় বন্ধন হইতে সমাজকে মুক্ত করিবার জন্য সুকঠোর সংগ্রাম করিলেন এবং সংস্কৃতবিদ্যায় যাঁহার অধিকারের ইয়ত্তা ছিল না, তিনিই ইংরাজী বিদ্যাকে প্রকৃত প্রস্তাবে স্বদেশের ক্ষেত্রে বদ্ধমূল করিয়া রোপণ করিয়া গেলেন।"

স্বদেশী মনোভাবের সঙ্গে ইংরাজী শিক্ষার সংমিশ্রণ হওয়াতে সুদূরপ্রসারী ফল ফলল। আমাদের দেশের নবোদ্ভিন্ন স্বাদেশিকতার প্রতিপালন এই বিদ্যায়তনে হতে লাগল। আমাদের মহান জাতীয় নেতা সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় তাঁর আত্মজীবনী 'এ নেশন ইন মেকিং'-এ এ বিষয়ে উল্লেখ করেছেন। তাঁকে ভারতীয় সিভিল সার্ভিস থেকে বরখাস্ত করা হয়েছিল। এমন কি উকীল বা ব্যারিষ্টার হিসাবে আদালতে বসবার অনুমতিও তিনি পাননি। দ্বিতীয়বার বিলাতে গিয়ে তিনি ১৮৭৫ সালের জুন মাসে কলকাতায় ফিরে আসেন। তখন তাঁকে কোনও রকম বৃত্তি গ্রহণ করতে দেওয়া হল না। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "আমার জন্য কোনও কাজের সংস্থান থাকল না, জীবিকা অর্জনের জন্য কোনও পথ আমার জন্য খোলা রইল না।" কিন্তু সহসা তাঁর সামনে একটা দ্বার খুলে গেল। তিনি লিখেছেন : "শীঘ্রই পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর আমাকে মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনে ইংরাজীর অধ্যাপকের পদ দিতে চাইলেন। আমি সে কাজ গ্রহণ করলাম। আমার বিভিন্ন বক্তৃতার জন্য আমি তখন ছাত্রদের কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলাম। আমার মনে হয় সেই কারণেই আমি

চাকরীটি পেলাম বেতন সামান্যই ছিল। এ্যাসিসটাণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে আমি যে বেতন পেতাম তার অর্ধেকেরও কম, মাসে দুশত টাকা মাত্র। কিন্তু আমি আনন্দিত হলাম, কারণ করবার মত কিছু কাজ আমি পেলাম এবং এই কাজ থেকে আর একটা সুযোগ পেলাম। সে সুযোগের আমি পূর্ণ সদ্ব্যবহার করলাম। আমার সাধ্য অনুযায়ী এই সর্বরকমে আমি তরুণদের মনে জনসেবার আদর্শ সঞ্চার করার এবং মাতৃভূমির ও তাদের নিজেদের কল্যাণের জন্য দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা করলাম।"

১৮৮১ থেকে ১৮৯২, এই বার বৎসরের মধ্যে (বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয় ১৮৯১ সালে) মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন থেকে ৪৯৮ জন ছাত্র বি. এ. ও ৩৩ জন ছাত্র এম এ. পাশ করেছিল। ১৮৮২ সাল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় এখানে আইন পড়ানোর অনুমতি দেন এবং এই দশ বৎসরের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠানের ৫১৩ জন ছাত্র বি. এল. ডিগ্রী লাভ করেছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে যাঁরা জাতীয়তা আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে আইন জীবীরাই ছিলেন প্রধান। অতএব এ কথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে জাতীয়তাবাদী বাঙালী আইনজীবীদের মধ্যে অনেকেই মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশনের ছাত্র ছিলেন এবং এই প্রতিষ্ঠান ছিল বিকাশোন্মুখ জাতীয়তাবাদীর পালন কেন্দ্র।

বিদ্যাসাগর যখন এই বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠা করেন তখন তিনি কি এই পরিণতির কথা কল্পনার দৃষ্টিতে দেখতে পেয়েছিলেন? মনে হয় তিনি তা দেখেছিলেন, তাই সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের মত রাজনৈতিক মনোবৃত্তি-শালী ব্যক্তিকে তিনি এই কলেজের অধ্যাপক নিযুক্ত করেছিলেন। অধ্যাপক নির্বাচনের নীতির পিছনে নিশ্চয়ই একটা নিয়ম বা শৃঙ্খলা ছিল। তাঁর উদ্দেশ্য যাই হোক না কেন এ কথা নিঃসন্দেহ যে তিনি এদেশে ইংরাজী শিক্ষাকে বদ্ধমূল করেছিলেন। সে সময়ে এই কাজ করার বিশেষ প্রয়ো-

জন ছিল, কেননা হিন্দু কলেজ বা মিশনারী কলেজের বিদেশী আবহাওয়ায় যুবকদের মধ্যে জাতীয় মনোবৃত্তি গড়ে উঠছিল না। সমাজের মঙ্গলের জন্য এ অবস্থার অবসানের প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগরের পরিচালনায় একমাত্র মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে সচেতনভাবে সংগ্রাম করেছিল। বিদ্যাসাগরের মৃত্যুর পরে এই প্রতিষ্ঠানের নাম পরিবর্তন করে 'বিদ্যাসাগর কলেজ' রাখা অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত হয়েছিল এবং এখনও পর্যন্ত এই কলেজ জাতীয় শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের মহান দানের পরিচয় বহন করছে।

আর একটি বিষয়ে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টার উল্লেখ করা দরকার। একান্নবর্তী পরিবার ছিল উনবিংশ শতাব্দীর হিন্দু সমাজের প্রধান কাঠামো। যখন সেই পরিবারের কর্তার মৃত্যু হত তখন তাঁর স্ত্রী, পুত্র ও অন্যান্য আশ্রিত পরিজনদের সহসা অত্যন্ত আর্থিক কষ্টে পড়তে হত। সে সমস্যার কোনও সহজ সমাধান ছিল না। এই বিপদে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবার ভেঙ্গে পড়ত। বিদ্যাসাগর নিজে নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তান ছিলেন বলে একান্নবর্তী পরিবারের এই আর্থিক নিরাপত্তাহীনতার আতঙ্ক ভাল ভাবে জানতেন। এই সমস্যা সমাধানে তাঁর চেষ্টা সার্থক হল ১৮৭২ সালের ১৫ই জুন তারিখে—যে দিন তিনি হিন্দু এ্যান্যুইটী ফাণ্ড স্থাপন করলেন।

সে সময় জীবনবীমা বা এ্যান্যুইটী ফাণ্ডের প্রচলন ছিল না। গরীব মধ্যবিত্ত পরিবারের উপার্জনশীল ব্যক্তির মৃত্যুর পর অসহায় পরিবারবর্গের ন্যূনতম আর্থিক নিরাপত্তা ছিল বিদ্যাসাগরের মতে সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। এই কারণে তিনি এ্যান্যুইটী ফাণ্ড প্রতিষ্ঠা করলেন। যদি কেউ চাইতেন যে তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর স্ত্রী বা পরিবারবর্গ প্রতি মাসে পাঁচ টাকা করে ভাতা পান, তবে তাঁর জীবদ্দশায় তাঁকে প্রতি মাসে ঐ পরিমাণ অর্থের এক চতুর্থাংশ ফাণ্ডে জমা দিয়ে যেতে হ'ত। এই ভাতার সর্বোচ্চ পরিমাণ ছিল মাসিক ত্রিশ টাকা। সে ক্ষেত্রে মাসে মাসে সাড়ে সাত টাকা করে

প্রিমিয়াম দিয়ে যেতে হ'ত। বাংলা দেশের নিম্ন ও মধ্য আয়ের সংসারের কথা চিন্তা করে বিদ্যাসাগর সর্ব নিম্ন ও সর্বোচ্চ ভাতার পরিমাণ স্থির করেছিলেন।

মেট্রোপলিটন ইনষ্টিটিউশন ভবনে এই ফাণ্ডের পরিচালকদের প্রথম সভা বসে। সে সময় ফাণ্ডে আমানতকারীদের সংখ্যা ছিল মাত্র দশ জন, এ ছাড়া কয়েকজন ধনী ব্যক্তিও কিছু অর্থ দান করেছিলেন। বিদ্যাসাগর ব্যতীত এই ফাণ্ডের বিশিষ্ট পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন জাষ্টিস দ্বারকানাথ মিত্র, জাষ্টিস রমেশ চন্দ্র মিত্র ও মহারাজা যতীন্দ্র মোহন ঠাকুর। ১৮৭৫ সালের শেষ ভাগ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর এই ফাণ্ডের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ১৮৭৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী তারিখে এই ফাণ্ডের সঙ্গে সংশ্রব ত্যাগ করার কারণ দেখিয়ে তিনি বোর্ড অব ট্রাষ্টির কাছে এক দীর্ঘ পত্র লেখেন। এই সব ফাণ্ডের পরিচালনার ব্যাপারে যেমন হয়ে থাকে সে রকম ত্রুটি বিচ্যুতি ঘটতে লাগল। স্বভাবতই বিদ্যাসাগরের মত অত্যন্ত সৎ ব্যক্তি এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের নাম জড়িত রাখতে চাইলেন না। তিনি পরিচালকদের বিরুদ্ধে ফাণ্ডের নিয়ম লঙ্ঘন ও ফাণ্ডের অবহেলা করার অভিযোগ আনলেন। পত্রে তিনি লিখলেন: "এই ফাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত থাকার জন্য আপনাদের বিশেষ অধিবেশনে আপনারা আমাকে যে অনুরোধ করেছেন তা আমার পক্ষে রাখা সম্ভব নয়। বহু ব্যক্তি এই ফাণ্ডে অর্থ জমা দেবেন কিনা সে বিষয়ে আমার কাছে পরামর্শ নিতে আসেন। তখন আমি খুব দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ি। ফাণ্ডের বর্তমান অবস্থায় তাঁদের এখানে টাকা জমা দেওয়ার উপদেশ দেওয়া আমি অন্যায় বলে মনে করি, আবার কাউকে ফাণ্ডের সভ্য হতে বারণ করাকেও আমি সমান অন্যায় বলে মনে করি। কারণ আমার মনে যখন ধারণা হয়েছে যে ভবিষ্যতে ফাণ্ডের কাজে গোলযোগ দেখা দিতে পারে তখন, কাউকে এখানে টাকা গচ্ছিত করার কথা বললে তাকে ঠকানো হবে, আবার তাকে নিবৃত্ত করলে ফাণ্ডের বিরুদ্ধতা করা হবে। ইচ্ছা করে কোনও লোককে ঠকানো বা ফাণ্ডের সদস্য হয়ে তার বিরুদ্ধতা করা, দু'টি কাজই সমান অন্যায়। ফাণ্ডের সঙ্গে

যোগাযোগ রাখলে আমাকে এই দুটি অন্যায়ের একটি করতে বাধ্য হতে হবে। এই উভয় সঙ্কটের জন্য আমি আপনাদের অনুরোধ রক্ষা করতে পারছি না। সেজন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করছি।"

বিদ্যাসাগর ফাণ্ডের সংশ্রব ছেড়ে দেওয়ার পর কিছুদিনের মধ্যে আরও কয়েকজন পরিচালক তাঁদের নাম প্রত্যাহার করে নিলেন। এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোক্তাদের লোকহিতকর উদ্দেশ্যের কথা স্মরণ করে ও বহু মধ্যবিত্ত লোকের স্বার্থ এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত রয়েছে দেখে শেষ পর্যন্ত সরকার এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেন।

বাংলা দেশের রাজা ও জমিদারদের নাবালক উত্তরাধিকারীদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য সরকার ১৮৫৪-৫৫ সালে 'ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশান' প্রতিষ্ঠা করেন ও এর পরিচালনার ভার 'বোর্ড অব রেভিন্যু'র উপর দেওয়া হয়। সে যুগের বিখ্যাত পণ্ডিত রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে এই প্রতিষ্ঠানের অধিকর্তা নিযুক্ত করা হয়। বোর্ড ১৮৬৩ সালের নভেম্বর মাসে বিদ্যাসাগরকে এই প্রতিষ্ঠানের পরিদর্শক মনোনীত করেন। চার পাঁচ বার পরিদর্শন করবার পর ১৮৬৪ সালের এপ্রিল মাসে তিনি বোর্ডের কাছে এক স্মারকলিপি পেশ করলেন। এই স্মারকলিপিতে তিনি কয়েকটি পরিবর্তনের প্রস্তাব করলেন। তখন বোর্ড বিদ্যাসাগরকে এ বিষয়ে একটি সম্পূর্ণ রিপোর্ট তৈরী করবার জন্য অনুরোধ করলেন। সেই অনুযায়ী বিদ্যাসাগর ১৮৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে রিপোর্ট দিলেন এবং পরে এ বিষয়ে আরও কিঁছু বক্তব্য জানালেন। তাঁর প্রধান প্রস্তাবগুলি ছিল এই:

বর্তমানে স্কুলটিতে কেবল ছাত্রদের থাকার ব্যবস্থা আছে। সেটিকে বোর্ডিং স্কুলে পরিণত করা উচিত।

ওয়ার্ডদের উপযোগী একটি আলাদা ধরনের পাঠ্যসূচী তৈরী করা উচিত।

তাদের শিক্ষার জন্য উপযুক্ত শিক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা করা উচিত।

এই রিপোর্টে আরও একটি প্রয়োজনীয় কথা ছিল। প্রতিষ্ঠানের নিয়ম ছিল 'গুরুতর অন্যায়' করলে দৈহিক শাস্তি দেওয়া হবে। কিন্তু বিদ্যাসাগর প্রতিষ্ঠানের খাতাপত্র পড়ে দেখলেন যে, যে সব কারণে ছেলেদের দৈহিক শাস্তি দেওয়া হয় সেগুলিকে গুরুতর অন্যায় বলা চলে না। বিদ্যাসাগর তাঁর রিপোর্টে মন্তব্য করলেন, "আপনাদের অনুমতি নিয়ে আমি বলতে চাই যে দোষ যে ধরনের হোক না কেন শিক্ষা দেওয়ার জন্য দৈহিক শাস্তির প্রথা একেবারে তুলে দেওয়া উচিত। দৈহিক শাস্তির ক্ষতিকর পরিণামের কথা বিবেচনা করে অন্যান্য শিক্ষায়তনে এটা একেবারে কড়াকড়িভাবে নিষিদ্ধ হয়ে গেছে। বেত্রাঘাত না করেই শত শত ছাত্রদের সেখানে শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে। তাহলে ওয়ার্ডস ইনষ্টিটিউশানে এই ধরনের শাস্তি দেওয়ার প্রয়োজন কেন হবে। আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হয় এখানকার শিক্ষার্থীদের প্রতি এরকম নিষ্ঠুর ব্যবহার করা শোভা পায় না। ছেলেদের শিক্ষা দেওয়ার ব্যাপারে আমার কিছু অভিজ্ঞতা আছে। আমার দৃঢ় ধারণা যে দৈহিক শাস্তির মধ্যে যে অমর্যাদার গ্লানি আছে তা শিক্ষার্থীদের শোধরানোর চেয়ে ক্ষতিই বেশী করে। যত শীঘ্র সম্ভব এ প্রথা তুলে দেওয়ার জন্য আমি বিশেষভাবে অনুরোধ জানাচ্ছি।"

সমাজ ও শিক্ষার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার কার্য করেছিলেন তার মধ্যে এটি ছিল একটি, যদিও সচরাচর এই বিষয়টির উপর কেউ গুরুত্ব দেন না। এমন কি বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে কলকাতার মত শহরে ছাত্রদের বেত্রাঘাত করা হত। বিদ্যাসাগর দৈহিক শাস্তি দেওয়ার একেবারে বিপক্ষে ছিলেন এবং প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে যতগুলি বিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি সংশ্লিষ্ট ছিলেন সে সব জায়গায় তিনি এই দৈহিক শাস্তি তুলে দিয়েছিলেন। এমন কি ছাত্রদের বেঞ্চএর উপরে দাঁড় করিয়ে অন্যান্য সহপাঠীদের সামনে তাদের অপমান করার শাস্তিরও তিনি পক্ষপাতী ছিলেন না। মেট্রোপলিটন ব্রাঞ্চ ইনষ্টিটিউশনের প্রধান শিক্ষক একবার একজন ছাত্রকে এইরকম শাস্তি দেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে এজন্য

পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছিলেন। বিদ্যাসাগরের প্রস্তাব অনুযায়ী ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউশনে দৈহিক শাস্তি দেওয়ার প্রথা তুলে দিয়ে অনেক উদার ও মানবতাপূর্ণ শিক্ষানীতি গ্রহণ করার ব্যবস্থা হয়েছিল।

আর একটি বিষয়ে আলোচনা করা যাক। ১৮৬৯ সালে লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে হিন্দু উত্তরাধিকার আইন বিলের আকারে আনীত হয়। তার আগে পর্যন্ত উত্তরাধিকারের সমস্যা ইণ্ডিয়ান সাক্সেশান এ্যাক্ট অনুযায়ী সমাধান করা হত। এই এ্যাক্ট ভারতীয় ও অভারতীয় উভয়ের উপরই সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। সুপ্রীম কোর্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর বাংলা দেশের ধনী ব্যক্তিরা তাঁদের ইচ্ছা অনুযায়ী উইল করে যেতেন। ফলে অসংখ্য গুরুতর ও জটিল মকদ্দমার সৃষ্টি হত। এই আইনের কিছু কিছু পরিবর্তন প্রয়োজন ছিল। এই বিল উত্থাপনের সময়ে হিন্দুদের জনমত খুব বিক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছিল। সরকার হিন্দু সমাজের প্রতিনিধিস্থানীয় ব্যক্তিদের, বিশেষতঃ সংস্কৃত শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের মত জিজ্ঞাসা করলেন। বিদ্যাসাগরের কাছেও মত চাওয়া হল। তিনি বিলের দুটি ধারার বিরোধিতা করলেন। প্রথমতঃ হিন্দু শাস্ত্রে অজাত ব্যক্তিকে কিছু দান করা আইন বিরুদ্ধ, কিন্তু ঐ আইনের কোনও কোনও ক্ষেত্রে তা সিদ্ধ ছিল। দ্বিতীয়তঃ চিরস্থায়ী স্বত্বের বিরুদ্ধে যে আইন করা হচ্ছিল তা হিন্দু শাস্ত্র বিরোধী। বিদ্যাসাগরের যুক্তিগুলি ছিল নির্ভুল এবং শাস্ত্রীয় প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু সরকার এসব প্রস্তাব শুনলেন না। ১৮৭০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিলটিকে আইনে পরিণত করলেন। বিদ্যাসাগরের মত মহান সংস্কারক যে সব সময় হিন্দু সমাজের বিপক্ষে চলতেন না তা এই হিন্দু উত্তরাধিকার আইন সম্বন্ধে তাঁর অভিমত থেকে বোঝা যায়।

এবার আমরা বিদ্যাসাগরের মদ্যপান নিবারণ প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করব। ইউরোপীয়দের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের ফলে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাঙালীরা, বিশেষতঃ কলিকাতাবাসী উচ্চ ও মধ্যবিত্ত সমাজের বাঙালীরা মদ্যপানে আসক্ত হয়ে উঠেছিলেন। প্রায়-প্রতিদিনই ইউরোপীয়

ও অভিজাত বাঙালীদের গৃহে আমোদ উৎসব ও পার্টি হত। সেখানে সব রকম বিদেশী মদের অবাধ স্রোত বয়ে যেত। উচ্চ শ্রেণীর বাঙালী সমাজের উদাহরণ থেকে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজের বাঙালীদের মধ্যেও এই অভ্যাস সুরু হল। উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে 'ইয়ং বেঙ্গল'দের যুগের একটি অতি প্রচলিত কথা ছিল মদ্যপান করা প্রগতির লক্ষণ এবং যে মদ্যপান না করে সে প্রতিক্রিয়াশীল। বাংলা দেশে পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার করেছিল যে হিন্দু কলেজের ছাত্রেরা, এটি ছিল তাদের কথা। ক্রমশঃ ছোট শহরের বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে এই বদঅভ্যাস ছড়িয়ে পড়ল। এই অবস্থা দেখে শিক্ষাবিদরা ভীত হয়ে পড়লেন এবং এটা বন্ধ করার জন্য কোন্ পথ অবলম্বন করা যাবে বিশেষ ভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

গত শতাব্দীর ষষ্ঠ দশকে বাংলা দেশের কয়েকজন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ও সমাজ সংস্কারক মদ্যপান নিবারণী আন্দোলন সুরু করেছিলেন। এ ব্যাপারের সঙ্গে প্যারী চরণ সরকার নামে একজন শিক্ষাব্রতীর নাম চির-কালের জন্য জড়িত হয়ে আছে। তিনি সব রকম সমাজ সংস্কারের আগ্রহশীল সমর্থক ও বিদ্যাসাগরের বিশেষ বন্ধু ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁর প্রচেষ্টায় মদ্যপান নিবারণী আন্দোলন সুরু হয়েছিল এবং ১৮৬৪ সালের প্রথমদিকে কলকাতায় 'বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটি' প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই সময় বিদ্যাসাগর এই সোসাইটিতে যোগদান করেন ও এর পরিচালনার কাজে বিশিষ্ট অংশ গ্রহণ করেন। দশ বছরের মধ্যে এই আন্দোলন খুব শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং প্যারী চরণ সরকারের মৃত্যুর পরেও এর কাজকর্ম কিছুমাত্র শিথিল হয় নি। ১৮৭৫ সালের ২৭শে নভেম্বর বিদ্যাসাগর ডাঃ ভুবনমোহন সরকারকে এক পত্রে লিখেছিলেন : "আমার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় আমি আজ সন্ধ্যায় বেঙ্গল টেম্পারেন্স সোসাইটির অধি-বেশনে যোগদান করতে পারছি না বলে অত্যন্ত দুঃখিত। আমার শরীরের কথা আপনি অবগত আছেন। প্রিয় সুহৃত্ত বাবু প্যারী চরণ সরকারের মৃত্যুতে আমি কি গভীর শোক পেয়েছি সে কথা আপনার চেয়ে বেশী আর

কেউ জানে না। কিশোর বয়স থেকে আমরা পরস্পরের সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক এত ঘনিষ্ঠ ছিল যে তাঁর মৃত্যু আমার কাছে একজন স্নেহশীল ভ্রাতার মৃত্যুর মত। তাঁর মৃত্যুতে জনসাধারণের যে ক্ষতি হয়েছে তা সহজে পূরণ হওয়ার নয়। তিনি তাঁর কর্মদক্ষতা, আদর্শ চরিত্র ও জনহিতকর কাজে একাগ্র উৎসাহের জন্য সমাজের সকলের কাছে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় হয়ে উঠেছিলেন। মদ্যপান নিবারণী সমিতি প্রতিষ্ঠা করা, অনেক মূল্যমান ইংরাজী ও বাংলা পুস্তিকা প্রকাশ করা এবং অন্যান্য কাজের জন্য মদ্যপান নিবারণী প্রচেষ্টার উন্নতিকামীরা তাঁকে কৃতজ্ঞচিত্তে বহুকাল পর্যন্ত স্মরণ করবেন।"

উপরে যে অধিবেশনের কথা বলা হয়েছে সেখানে সেদিন সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় যোগ দিয়েছিলেন এবং বহু লোকের সমাবেশে এই জাতীয়তাবাদী সুবক্তা তাঁর প্রথম প্রকাশ্য বক্তৃতা প্রদান করেন। এ বিষয়ে তিনি তাঁর আত্মজীবনী 'এ নেশন ইন মেকিং'এ লিখেছেন, "আমার কলকাতায় ফেরার কিছুদিন পরে (১৮৭৫ সালের জুন মাসে) কলকাতা মেডিকেল কলেজের বক্তৃতাকক্ষে মদ্যপান নিবারণী আন্দোলনের সমর্থনে একটি সভা হয়। সভায় খুব জনসমাগম হয়েছিল। সে সময়ে এই আন্দোলন অনেক লোকের মধ্যে সাড়া জাগিয়েছিল এবং এর প্রেরণাদাতা প্যারী চরণ সরকারের প্রচেষ্টা ফলবতী হয়ে উঠেছিল। এই আন্দোলন যে কার্যকরী হয়েছিল তার নির্ভুল প্রমাণ এই যে উদীয়মান যুবক সম্প্রদায় অপরিমিত মদ্যপানের কুফল উপলব্ধি করে সত্যসত্যই ভীত হয়ে উঠেছিল।"

এ ঘটনার কিছুদিন পরে সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় বিদ্যাসাগরের মেট্রোপলিটন কলেজে অধ্যাপক নিযুক্ত হ'ন। এ বিষয়ে তিনি লিখেছেন, "আমার বক্তৃতার জন্য আমি ছাত্রদের কাছে খুব প্রিয় হয়েছিলাম। আমার মনে হয় এই জন্যই আমি চাকরীটি সহজে পেয়েছিলাম।······কলকাতা, উত্তরপাড়া, খিদিরপুর ও অন্যান্য জায়গায় আমি ভারতীয় ঐক্য, ইতিহাস পাঠ, ম্যাট্সিনির জীবন, চৈতন্যদেবের জীবন, উচ্চ ইংরাজী শিক্ষা প্রভৃতি

বিষয়ে অনেকগুলি বক্তৃতা দিয়েছিলাম। বহু জায়গা থেকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য আমাকে আমন্ত্রণ করা হত, আমি সব জায়গাতেই যেতাম।" সুরেন্দ্রনাথের এই উক্তি থেকে বোঝা যায় যে উনবিংশ শতাব্দীর ষষ্ঠ ও সপ্তম দশকে বিদ্যাসাগর প্রমুখ ব্যক্তিদের প্রচেষ্টায় যে মদ্যপান নিবারণী আন্দোলন চলছিল সেটা উদীয়মান জাতীয়তাবাদী নেতাদের শিক্ষাক্ষেত্র হয়ে উঠেছিল।

এবার আমরা সহবাস সম্মতি বিলের কথা আলোচনা করব। ১৮৯০ সালে বালিকা স্ত্রীদের সহবাস সম্মতির বয়স সম্বন্ধে ইণ্ডিয়ান পেনাল কোড ও ক্রিমিনাল প্রসিডিওর কোডের কয়েকটি ধারা বদল করবার জন্য লেজিস্‌লেটিভ কাউন্সিলে একটি বিল আনা হয়েছিল। সমস্ত গুরুতর সামাজিক বিষয়ে সরকার বিদ্যাসাগরের অভিমত জিজ্ঞাসা করতেন। বিদ্যাসাগর সে সময় গুরুতরভাবে পীড়িত অবস্থায় মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। কিন্তু তবুও সমাজ সংস্কার ও দেশের কল্যাণের ইচ্ছা তখনও তাঁর অন্তরে প্রজ্জ্বলিত ছিল। মৃত্যুশয্যায় শুয়ে প্রয়োজনীয় শাস্ত্র পর্যালোচনা করে ১৮৯১ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারী তিনি সরকারের কাছে তাঁর অভিমত পাঠিয়ে দিলেন। বিলের কয়েকটি প্রধান ধারা হিন্দুদের প্রচলিত আচার ব্যবহারের বিরুদ্ধে যাচ্ছে দেখে বিদ্যাসাগর সেই ধারাগুলির সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু "কোনও ধর্মের আচার ব্যবহার লঙ্ঘন না করে বালিকা বধূদের রক্ষা করার যথেষ্ট ব্যবস্থা হয়েছিল" বলে তিনি বিলটি সমর্থন করেছিলেন। বিলের মধ্যে শাস্তি প্রদানের ধারাটি তিনি বিশেষভাবে সমর্থন করেছিলেন। কারণ তাঁর মতে "নিয়ম লঙ্ঘন করলে শাস্ত্রে যে শাস্তির বিধান আছে তা আধ্যাত্মিক শাস্তি এবং সে শাস্তি অমান্য করার সম্ভাবনা আছে। শাস্ত্রীয় বিধানকে যদি আইনের মর্যাদা দেওয়া হয় তবে সে বিধানকে বেশী কার্যকরী করা যেতে পারবে।"

সহবাস সম্মতি বিল সম্বন্ধে বিদ্যাসাগর যে মন্তব্য পাঠিয়েছিলেন কেউ কেউ তার ভুল অর্থ করে বলেছেন যে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দুদের সনাতন

আচার ব্যবহারের প্রতি বিদ্যাসাগরের প্রথম বয়সে যে বিরোধিতা ছিল, তা শেষ বয়সে কমে গিয়েছিল। এই মহান সমাজ সংস্কারককে তাঁরা একেবারে ভুল বুঝেছিলেন। কেবলমাত্র পুরাতন বা ঐতিহ্যময় বা লোকে একান্তভাবে বিশ্বাস করে বলে কোনও আচার ব্যবহারের প্রতি তাঁর কোনও আকর্ষণ বা শ্রদ্ধা ছিল না। অবশ্য তরুণ ডিরোজীয় শিষ্যদের মত পুরাতনের ভাবরূপ ধ্বংস করার মত মনোভাবও তাঁর ছিল না। সমাজের পক্ষে নিশ্চিতভাবে ক্ষতিকর না হলে তিনি ঐতিহ্যের বন্ধন ছিন্ন করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। বিধবা বিবাহের আইন সঙ্গত ব্যবস্থা করবার পর কোনও কোনও ব্যক্তি হিন্দু বিবাহকে একটি চুক্তিতে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে যে বিদ্যাসাগর তাতে সম্মত হননি, যদিও তিনি জানতেন যে সে সময়ে হিন্দু বিবাহ ব্যবস্থা যে রকম ছিল তাতে আইনের সমর্থন সত্ত্বেও তা নিষ্ফল হবে। সহবাস সম্মতি বিলের বেলাতেও তিনি হিন্দুদের আচার ব্যবহারের ঘোর বিরোধী ব্যবস্থা অবলম্বন করবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তবে নিয়ম লঙ্ঘনকারীদের শাস্ত্রে যে শাস্তির বিধান আছে তা কার্যকরী নয় বলে তিনি এ বিষয়ে আইনে শাস্তিমূলক ব্যবস্থার প্রবল সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মন্তব্যের শেষ লাইনে তিনি আইনে শাস্তির ব্যবস্থা রাখার উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলেছিলেন: "এ বিষয়ে সরকারকে বিশেষভাবে বিবেচনা করার জন্য আমি অনুরোধ করছি।" ভারতবর্ষের হতভাগ্য বালিকা বধূদের রক্ষা করার জন্য সরকারের কাছে সেই ছিল তাঁর শেষ আবেদন। এর কয়েকমাস পরে ১৮৯১ সালের জুলাই মাসে বিদ্যাসাগরের মৃত্যু হয়। মৃত্যুশয্যা থেকেই তিনি আমাদের দেশের নারীদের কল্যাণের জন্য সহবাস সম্মতি বিল সম্বন্ধে তাঁর সুচিন্তিত অভিমত সরকারের কাছে প্রেরণ করেছিলেন। সে কাজ নিঃসন্দেহে তাঁর মত কর্মবীর ও মহৎ চরিত্র ব্যক্তির উপযুক্ত হয়েছিল। তাঁর সবচেয়ে প্রধান ও প্রিয় কাজ ছিল নারীদের প্রতি অত্যাচার নিবারণ করা। এই অন্যায়ের বিরুদ্ধেই তিনি সবচেয়ে নির্ভীকভাবে সংগ্রাম করেছিলেন।

ত্রয়োদশ অধ্যায়

সাহিত্য ও সাংবাদিকতা

সমাজ সংস্কার প্রসঙ্গ থেকে এবার বাংলা সাহিত্য ও সাংবাদিকতার প্রসঙ্গে আসা যাক। এই দুই বিষয়েও বিদ্যাসাগর নূতন ধারার প্রবর্তক ছিলেন। তাঁর মৌলিক রচনা খুব বেশী নয়। প্রধানতঃ তিনি ছিলেন আধুনিক বাংলা গদ্যের স্রষ্টিকর্তা। তিনি প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিকতা করেন নি বটে, কিন্তু অনেকগুলি বাংলা ও ইংরাজী সাময়িক পত্র পরিচালনায় সক্রিয়ভাবে সাহায্য করেছিলেন। সেগুলির মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল বাংলা 'সোমপ্রকাশ' ও ইংরাজী 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। তিনি আধুনিক ছাপাখানা ও মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। অনেকে হয়ত শুনে অবাক হবেন যে এই প্রখ্যাত পণ্ডিত বাংলা মুদ্রাক্ষর ও তার সাজানোর কৌশলকে আধুনিক রূপ দিয়েছিলেন। এই সব দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায় যে তিনি সর্বতোভাবে নবজাগরণের প্রতীক ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের বেশীর ভাগ বাংলা রচনাই হল অনুবাদ, সঙ্কলন বা পাঠ্য পুস্তক। তিনি যে বই লিখেছেন তা থেকে তাঁর উদ্দেশ্য সহজেই বোঝা যায়। তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের স্রষ্টি কর্তা। অতএব একটি লিখিত ভাষাকে গড়ে তুলতে হলে যে সব মালমশলা দরকার হয় সেইগুলি সম্বন্ধেই বেশী মনোযোগী ছিলেন। আধুনিক বাংলা সাহিত্যের জনক বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে বিদ্যাসাগরের দান সম্বন্ধে লিখেছেন: "প্রবাদ আছে যে, রাজা রামমোহন রায় সে সময়ের প্রথম গদ্য লেখক। তাঁহার পর যে গদ্যের স্রষ্টি হইল, তাহা লৌকিক বাঙ্গালা ভাষা হইতে সম্পূর্ণ রূপে ভিন্ন। এমন কি বাঙ্গালা ভাষা দুইটি স্বতন্ত্র বা ভিন্ন ভাষায় পরিণত

হইয়াছিল। একটির নাম সাধুভাষা অর্থাৎ সাধুজনের ব্যবহার্য্য ভাষা, আর একটির নাম অপর ভাষা অর্থাৎ সাধু ভিন্ন অপর ব্যক্তিদিগের ব্যবহার্য্য ভাষা। এ স্থলে সাধু অর্থে পণ্ডিত বুঝিতে হইবে।······এই সংস্কৃতানুসারিণী ভাষা প্রথম মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্তের হাতে কিছু সংস্কার প্রাপ্ত হইল। ইহাদিগের ভাষা সংস্কৃতানুসারিণী হইলেও তত দুর্ব্বোধ্য নহে। বিশেষতঃ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভাষা অতি সুমধুর ও মনোহর। তাঁহার পূর্ব্বে কেহই এরূপ সুমধুর বাঙ্গালা গদ্য লিখিতে পারে নাই এবং তাঁহার পরেও কেহ পারে নাই।”

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এ বিষয়ে বিদ্যাসাগরের যে প্রশংসা করেছেন তা বঙ্কিমচন্দ্রের চেয়েও বেশী। তিনি তাঁর ‘বিদ্যাসাগর চরিত’ গ্রন্থে লিখেছেন, “তাঁহার প্রধান কীর্ত্তি বঙ্গভাষা। যদি এই ভাষা কখনো সাহিত্যসম্পদে ঐশ্বর্য্যশালিনী হইয়া ওঠে, যদি এই ভাষা অক্ষয় ভাবজননীরূপে মানব সভ্যতার ধাত্রীগণের ও মাতৃগণের মধ্যে গণ্য হয়—যদি এই ভাষা পৃথিবীর শোকদুঃখের মধ্যে এক নূতন সান্ত্বনাস্থল, সংসারের তুচ্ছতা ও ক্ষুদ্র স্বার্থের মধ্যে এক মহত্বের আদর্শলোক, দৈনন্দিন মানবজীবনের অবসাদ ও অস্বাস্থ্যের মধ্যে সৌন্দর্য্যের এক নিভৃত নিকুঞ্জবন রচনা করিতে পারে, তবেই তাঁহার এই কীর্ত্তি তাঁহার উপযুক্ত গৌরবলাভ করিতে পারিবে।···

“বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন। তৎপূর্ব্বে বাংলায় গদ্য সাহিত্যের সূচনা হইয়াছিল, কিন্তু তিনিই সর্ব্বপ্রথমে বাংলা গদ্যে কলানৈপুণ্যের অবতারণা করেন।······সৈন্যদলের দ্বারা যুদ্ধ সম্ভব, কেবলমাত্র জনতার দ্বারা নহে।·· বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত, সুবিন্যস্ত, সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংযত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্য্যকুশলতা দান করিয়াছেন। এখন তাহার দ্বারা অনেক সেনাপতি ভাবপ্রকাশের কঠিন বাধা-সকল পরাহত করিয়া সাহিত্যের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও অধিকার করিয়া লইতে পারেন,—কিন্তু যিনি এই সেনার রচনাকর্ত্তা, যুদ্ধজয়ের যশোভাগ সর্ব্বপ্রথম তাঁহাকেই দিতে হয়।

"বাংলা ভাষাকে পূর্ব্বপ্রচলিত অনাবশ্যক সমাসাড়ম্বরভার হইতে মুক্ত করিয়া, তাহার পদগুলির মধ্যে অংশযোজনার সুনিয়ম স্থাপন করিয়া, বিদ্যাসাগর যে বাংলা গদ্যকে কেবলমাত্র সর্ব্বপ্রকার—ব্যবহারযোগ্য করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন তাহা নহে, তিনি তাহাকে শোভন করিবার জন্যও সর্ব্বদা সচেষ্ট ছিলেন। গদ্যের পদগুলির মধ্যে একটা ধ্বনিসামঞ্জস্য স্থাপন করিয়া তাহার গতির মধ্যে একটা অনতিলক্ষ্য ছন্দস্রোত রক্ষা করিয়া, সৌম্য এবং সরল শব্দগুলি নির্ব্বাচন করিয়া, বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্যকে সৌন্দর্য্য ও পরিপূর্ণতা দান করিয়াছেন। গ্রাম্য পাণ্ডিত্য এবং গ্রাম্য বর্ব্বরতা, উভয়ের হস্ত হইতেই উদ্ধার করিয়া তিনি ইহাকে পৃথিবীর ভদ্রসভার উপযোগী আর্য্য-ভাষারূপে গঠিত করিয়া গিয়াছেন। তৎপূর্ব্বে বাংলা গদ্যের যে অবস্থা ছিল তাহা আলোচনা করিয়া দেখিলে এই ভাষাগঠনে বিদ্যাসাগরের শিল্পপ্রতিভা ও সৃষ্টিক্ষমতার প্রচুর পরিচয় পাওয়া যায়।"

এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'জীবন স্মৃতি' থেকে আর একটা উদ্ধৃতি দেওয়া দরকার। বিদ্যাসাগর ১৮৫৫ সালে 'বর্ণ পরিচয়' নামে শিশু শিক্ষার একটি প্রাথমিক পুস্তক লিখেছিলেন। এটি ছিল আধুনিক শিক্ষাপ্রণালীতে লেখা সর্বপ্রথম প্রাথমিক পুস্তক। 'বর্ণ পরিচয়' এক শতাব্দী ধরে বাংলা দেশে প্রচলিত ছিল এবং প্রত্যেক শিশুকেই শিক্ষা সুরু করতে হত 'বর্ণ পরিচয়' দিয়ে। বাঙালীদের কাছে বিদ্যাসাগরের প্রথম পরিচয় হল ছু'আনা দামের 'বর্ণ পরিচয়'এর লেখক হিসাবে, সমাজ সংস্কারক হিসাবে পরিচয় তার পরে। ঐ 'বর্ণ পরিচয়ের' একটা প্রাথমিক পাঠ সম্বন্ধে নিজের বাল্যকালের কথা স্মরণ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "কেবল মনে পড়ে, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে।' তখন 'কর' 'খল' প্রভৃতি বানানের তুফান কাটাইয়া সবেমাত্র কূল পাইয়াছি। সেদিন পড়িতেছি, 'জল পড়ে, পাতা নড়ে'। আমার জীবনে এইটাই আদি কবির প্রথম কবিতা। সে দিনের আনন্দ আজও যখন মনে পড়ে তখন বুঝিতে পারি, কবিতার মধ্যে মিল জিনিসটার এত প্রয়োজন কেন। মিল আছে বলিয়াই কথাটা শেষ হইয়াও

শেষ হয় না—তাহার বক্তব্য যখন ফুরায় তখনো ঝঙ্কারটা ফুরায় না, মিলটাকে লইয়া কানের সঙ্গে মনের সঙ্গে খেলা চলিতে থাকে। এমনি করিয়া ফিরিয়া ফিরিয়া সেদিন আমার সমস্ত চৈতন্যের মধ্যে জল পড়িতে ও পাতা নড়িতে লাগিল।"

১৮০০ সালে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্য রচনা সুরু হল বলে মনে করা যেতে পারে। বাংলা দেশ তখন বৃটিশ শাসনের প্রধান কেন্দ্র ছিল। অতএব বিলাত থেকে যে সব ইংরাজ সিভিলিয়ান কর্মচারী আসত তাদের ঐ কলেজে বাংলা ভাষা শিখতে হত। খ্যাতনামা ব্যাপটিস্ট ধর্মযাজক উইলিয়ম কেরী ছিলেন ঐ কলেজের বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের প্রধান অধ্যাপক। তাঁর অধীনে কয়েকজন বাঙালী পণ্ডিতকে নিযুক্ত করা হয়েছিল বিদেশী কর্মচারীদের বাংলা ভাষা শেখাবার জন্য। কিন্তু তখনকার দিনে উপযুক্ত প্রাথমিক পাঠ্য পুস্তকের বড় অভাব ছিল। ১৮০১ সালে কেরী শ্রীরামপুরের ডাঃ রাইল্যাণ্ডকে লিখেছিলেন যে তিনি রাম বসুকে দিয়ে একজন রাজার ('রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত') ইতিহাস লিখিয়েছেন। এইটিই হল "বাংলা সাহিত্যের সর্বপ্রথম গদ্য পুস্তক।" কেরীর তত্ত্বাবধানে আর যে সব পণ্ডিতদের গদ্য পাঠ্যপুস্তক লেখার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিল তাঁদের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য ছিলেন মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কার, গোলকনাথ শর্ম্মা, তারিণীচরণ মিত্র ও চণ্ডীচরণ মুন্সী। গদ্য রচনার এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টার কোনও সাহিত্যিক মূল্য নেই, কেবল ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এই সব রচনার বেশীর ভাগই ছিল কথ্য ভাষা ও পণ্ডিতী ভাষার একটা বিসদৃশ সংমিশ্রণ। একমাত্র মৃত্যুঞ্জয় তর্কালঙ্কারই পাঠ্যযোগ্য বাংলা গদ্য রচনায় কিছুটা সফল হয়েছিলেন, কিন্তু সেই গদ্যকে আধুনিক ভাব প্রকাশের উপযুক্ত করে তুলতে পারেন নি।

রামমোহন রায়ই সর্বপ্রথম বাংলা গদ্যের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। তিনি বাংলা গদ্যকে বিতর্কমূলক আলোচনার উপযুক্ত করে গড়ে তুলেছিলেন।

এই বাংলা গদ্যের মাধ্যমে তিনি পৌত্তলিকতা, একাধিক দেবতায় বিশ্বাস, সহমরণ প্রভৃতি বিষয়ে সংরক্ষণশীল সমাজের সঙ্গে অনেক বাগবিতণ্ডা করেছিলেন। এইসব বিতর্কমূলক রচনা ছাড়াও তিনি সর্বপ্রথম কয়েকখানি সংস্কৃত উপনিষদ বাংলায় অনুবাদ করেছিলেন। বাংলা গদ্যকে গড়বার জন্য তিনি এই সব প্রাথমিক প্রচেষ্টা করেছিলেন বটে, কিন্তু তবুও তিনি বাক্যবিন্যাস ও শব্দচয়ন সম্পূর্ণভাবে আয়ত্বাধীনে আনতে পারেন নি। তাঁর লেখায় গদ্যের যে প্রধান গুণ অর্থাৎ সামঞ্জস্যপূর্ণ গতিভঙ্গী, সেই জিনিষটির অভাব ছিল। পরে তৃতীয় দশকে রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন ব্যানার্জি এবং ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠি বাংলা গদ্যকে খুব বেশী দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেন নি। প্রধানতঃ ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠির ইংরাজী ঘেঁষা মনোভাবের জন্য বাংলা গদ্য এগোতে পারেনি। চতুর্থ দশকে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নেতৃত্বে তত্ত্ববোধিনী সভা ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রতিষ্ঠিত হল এবং সঙ্গে সঙ্গে বাংলা গদ্যের দুই প্রবল শক্তিশালী স্রষ্টা পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও অক্ষয় কুমার দত্ত বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে আবির্ভূত হলেন। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'য় ইতিহাস, দর্শন, ধর্ম, নীতিশাস্ত্র, বিজ্ঞান, সাহিত্য, অর্থনীতি, সমাজনীতি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে রচনা লিখতে উৎসাহ দেওয়া হত। এইসব নূতন নূতন জ্ঞানগর্ভ বিষয়ে আলোচনার ফলে চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে বাংলা গদ্য খুবই অগ্রসর হয়েছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র প্রথম সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত তাঁর শক্তিশালী রচনার দ্বারা বাংলা গদ্যের বিকাশকে আরও এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু এই সময়ে বাংলা গদ্যের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় দান রেখে গিয়েছিলেন বিদ্যাসাগর।

বিধবা বিবাহ, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি বিষয়ে বিতর্কমূলক রচনাতেই হোক বা পাঠ্যপুস্তক, অনুবাদ ও সঙ্কলনমূলক রচনাতেই হোক বিদ্যাসাগরের মূল উদ্দেশ্য ছিল সংস্কৃতঘেঁষা মার্জিত রচনারীতির কঠিন বন্ধন ও অমার্জিত চলতি ভাষার তুচ্ছতা,—এ দুয়ের থেকেই বাংলা গদ্যকে মুক্ত করা। তিনি ছিলেন বাংলা গদ্যের সর্বপ্রথম শিল্প সচেতন লেখক।

তিনি জানতেন যে ভাষাকে সাহিত্য ও বিজ্ঞানের উপযুক্ত মাধ্যমরূপে গড়ে তোলবার ঐতিহাসিক দায়িত্ব পড়েছিল তাঁর উপর। তিনি যা করে গিয়েছিলেন তার ফলে বঙ্কিম ও 'বঙ্গদর্শনে'র যুগ আসার পথ প্রশস্ত হয়েছিল। তিনি বাংলা গদ্য রচনাকে বিকাশের শক্তি দিয়েছিলেন। প্রায় একই সময় সুরু করে বঙ্কিম ও 'বঙ্গদর্শন' এই বিকাশকে আরও পূর্ণতার দিকে এগিয়ে নিয়ে যান এবং উনবিংশ শতাব্দী থেকে বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা গদ্যকে পূর্ণতর বিকাশের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান রবীন্দ্রনাথ।

বিদ্যাসাগর কখনও পেশাগতভাবে সাংবাদিক ছিলেন না। তিনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে অনেকগুলি সাময়িক পত্রের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তার মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা', 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা', 'সোমপ্রকাশ' ও 'হিন্দু পেট্রিয়ট'। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' এবং 'সোমপ্রকাশ' ছিল সে যুগের সবচেয়ে প্রতিপত্তিশালী বাংলা পত্রিকা। এই দুই সাময়িক পত্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাংলা সাহিত্যকে খুব প্রভাবিত করেছিল। 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' সমাজ কল্যাণের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল বটে কিন্তু বেশী দিন চলে নি। 'হিন্দু পেট্রিয়ট' ছিল শিক্ষিত বাঙালীর সবচেয়ে প্রভাবশালী ইংরাজী মুখপত্র। এই পত্রিকার একজন সম্পাদক ছিলেন হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, যিনি নীলচাষ বিরোধী আন্দোলনের সময়ে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। আর একজন সম্পাদক ছিলেন জাতীয়তাবাদী নেতা কৃষ্টদাস পাল। এই পত্রিকা যখন সঙ্কটের মুখে পড়ে তখন কিছুদিনের জন্য বিদ্যাসাগর এর পরিচালনার ভার গ্রহণ করেছিলেন। মোটামুটিভাবে এই হল সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগরের কর্মপ্রচেষ্টা।

১৮৪৩ সালে 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' প্রকাশিত হওয়া থেকে জীবনের প্রায় শেষভাগ পর্যন্ত বিদ্যাসাগর এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তিনি এই পত্রিকার সম্পাদকমণ্ডলীর সভ্য হিসাবে রচনা নির্বাচন ও সম্পাদনা করতেন, এমন কি সম্পাদকীয়ও লিখতেন। এই ভাবে পত্রিকার প্রথম

সম্পাদক অক্ষয় কুমার দত্ত বিদ্যাসাগরের সংস্পর্শে আসেন এবং তিনি তাঁর নিজের গদ্য রচনা নিয়মিতভাবে বিদ্যাসাগরকে দিয়ে দেখিয়ে নিতেন। বিদ্যাসাগর নিজে সেই পত্রিকাতে লিখতেন, তাছাড়া সম্পাদকের উপর তাঁর বিশেষ প্রভাব পড়েছিল। কিছুদিনের মধ্যে গদ্য রচনার ব্যাপারে অক্ষয় কুমার তাঁর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠেছিলেন এবং বাংলা সাহিত্যের উন্নতির জন্য বিদ্যাসাগর এই প্রতিদ্বন্দ্বিতায় খুসীই হয়েছিলেন।

অন্যতম বন্ধু পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় বিদ্যাসাগর ১৮৫০ সালের আগষ্ট মাসে 'সর্ব্বশুভকরী পত্রিকা' প্রকাশ করেন। এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন মতিলাল চট্টোপাধ্যায় নামে এক ব্যক্তি। আসলে কিন্তু এই দু'জন পণ্ডিতই এর পরিচালনা করতেন। এই পত্রিকায় প্রকাশিত রচনাবলী থেকে বোঝা যায় যে বিদ্যাসাগর চেয়েছিলেন এটিকে সম্পূর্ণভাবে সমাজ সংস্কারের কাজে ব্যবহার করতে। এই পত্রিকার মাত্র কয়েকটি সংখ্যা প্রকাশিত হয় এবং এক বছরের মধ্যেই এর প্রকাশ বন্ধ হয়ে যায়। অল্পদিনের মধ্যেই এই পত্রিকা সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, কেননা এর আদর্শ ছিল সমাজ ও শিক্ষার উন্নতি সাধন।

এরপর সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে তাঁর কর্মপ্রচেষ্টা হল ১৮৫৮ সালে 'সোমপ্রকাশ' পত্রিকা প্রকাশ করা। তাঁর বন্ধু ও সহকর্মী পণ্ডিত দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ ছিলেন এর সম্পাদক। বিদ্যাসাগরই সর্বপ্রথম এই পরিকল্পনা করেন এবং একথা মনে করা হয় যে এর প্রথম সংখ্যার সবটাই বিদ্যাসাগরের নিজের লেখা।* কিছুদিন পরে যখন বিদ্যাসাগর অসুস্থ হয়ে পড়লেন তখন এর ভার পণ্ডিত দ্বারকানাথের উপরে দিলেন। তাঁর সম্পাদনায় এবং বিদ্যাসাগরের সহায়তায় এই পত্রিকা বাংলা সংবাদপত্রগুলির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিল। 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা'র কতকগুলি বাঁধাধরা নীতি ছিল; যেমন এ পত্রিকা ব্রাহ্ম ধর্মের প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল এবং এর অনেক রচনাই ছিল ধর্মসম্বন্ধীয়। কিন্তু

*'হিন্দু পেট্রিয়ট', ৯ই জানুয়ারী ১৮৬৫

'সোমপ্রকাশ'-এর এমন কোনও বাধ্যবাধকতা ছিল না। অতএব 'সোম-প্রকাশ'-এ বেশ স্পষ্টভাবে সে যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয় নিয়ে আলোচনা চলতে পারত। সমাজ ও রাজনীতি সম্বন্ধীয় সংবাদপত্র হিসাবে 'সোমপ্রকাশ' খুবই জনপ্রিয় হয়েছিল।

শিক্ষিত বাঙালীর মুখপাত্র হিসাবে 'হিন্দু পেট্রিয়ট'ও জন সমাজের শ্রদ্ধা অর্জন করেছিল এবং সব শ্রেণীর লোকের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মচারী থেকে সুরু করে সাধারণ ইংরাজী জানা বাঙালী কেরাণী পর্যন্ত সবাই এ কাগজ আগ্রহের সঙ্গে পড়ত এবং এর মতামত মূল্যবান বলে মনে করত। অবশ্য এই সংবাদপত্র বরাবর মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বৈশিষ্ট্যমূলক মতবাদ প্রচার করত এবং সে মতবাদ হল ইংরাজ শাসন ও ভারতীয় প্রজার মধ্যে, জমিদার ও রায়তের মধ্যে শ্রেণী-গত সহযোগিতা। তবুও এই সংবাদপত্রের মাধ্যমে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নিজেদের অভিযোগ প্রকাশ করবার এবং তাদের নিজস্ব অধিকার দাবী করবার সুযোগ পেয়েছিল। সেই হিসাবে মধ্যবিত্ত এবং বিশেষ করে শিক্ষিত বাঙালীর মধ্যে রাজনৈতিক চেতনা বিস্তার করতে এই পত্রিকা বিশেষ সাহায্য করেছিল।

'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর সঙ্গে বিদ্যাসাগরের কি রকমের সম্বন্ধ ছিল সে সম্বন্ধে মিঃ সি. ই. বাকল্যাণ্ড তাঁর 'বেঙ্গল আণ্ডার দি লেফটেনাণ্ট গভর্ণরস্' পুস্তকে লিখেছেন: "১৮৬১ সালের ১৪ই জুন তারিখে যখন 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় মারা যান, তখন ঐ কাগজের নতুন মালিক বাবু কালিপ্রসন্ন সিংহ কিছুদিন কাগজটি চালান। কিন্তু তাতে লোকসান হওয়াতে তিনি এটির ভার পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের হাতে দেন। বিদ্যাসাগর ১৮৬১ সালে এই কাগজের সম্পাদকীয় দায়িত্ব কৃষ্টদাস পালের উপর ন্যস্ত করেন এবং ১৮৬২ সালের জুলাই মাসে একটি ট্রাষ্ট বা ন্যাস গঠন করে তার হাতে কাগজের মালিকানা সমর্পণ করেন। ট্রাষ্টি বা ন্যাসরক্ষকেরা কাগজটির পরিচালনা কৃষ্টদাস পালের উপর ছেড়ে দেন। সুতরাং ১৮৬১ সাল থেকে তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত কৃষ্টদাস কাগজটির ভার বহন

করেন এবং তাঁর পরিচালনায় কাগজটি প্রভাবশালী হয়ে ওঠে ও সমৃদ্ধিলাভ করে।"

কালীপ্রসন্ন সিংহের সঙ্গে বিদ্যাসাগরের ঘনিষ্ঠতা ছিল। 'হিন্দু পেট্রিয়ট'-এর প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক হরিশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের প্রতিও তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। সুতরাং কাগজটির ভার যখন তাঁর উপর পড়ল তখন তিনি এর সম্পাদকীয় দায়িত্ব গ্রহণ করবার জন্য একজন অল্প বয়সী কর্মদক্ষ ব্যক্তির সন্ধান করতে লাগলেন। কৃষ্টদাস পাল সে সময় বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশানে কেরাণীর কাজ করতেন। বিদ্যাসাগরের নজর পড়ল তার উপরে এবং তিনি কৃষ্টদাসকে সম্পাদকের পদে নিযুক্ত করলেন। বিদ্যাসাগর কৃষ্টদাসের সাহায্যে কাগজটিকে বিশেষ কোনও আদর্শ অনুসারে রূপায়িত করতে চেয়েছিলেন কিনা তা নিশ্চিতভাবে জানা যায় না। যে ভাবে তিনি কৃষ্টদাসকে নির্বাচন করেছিলেন তাতে মনে হয় যে এই তরুণ সম্পাদকের হাতে এবং তাঁর পরিচালনায় সংবাদপত্রটি যে কি ধরনের সামাজিক ও রাজনৈতিক ভূমিকা গ্রহণ করবে সে সম্বন্ধে তাঁর মনে কোনো ধারণা ছিল। কিন্তু দেখা গেল যে তাঁর নির্বাচিত সম্পাদক ক্রমশঃ বৃটিশ ইণ্ডিয়ান এ্যাসোসিয়েশানের অভিজাত সভ্যদের নরমপন্থী রাজনীতির দিকে বেশী ঝুঁকছেন। এর ফলে বিদ্যাসাগর সংবাদপত্রটি সম্বন্ধে হতাশ হয়ে পড়লেন এবং এর পরিচালনার ভার ট্রাষ্টিদের কাছে হস্তান্তরিত করলেন।

বাংলাদেশে সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে বিদ্যাসাগর যা কিছু করেছিলেন তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হল। তিনি পেশাগতভাবে বা প্রত্যক্ষভাবে সাংবাদিক ছিলেন না। তবুও পরোক্ষভাবে তিনি বাংলা ও ইংরাজী সাংবাদিকতার বিশেষ উন্নতি সাধন করেছিলেন। সে যুগের দুটি শ্রেষ্ঠ বাংলা সাময়িকপত্র ছিল 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' ও 'সোমপ্রকাশ'। এ দুটি যে এত প্রাধান্য ও প্রতিপত্তি অর্জন করেছিল তার মূলে ছিলেন বিদ্যাসাগর। ইংরাজী সাময়িকপত্র 'হিন্দু পেট্রিয়ট' শিক্ষিত বাঙালী মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল। বিদ্যাসাগরের চেষ্টাতেই ঐ সংবাদপত্রটি অনেক দিন পর্যন্ত টিকে ছিল এবং বিদ্যাসাগরের দূরদৃষ্টির জন্যই নতুন জীবন লাভ করেছিল।

এইবার বিদ্যাসাগরের কার্যকলাপের আর একটি দিকের কথা বলা হচ্ছে। সে সম্বন্ধে লোকে বেশী কিছু জানে না, অথচ সেই দিকটাই হল সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ। সেটি হ'ল মুদ্রণ শিল্প ও পুস্তক প্রকাশ। বিদ্যাসাগর ছিলেন সেই পুনর্জাগরণের যুগের "মানবতাবাদী" পণ্ডিত। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থ সম্বন্ধে তাঁর অত্যন্ত কৌতূহল ছিল। পুরানো এবং হারিয়ে যাওয়া হাতেলেখা পুঁথি উদ্ধার করে সেগুলি নকল করানো সম্বন্ধে তিনি খুব আগ্রহশীল ছিলেন। অন্যদিকে জ্ঞান বিস্তারের জন্য আধুনিক প্রণালীতে বই ছাপানো ও প্রকাশ করার গুরুত্বও তিনি উপলব্ধি করতেন। বিদ্যাসাগর শুধু বিরাট পণ্ডিত ও সমাজ সংস্কারক ছিলেন না, পুস্তক মুদ্রণ ও প্রকাশের ব্যাপারেও অন্যতম পথ প্রদর্শক ছিলেন।

১৮৪৭ সালে কোনও বন্ধুর কাছ থেকে ৬০০৲ টাকা ধার করে পণ্ডিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সহযোগিতায় কলকাতা শহরে তিনি সংস্কৃত প্রেস স্থাপন করেন। তিনি নিজেই লেখক ছিলেন। সুতরাং শীঘ্রই তাঁর নিজের ও তাঁর বন্ধুর বইগুলি প্রকাশ করতে সুরু করলেন। 'সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি' নামে একটি বই-এর দোকান খোলা হল এবং সেটি বেশ লাভজনক ব্যবসা হয়ে উঠল। পুস্তক প্রকাশ ও বিক্রয়ের মত সংস্কৃত প্রেসও কলকাতার মধ্যে বেশ প্রাধান্য লাভ করল। সরকারী চাকরী ছেড়ে দেওয়ার পর বিদ্যাসাগরকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে এই ছাপাখানা ও পুস্তক প্রকাশের আয়ের উপর নির্ভর করতে হয়েছিল।

এ ছাড়াও আর একটি কথা আছে। মুদ্রণ কলার প্রায়োগিক দিক সম্বন্ধেও তাঁর গভীর কৌতূহল ছিল। বাংলা অক্ষরমালা মুদ্রণের অসুবিধা থেকেই তাঁর এই আগ্রহ সৃষ্টি হয়। সমস্যা হল কি ভাবে এতগুলি বাংলা অক্ষর ছাপার ব্যবস্থা করা যায়, কিভাবে বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে অক্ষরগুলি পাশাপাশিভাবে টাইপ-কেসের মধ্যে রাখা যায়। বাংলা মুদ্রণের জন্য ৫০০ পৃথক পৃথক টাইপ রাখবার খাপ চাই। বিদ্যাসাগর এই জটিল বাংলা মুদ্রণ প্রণালীকে সহজ করবার জন্য অনেক পরিশ্রম করেছিলেন। বিদ্যা-সাগরের এই সফল প্রচেষ্টা স্মরণ করে ছাপাখানার বাঙালী কর্মচারীরা তাঁর

দ্বারা প্রবর্তিত সরল প্রণালীর নাম দিয়েছেন 'বিদ্যাসাগর সর্ট' বা 'বিদ্যাসাগর বাছাই প্রণালী'। প্রয়োগ বিদ্যার দিক থেকে এটি তখনকার কালের একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়।

চতুর্দশ অধ্যায়

স্মৃতিকথা

সে যুগে মুখে মুখে গল্প রচনার রীতি প্রচলিত ছিল। সুতরাং বিদ্যাসাগরের মত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে তখন অসংখ্য কাহিনী প্রচলিত হবে এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। এই অধ্যায়ে যে সব কাহিনী বলা হচ্ছে তার বেশীর ভাগই সত্য, তবে হয়ত একটু মনোরঞ্জক রূপ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এই সব গল্পের ভিতর দিয়ে মানুষ হিসাবে বিদ্যাসাগরকে আমরা দেখতে পাই।

প্রথমে বলা হচ্ছে বিদ্যাসাগরের চটি সম্বন্ধে দু'একটি গল্প। এই চটি পায়ে দিয়ে তিনি সর্বত্র যাতায়াত করতেন। একটি গল্প হচ্ছে কি ভাবে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ মিঃ কার-কে মুখের মত জবাব দিয়েছিলেন তাই নিয়ে। একদিন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ বিদ্যাসাগর প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষের সঙ্গে কোনও জরুরী সরকারী বিষয় নিয়ে আলোচনা করবার জন্য তাঁর ঘরে যান। বিদ্যাসাগর ঘরে ঢুকে দেখলেন কার সাহেব উঠে দাঁড়িয়ে বিদ্যাসাগরকে কোনরকম সৌজন্য দেখান দূরে থাক, টেবিলের উপরে নিজের জুতোশুদ্ধ পা দু'খানি তুলে দিব্যি বসে রইলেন। এমন কি বিদ্যাসাগরকে বসতেও বললেন না। বিদ্যাসাগর তাঁর সঙ্গে আর বেশী বাক্যব্যয় না করে চলে এলেন। এরপর একদিন মিঃ কারকে সেই ব্যাপারে আলোচনা করবার জন্য বিদ্যাসাগরের কাছে আসতে হল। মিঃ কার যখন ঘরে ঢুকলেন তখন বিদ্যাসাগরও তাঁর চটি-শোভিত পা দু'খানি টেবিলের উপর ছড়িয়ে বসে রইলেন। তিনি অধ্যক্ষকে বসতেও বললেন না। একজন সামান্য ভারতীয় পণ্ডিতের এই অপমানজনক ব্যবহারে মিঃ কারের আত্মসম্মানে আঘাত লাগল, বিশেষ করে এই কারণে যে তিনি ছিলেন শাসক শ্রেণীর লোক। অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তিনি শিক্ষা

পরিষদের সচিব ডক্টর মোয়াটের কাছে বাঙালী পণ্ডিতের এই অসভ্য ব্যবহার সম্বন্ধে নালিশ করে একটা পত্র দিলেন। ডঃ মোয়াট পণ্ডিতকে বেশ ভালভাবেই জানতেন। সুতরাং কি ঘটেছে তা বুঝতে তাঁর দেরী হল না। পণ্ডিতের কাছে তিনি কৈফিয়ৎ চাইলেন না তবে সরকারী প্রথা অনুযায়ী ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করলেন। বিদ্যাসাগর জবাবে লিখলেন : "আমি একজন সামান্য দেশীয় ব্যক্তি, সভ্য ইউরোপীয় আচরণ কাকে বলে তা জানি না। সেদিন মিঃ কারের ঘরে গিয়ে দেখলাম তিনি ঐ অদ্ভুতভঙ্গীতে চেয়ারে বসে আছেন এবং আমাকে বসতে না বলে দাঁড় করিয়ে রেখে আমার সঙ্গে কথাবার্তা বললেন। প্রথমে এই ব্যবহারে আমি খুব মর্মাহত ও বিস্মিত হয়েছিলাম, কিন্তু পরে ভাবলাম এইই হয়ত সুসভ্য ইউরোপীয় সৌজন্য যা আমাদের মত অর্ধ সভ্য লোকেদের অবশ্য অনুকরণ করা উচিত। সুতরাং যখন মিঃ কার আমার ঘরে এলেন তখন আমি তাঁকে সেই সৌজন্যই দেখিয়েছি মাত্র এবং তাঁকে অপমান করার উদ্দেশ্যে কিছু করিনি।" মোয়াট ব্যাপারটি বুঝতে পারলেন এবং এ নিয়ে আর অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করলেন না।

এই চটি নিয়ে আর একটি ঘটনাও উল্লেখযোগ্য আর তা নিয়েও কিছু বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। ১৮৭৪ সালের কথা। তখন এসিয়াটিক সোসাইটি ও ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম একই বাড়ীতে অবস্থিত ছিল। সেই সময় একদিন বিদ্যাসাগর ঐ সোসাইটির লাইব্রেরী এবং মিউজিয়াম পরিদর্শন করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়েছিলেন। বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ছিলেন কাশীর বিখ্যাত হিন্দী কবি হরিশচন্দ্র। বিদ্যাসাগর যথারীতি তাঁর বৈশিষ্ট্যমূলক পোষাক সাদা ধুতি ও চাদর পরে এবং একজোড়া দেশী চটি পায়ে দিয়ে ছিলেন। বন্ধু হরিশচন্দ্র ভারতীয় চোগা চাপকান পাগড়ী পরেছিলেন। তবে ভাগ্যক্রমে তাঁর পায়ে ছিল এক জোড়া বিলাতী স্যু। তাঁরা যখন সোসাইটি ভবনের গেটে এসে পৌঁছলেন তখন দারোয়ান বলল সে বিদ্যা-সাগরকে চটি পায়ে ভিতরে যেতে দেবে না, চটি বাইরে খুলে ভিতরে যেতে হবে। তাঁর বন্ধুর পায়ে বিলিতি জুতো থাকাতে তাঁর প্রবেশ নিষিদ্ধ হল না। বিদ্যাসাগর তখনই বাড়ী ফিরে এলেন, তাঁর বন্ধুও এই অপমান সহ্য

করলেন না, তিনিও ফিরে এলেন। ফিরে এসে বিদ্যাসাগর ইণ্ডিয়ান মিউজিয়াম ট্রাষ্টের অবৈতনিক সম্পাদক মিঃ এইচ. এফ. ব্লানফোর্ডকে লিখলেন : "এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের পুস্তকালয় পরিদর্শন করবার জন্য আমন্ত্রিত হয়ে আমি ২৮শে জানুয়ারী তারিখে (১৮৭৪) সেখানে যাই। কিন্তু আমার পায়ে দেশী জুতো থাকাতে আমাকে ভিতরে ঢুকতে দেওয়া হয় নি। এতে আমি এত অপমানিত বোধ করেছিলাম যে কোনও তর্কাতর্কি না করে চলে আসি।

"আমি যখন প্রাঙ্গনে দাঁড়িয়েছিলাম তখন দেখলাম, যেসব দেশীয় লোকেরা মিউজিয়াম দেখতে এসেছে তাদের শুধু জুতো খুলতে নয়, নিজেদের জুতো নিজের হাতে বয়ে নিয়ে যেতে বাধ্য করা হচ্ছে. যদিও সেই মিউজিয়ামের ভিতরে কিছু লোক জুতো পায়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।......এ ছাড়া বিলিতি জুতা পরা লোকদের পায়ে হেঁটে এলেও যদি মিউজিয়ামে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়, তবে কেন ঠিক একই পর্যায়ের লোকেরা একই অবস্থায় দেশী জুতো পরে এলে প্রবেশাধিকার পাবে না, একথা আমি বুঝতে পারলাম না।"

সম্পাদক মিঃ ব্লানফোর্ড ব্যাপারটা চাপা দিতে চেয়েছিলেন যাতে এ নিয়ে কোনও তর্কবিতর্ক না হয়। কিন্তু এই ঘটনার ফলে বেশ বাগবিতণ্ডা হয়েছিল, বিশেষ করে সংবাদপত্রে। এমন কি কোনও কোনও ইংরাজী সংবাদপত্র সোসাইটির কর্তৃপক্ষের ঔদ্ধত্যপূর্ণ ব্যবহারের তীব্র নিন্দা করেছিলেন। এই বিখ্যাত জুতাকাণ্ড নিয়ে 'ইংলিশম্যান' নামে সংবাদপত্র যা লিখেছিল তা থেকে এখানে উদ্ধৃত করা হল : "আমরা জানতে পারলাম যে সুবিদিত 'জুতা ব্যাপারটি' নিয়ে আবার আলোচনা সুরু হয়েছে, এমন কি এসিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের পরিষদ পর্যন্ত এ বিষয়ে মনোযোগ দিচ্ছেন। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর একজন দেশীয় পণ্ডিত, বিনয়ী ও গুণবান। তিনি তাঁর দেশবাসীর অসামান্য সেবা করেছেন এবং তাঁর খ্যাতি এসিয়া মহাদেশের বাইরে পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি অভিযোগ করেছেন যে, তাঁকে দেশী জুতো পায়ে দিয়ে এসিয়াটিক সোসাইটির ভবনে প্রবেশ

করতে দেওয়া হয়নি। ফলে ঐ সোসাইটির পরিষদ যে কি করবেন তা ভেবে ঠিক করতে পারছেন না। জোন্স ও কোলারক্রুকের উত্তরাধিকারীদের পক্ষে একটি মাত্র সম্মানজনক পথ আছে বলে মনে করি,—তা হল এই যে এমন কোনও তুচ্ছ নিয়ম প্রবর্তন না করা বা সমর্থন না করা যার ফলে সোসাইটির কার্যকরতা কমে যায় বা বিদ্যাসাগরের মত বিশিষ্ট ব্যক্তি সোসাইটিতে আসতে দ্বিধা বোধ করেন এবং সোসাইটি ইউরোপের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে।……চামড়ার জুতোর যদি কোনও মর্যাদা থাকে তবে সে-জুতোর আকারের প্রশ্নটা অপ্রাসঙ্গিক। আমরা আশা করি, এসিয়াটিক সোসাইটির পরিষদ এবং মিউজিয়ামের ন্যাসরক্ষকরা এমন কিছু করবেন না যাতে দেশীয় ভদ্রলোকেরা তাঁদের ভবনে প্রবেশ করা অপমানজনক মনে করেন।*"

বিদ্যাসাগরের জুতো বলতে ছিল অত্যন্ত সাধারণ ও গতানুগতিক একজোড়া চটি। কিন্তু সেই চটি ছিল—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভাষায়— তাঁর অদম্য ব্যক্তিত্বের প্রতীক। বিদ্যাসাগরের পরবর্তী যুগের প্রখ্যাত ব্রাহ্ম সংস্কারক পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর আত্মচরিতে বিদ্যাসাগরের চটি সম্বন্ধে একটি ছোট গল্প বলেছেন। বিদ্যাসাগর শিবনাথকে খুবই ভালবাসতেন। একদিন শিবনাথ চটি ও সেই সম্পর্কিত ঘটনাগুলির কথা তুললেন। কিছুক্ষণ আলোচনার পর বিদ্যাসাগর শান্তভাবে বললেন: "ভারতবর্ষে এমন রাজা নাই যাহার নাকে এই চটি জুতাশুদ্ধ পা খানা তুলিয়া টক করিয়া লাথি মারিতে না পারি।" শিবনাথ মন্তব্য করেছেন: "ঠিক কথা! এরূপ তেজস্বী পুরুষের নিকটে রাজারাজড়া কোথায় লাগে? সমগ্র দেশের লোকের বাহু একত্রে বাঁধিলে এমন একটা মানুষকে আঁকড়াইয়া ধরা ভার।"

গোঁড়া হিন্দু ধর্মের প্রতি বিদ্যাসাগরের মনোভাব কি ছিল তাই নিয়ে একটি গল্প আছে। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর বই থেকে এই গল্পটি

*'হিন্দু পেট্রিয়ট'—২৬শে জুলাই, ১৮৭৪

নেওয়া হয়েছে। তিনি লিখেছেন : "আমার ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেওয়ার অল্প কয়েক বছরের মধ্যে আমার পিতা জীবনের অবশিষ্ট দিনগুলি কাটাবেন বলে গ্রাম ছেড়ে কাশীতে গেলেন। এ ব্যাপারটা বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মনঃপূত হয়নি। একটি ঘটনা থেকে তা বোঝা যায়। কাশীতে থাকবার সময় আমার পিতা একবার কলকাতায় এসেছিলেন এবং অভ্যাসমত তাঁর বন্ধু বিদ্যাসাগর মহাশয়ের বাড়ীতে গিয়েছিলেন। বিদ্যাসাগর গোঁড়া হিন্দুধর্মের বাহ্যিক রীতিনীতিতে মোটেই বিশ্বাস করতেন না। তিনি আমার পিতাকে কাশীবাস করবার জন্য ঠাট্টা করতে লাগলেন। তাঁদের মধ্যে যে কথোপকথন হয়েছিল তা নীচে দেওয়া হল। এ কাহিনী সেখানে উপস্থিত একজন তৃতীয় ব্যক্তির কাছ থেকে শোনা।

বিদ্যাসাগর : "ওহে হারাণ, তুমি তো কাশীবাস করছ, কিন্তু গাঁজা খেতে শিখেছ ত ?"

আমার পিতা : "কাশী বাস করার সঙ্গে গাঁজা খাওয়ার কি সম্বন্ধ আছে ?"

বিদ্যাসাগর : "তুমি তো জান, সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে কাশীতে মরলে শিব হয়। কিন্তু শিব হচ্ছেন ভয়ানক গাঁজাখোর। সুতরাং আগে থেকে গাঁজা খাওয়ার অভ্যাসটা করে রাখা উচিত নয় কি ? তা না হলে যখন প্রথম গাঁজা খাবে তখন তো মুস্কিলে পড়তে পার ”

শিবনাথ লিখেছেন : "আমার ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করার পরেই আমার পিতা আমার স্ত্রী ও শিশুকন্যাসহ আমাকে পরিত্যাগ করলেন। তখন আমরা কলকাতায় এসে বসবাস আরম্ভ করলাম। বিদ্যাসাগর মহাশয় কিন্তু আমাদের পরিত্যাগ করেন নি। তিনি আমাদের খোঁজ খবর নিতেন এবং প্রয়োজন মত উপদেশ দিতেন।"

ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মনোভাব যে কি পরিমাণে বাস্তববাদী ছিল সে বিষয়ে আর একটি গল্প প্রচলিত আছে। ছেলেবেলায় শিবনাথ তাঁর

কয়েকজন তরুণ সঙ্গীকে নিয়ে এক অসুস্থ বন্ধুকে দেখতে গিয়েছিলেন। সেখানে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে দেখা হল। তার পরের ঘটনা শিবনাথ তাঁর 'মেন আই হ্যাভ সীন' গ্রন্থে এইভাবে বর্ণনা করেছেন: "রাস্তার ধারে খোলা বারান্দায় বসার সুবিধা ছিল। আমরা সেইখানে বসেছিলাম। এমন সময় প্রখ্যাত পণ্ডিত এলেন। আমাদের এতগুলি যুবককে একসঙ্গে দেখে তিনি খুব খুসী হলেন, কারণ তিনি লোকজনের সঙ্গে মেলামেশা খুব পছন্দ করতেন। তিনি বললেন যে তিনি রুগীকে পথ্য দিয়ে আসছেন, ততক্ষণ আমরা যেন চলে না যাই। আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। ফিরে এসে তিনি গল্প আরম্ভ করলেন। তাঁর গল্প শুনে আমরা হো হো করে হাসতে লাগলাম। তারপর তিনি তাঁর এক বন্ধুকে কয়েক পয়সার মুড়ি আনতে বললেন। মুড়ি আনা হলে তিনি আমাদেরও খেতে বললেন এবং নিজেও খেতে লাগলেন। ভেবে দেখুন, পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে সদর রাস্তার ধারে প্রকাশ্যে বসে মুড়ি চিবোচ্ছেন। কল্পনা করবার মত ব্যাপার বটে। এমন সময় আমার পরিচিত একজন বাঙালী খৃষ্টান সেখানে এসে উপস্থিত হলেন যাঁর কাজ ছিল পথের ধারে দাঁড়িয়ে খৃষ্ট ধর্ম প্রচার করা। তিনি আমার কাছে এসে আমাকে মুড়ি চিবোতে দেখে অবাক হয়ে কথাবার্তা সুরু করলেন এবং জিজ্ঞাসা করলেন আমি আমার পারলৌকিক মুক্তি সম্বন্ধে কি চিন্তা করছি। শুধু তাই নয়, তিনি আরও বললেন যে আমার ব্রাহ্ম ধর্মের দ্বারা কোনও কাজ হবে না, কেননা আমি অর্ধেক পথ এগিয়ে গিয়ে থেমে গেছি মাত্র। বিদ্যাসাগর তাঁর কথাবার্তা শুনে কৌতুকবোধ করছিলেন এবং তাঁকে নিয়ে একটু পরিহাস করতে চাইলেন। মনে হ'ল খৃষ্টান ভদ্রলোকটি বিদ্যাসাগরকে কখনও দেখেন নি, দেখলে নিশ্চয়ই তাঁর প্রতি আরও সৌজন্যপূর্ণ ব্যবহার করতেন। বিদ্যাসাগর বললেন, "মশায় এইসব ছেলে ছোকরাদের ছেড়ে দিন। মুক্তির কথা ভাববার জন্য ওরা অনেক সময় পাবে। আমাদের মত পুরানো পাপীদের আপনার যা বলার আছে বলুন, কেননা আমাদের পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়ার আর বেশী দেরী নেই।' বিদ্যাসাগর যেভাবে তাঁকে উপদেশ দেওয়ার জন্য আহ্বান করলেন তাতেই সে ভদ্রলোকের ব্যাপারটা বুঝে নেওয়া উচিত ছিল। কিন্তু তিনি তা বুঝতে না পেরে

মহা উৎসাহে পণ্ডিতের পাশে গিয়ে বসে প্রচার কার্য সুরু করলেন। বিদ্যাসাগরের কয়েকটি রসিকতাপূর্ণ কথা শুনে তিনি বুঝতে পারলেন যে বিদ্যাসাগর তাঁর কথায় যথেষ্ট গুরুত্ব দিচ্ছেন না। সুতরাং তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অবিলম্বে বিদ্যাসাগরের পাশ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'আপনি দেখছি একজন অত্যন্ত হীন পাপী, তা না হলে আমার কথা নিয়ে এমন হাস্য পরিহাস করতেন না। আপনি নিশ্চয়ই নরক যন্ত্রণা ভোগ করবেন।' লোকটি চলে গেলে আমরা একচোট খুব হাসলাম। বিদ্যাসাগর আমাকে বললেন, 'ওকে আমার পরিচয় দিও না, পরিচয় পেলে ও আরও মর্মাহত হবে। এই লোকগুলির অভ্যাস হচ্ছে দিন রাত ধর্ম প্রচার করা। সেই জন্য আমি ওকে নিয়ে একটু ঠাট্টা করলাম মাত্র'।"

রামমোহন রায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র ছিলেন রাধাপ্রসাদ রায়। তাঁর পৌত্র ললিতমোহন চ্যাটার্জি নানারূপ ভৌতিক ও অতি প্রাকৃত বিষয়ে বিশ্বাসী ছিলেন। বিদ্যাসাগর ললিতমোহনকে খুব ভাল ভাবে জানতেন। বিদ্যাসাগর কখনও তাঁর ধর্মমত প্রকাশ করতেন না, এমন কি তাঁর ঘনিষ্ঠ-তম বন্ধুদের কাছেও নয়। ঈশ্বর বা সাধারণভাবে ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর যে কি মনোভাব ছিল তা কেউ নিশ্চিতভাবে জানত না। নিতান্ত প্রয়োজন না হলে তিনি এ বিষয়ে কোনও তর্কে যোগ দিতেন না। তিনি যখন দেখলেন যে ললিত ক্রমশঃ অতিপ্রাকৃতে অত্যন্ত বিশ্বাসী হয়ে উঠছে তখন একদিন তিনি তাকে ডেকে সস্নেহে বললেন, "ললিত তুমি কি সত্যিই বিশ্বাস কর যে মৃত্যুর পরে জীবন আছে? আমরা আমাদের এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধেই অনেক কিছু জানি না। কিন্তু তুমি ভাগ্যবান, কারণ তুমি শুধু এই পার্থিব জীবন সম্বন্ধেই জান তা নয়, এমন কি মৃত্যুর পরে পারলৌকিক জীবন সম্বন্ধেও তোমার জ্ঞান আছে। কি করে এই জ্ঞান লাভ করা যায় আমাকে বলতে পার?" ললিতমোহন বিদ্যাসাগরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। বিদ্যাসাগরের কথা শুনে তিনি অপ্রস্তুত বোধ করলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে উৎসাহ দিয়ে বললেন, "কিছু মনে কোর না, তুমি যা করছ তা করে যাও। আমাকে শুধু বল মৃত্যুর পরে যদি জীবন থাকে তবে আমার সেই পার-লৌকিক জীবন কেমন হবে?" ললিত জবাব দিলেন, "দাদু, সবার মত

আপনারও মৃত্যুর পরে অপার্থিব জীবন লাভ হবে। আপনার মত মানব-হিতৈষী ব্যক্তি যে পরলোকে এর চেয়ে উন্নততর জীবন লাভ করবেন, এইটাই তো স্বাভাবিক। আপনি মানুষের উপকার করতে গিয়ে অনেক কষ্ট স্বীকার করেছেন। সুতরাং পারলৌকিক জীবনে আপনি অবশ্য তার উপযুক্ত প্রতিদান পাবেন।" বিদ্যাসাগর হাসতে হাসতে বললেন, "তোমার কথা শুনতে বেশ মধুর লাগছে, যদিও হাসিও পাচ্ছে। আমার এই জরাজীর্ণ বার্ধক্য অবস্থায় শুনে খুব সান্ত্বনা পেলাম যে মৃত্যুর পর আমি উপযুক্ত প্রতিদান পাব।"

রামমোহন রায়ের কনিষ্ঠ পুত্র ছিলেন রমাপ্রসাদ রায়। বিদ্যাসাগর ও রমাপ্রসাদ ঘনিষ্ঠ বন্ধু ছিলেন। কিন্তু বিধবা বিবাহের ব্যাপারে দু'জনের মধ্যে একটু মনোমালিন্য হয়। শোনা যায় ১৮৫৬ সালের ২৬শে জুলাই তারিখে আইন পাশ হওয়ার পর প্রথম বিধবা বিবাহ অনুষ্ঠানে রমাপ্রসাদ প্রত্যক্ষভাবে যোগদান করতে রাজী হন নি। এই বিবাহের কয়েকদিন আগে বিদ্যাসাগর রমাপ্রসাদের বাড়ীতে গিয়ে তাঁর কাছে তাঁর প্রতিশ্রুতি-মত বিবাহ তহবিলের জন্য চাঁদা দেওয়ার এবং ব্যক্তিগতভাবে বিবাহ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবার কথা স্মরণ করিয়ে দেন। এতে রমাপ্রসাদ বলেন, "আমি যে বিধবা বিবাহ সমর্থন করি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই এবং আমি যে চাঁদা দেব তাও নিশ্চিত। কিন্তু আমি যদি ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত না থাকি, তবে কোনও ক্ষতি আছে কি?" বিদ্যাসাগর বুঝতে পারলেন যে বিবাহে উপস্থিত থাকার মত নৈতিক সাহস রমাপ্রসাদের নেই এবং তিনি কেবলমাত্র পরোক্ষভাবে বিধবা বিবাহ সমর্থন করছেন। এই দুর্বলচিত্ততা তাঁর কাছে অসহ্য লাগল, এই ব্যবহার রামমোহন রায়ের পুত্রের অযোগ্য বলে তাঁর মনে হল। কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে রমাপ্রসাদের ঘরের দেওয়ালে টাঙানো রামমোহনের ছবির দিকে আঙুল নির্দেশ করে তিনি বললেন, "ওঁর ছবি ওখানে টাঙিয়ে রাখবার প্রয়োজন কি? ও ছবি এখুনি ফেলে দাও।" এই কথা বলে তিনি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলেন। এর পরেও রমাপ্রসাদ ছ'বছর বেঁচে ছিলেন, কিন্তু বিদ্যাসাগর আর কখনও তাঁর বাড়ীতে যান নি।

১৮৪৭ সালে বিদ্যাসাগর সর্বপ্রথম বর্ধমানের মহারাজার বাড়ীতে যান। বর্ধমান শহর কলকাতা থেকে ৬০ মাইল দূরে অবস্থিত। তিনি মহারাজের অতিথি হন নি, এক বন্ধুর বাড়ীতে উঠেছিলেন। মহারাজার সঙ্গে দেখা করার জন্য তিনি যে খুব উদগ্রীব ছিলেন তা নয়। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল বর্ধমান শহর ও তার পারিপার্শ্বিক অবস্থা দেখা। মহারাজা তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য একদিন তাঁকে নিমন্ত্রণ করলেন। বিদ্যাসাগর প্রাসাদে এলে মহারাজা তাঁকে প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এক-জোড়া দামী শাল ও পাঁচশত টাকা দিয়ে শ্রদ্ধা প্রদর্শন করলেন। বিদ্যা-সাগর অত্যন্ত বিনীতভাবে দান প্রত্যাখ্যান করে বললেন, "আপনি আমাকে এই দামী উপহার দিয়ে আমার প্রতি বিশেষ সৌজন্য দেখিয়েছেন। কিন্তু আমি দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি আমি তা গ্রহণ করতে পারব না। সাধারণতঃ আমি কারও কাছ থেকে কোনও উপহার গ্রহণ করি না। আমি সরকারী কলেজে চাকরী করি এবং যা মাইনে পাই তাতেই আমার খরচ কুলিয়ে যায়। আপনি যদি আমাদের টোল চতুষ্পাঠীর গরীব পণ্ডিত মহাশয়দের যথেষ্ট সাহায্য করেন তবে একটা বড় কাজ হবে এবং আমিও খুব আনন্দিত হব।" মহারাজা বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে অনেক আগে থেকেই জানতেন। সুতরাং এ কথা শুনে তিনি বিস্মিতও হলেন না বা আঘাতও পেলেন না। সেই থেকে মহারাজা বরাবরই বিদ্যাসাগরকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁকে তাঁর সমাজ সংস্কার আন্দোলনে নৈতিক ও আর্থিক সাহায্য করতেন। কয়েক বছর পরে তিনি বিদ্যাসাগরকে তাঁর জন্মস্থান বীরসিংহ গ্রাম তালুক হিসাবে দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু এই দানের প্রস্তাবও বিদ্যাসাগর প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার তালুকদার হওয়ার কোনও উচ্চাশা নেই। আমি যখন তালুকের প্রজাদের পক্ষ হয়ে জমিদারের প্রাপ্য খাজনা নিজের পকেট থেকে মিটিয়ে দিতে পারব তখনই কেবল তালুকদার হওয়ার কথা ভাবব।" এবারে মহারাজা বিদ্যাসাগরের জবাব শুনে সত্যই বিস্মিত হয়েছিলেন।

বিদ্যাসাগর ও রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের প্রথম সাক্ষাৎ সম্বন্ধে একটি কাহিনী আছে। বিদ্যাসাগরের খ্যাতির কথা শুনে একদিন পরমহংস দেব

তাঁর সঙ্গে দেখা করবার জন্য তাঁর বাড়ীতে গিয়ে উপস্থিত হলেন। বিদ্যাসাগর তাঁকে উপযুক্ত আন্তরিকতা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে সম্বর্ধনা করলেন। পরস্পর পরস্পরকে প্রথামত সম্ভাষণ করবার পর পরমহংস বললেন, "আমি সাগরে এসেছি, ইচ্ছে আছে কিছু রত্ন সংগ্রহ করে নিয়ে যাব।" কথার তাৎপর্য বিদ্যাসাগর মশায়ের বুঝতে দেরী হয় নি। মৃদু হেসে তিনি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলেন, "আপনার ইচ্ছে পূর্ণ হবে বলে তো মনে হয় না, কারণ এ সাগরে কেবল শামুকই পাবেন।" রামকৃষ্ণ পরিহাস উপভোগ করেন এবং হাসিমুখে বলেন, "এমন না হলে আর সাগরকে দেখতে আসব কেন?" এই সংক্ষিপ্ত কথোপকথনের ভিতর দিয়ে এই দুই মহাপুরুষ পরস্পর পরস্পরকে চিনতে ও বুঝতে পেরেছিলেন। পরে রামকৃষ্ণ 'লীলামৃত'র লেখককে বলেন, "বিদ্যাসাগর মহাত্যাগী পুরুষ। আমার মতো কর্মনাশার সঙ্গে মিশলে পাছে তাঁর বিদ্যাদান কর্ম উচ্ছেদ হয় তাই আপন কল্যাণমুক্তি পর্যন্ত তিনি উপেক্ষা করলেন।" রামকৃষ্ণ বলেছিলেন যে, মানুষের কল্যাণের জন্য তিনি অর্থ, সুখ, ভোগ সব কিছু পরিত্যাগ করেছেন। এমন কি তাঁর নিজের মোক্ষলাভের জন্য ভগবানের নাম করবারও তাঁর কোনও স্পৃহা নেই, সেইটাই বোধহয় তাঁর সবচেয়ে বড় ত্যাগ। অন্য লোকের উপকার করতে গিয়ে তিনি নিজের আত্মার উপকার করার প্রয়োজন অগ্রাহ্য করেছেন।

পরমহংস এই কয়েকটি সহজ কথায় বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। পরমহংস স্বভাবতঃই সহজ ভাষায় কথা বলতেন। এই কথাগুলির ভিতর দিয়ে তিনি বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে যা বলেছিলেন তা অভ্রান্ত সত্য। তিনি বিদ্যাসাগরের পার্থিব ত্যাগ স্বীকারের কথা বলেছিলেন। কিন্তু সে ত্যাগ স্বীকার তাঁর কাছে বড় ছিল না। নিজের আত্মিক উন্নতি সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে বিদ্যাসাগর যে আত্মত্যাগ করেছিলেন পরমহংস দেবের কাছে সেটাই ছিল বড়। অনেক লোক আছেন যাঁরা তাঁদের নিজেদের মোক্ষলাভের জন্য সমস্ত পার্থিব ধন সম্পদ ত্যাগ করতে প্রস্তুত। বিদ্যাসাগর সে জাতীয় মানুষ ছিলেন না। তাঁর

জীবনের সবচেয়ে বড় ব্রত ছিল সমাজকে কুপ্রথা ও কুসংস্কার থেকে মুক্ত করা। সমাজের বৃহত্তর কল্যাণের জন্য তিনি তাঁর পার্থিব ও আধ্যাত্মিক উন্নতি বিসর্জন দিয়েছিলেন।

পঞ্চদশ অধ্যায়

সাধনাও সিদ্ধি

এইবার আমরা বিদ্যাসাগরের "প্রকৃত ব্যক্তিসত্ত্বা" যে কেমন ছিল তা বুঝতে পারব। তাঁর মধ্যে যে মানবীয় গুণ ছিল তাও আমরা অনুভব করতে পারব। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে যে নবজাগরণ এসেছিল তার পটভূমিকায় বিদ্যাসাগরকে বিচার করলে দেখা যাবে যে তিনি ছিলেন প্রকৃত "মানবতাবাদী", "মনন ক্ষেত্রে দুঃসাহসিক কর্মপ্রয়াসী" ও "সমাজ সংস্কারক"। সমাজতাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে গেলে রামমোহন রায় ও পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে বাংলাদেশে উনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের সমস্ত ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকাশ পেয়েছিল এবং সেই পুনর্জাগরণের ভিতর দিয়ে মধ্যযুগের অবসান হয়ে আধুনিক যুগের উষালোক দেখা দিয়েছিল।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মত একজন সাধারণ কবির কথা ছেড়ে দিলে, দেখা যায় যে সাহিত্যক্ষেত্রে এই আধুনিক যুগমানস সর্বপ্রথম প্রতিফলিত হয়েছিল মাইকেল মধুসূদন দত্তের মধ্যে। বলা যেতে পারে যে বিদ্যাসাগর তাঁর বিশেষ বন্ধু ছিলেন, কেননা বিদ্যাসাগর না থাকলে হয়ত মাইকেল তাঁর জীবনের সাধনা সম্পূর্ণই করতে পারতেন না। মাইকেল যখন দূর বিদেশে গিয়ে দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন তখন বাংলাদেশে একমাত্র ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের কাছ থেকে সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করেছিলেন। মাইকেল তাঁর বন্ধুবান্ধব ও বিদ্যাসাগরকে যেসব চিঠিপত্র লিখেছিলেন, তার মধ্যে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। সেগুলির মধ্যে ভাবোচ্ছ্বাস ছিল বটে কিন্তু তা আন্তরিক অনুভূতিপ্রসূত। বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মাইকেল যে সব মন্তব্য করেছিলেন তার কয়েকটি এখানে উদ্ধৃত করা হল ঃ

" .....অনেকদিক দিয়ে আমি তাঁকে আমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলে মনে করি" (রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র, ১০ই জানুয়ারী, ১৮৬২)।

" ·আপনার প্রতিভার পরিচায়ক কর্মশক্তি ও পুরুষোচিত গুণ নিয়ে আপনি কাজে অগ্রসর হোন" (বিদ্যাসাগরকে লিখিত পত্র, ২রা জুন, ১৮৬৪)।

"......আমি ভরসা করি যে দেশে ফিরে গিয়ে আমি আমার দেশবাসীকে বলতে পারব যে আপনি শুধু বিদ্যাসাগর নন, করুণাসাগরও বটেন" (বিদ্যাসাগরকে লিখিত পত্র, ১৮ই জুন, ১৮৬৪)।

"......আমি যাঁর কাছে আবেদন জানিয়েছি তাঁর মধ্যে প্রাচীন ঋষির প্রতিভা ও প্রজ্ঞা, ইংরাজের কর্মশক্তি এবং বাঙালী মায়ের কোমল হৃদয়ের একত্র সমন্বয় ঘটেছে" (বিদ্যাসাগরকে লিখিত পত্র, ২রা সেপ্টেম্বর, ১৮৬৪)।

"......বাংলা দেশে জন্মগ্রহণ করলেও আপনি স্বাভাবিক মহত্ত্বের অধিকারী এবং আমি যদি মনে করি আপনি আমার সম্বন্ধে সমবেদনা বোধ করবেন তবে বোধহয় আমার ভুল হবে না।......বাঙালী জাতির মধ্যে আপনি মহত্তম ব্যক্তি, লোকে আবেগময় ভাষায় এবং সাশ্রুনয়নে সকৃতজ্ঞ অন্তরে আপনার কথা স্মরণ করে" (বিদ্যাসাগরকে লিখিত পত্র, ১৮৬৭)।

উপরে বিদ্যাসাগরের চরিত্রের পরিচায়ক কতকগুলি বাক্যাংশ উদ্ধৃত হল। এখানে একজন কবি তাঁর বন্ধুর চরিত্রের মূল্যায়ণ করেছেন। ইতিপূর্বে বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের অভিমত উল্লেখ করা হয়েছে। এই দুই কবির মতামতের তুলনা করলে দেখা যাবে যে দুইএর মধ্যে বিশেষ কোনও পার্থক্য নেই। রবীন্দ্রনাথের মত আর কেউই বিদ্যাসাগর চরিত্রের গভীরতার পরিমাপ করতে পারেন নি। সেইরূপ মাইকেল বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে তাঁর চিঠিপত্রে সে সব মন্তব্য করেছেন তার উৎকর্ষকেও কেউ ছাড়িয়ে যেতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে মাইকেল যে সব কথা বলেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে সুপরিচিত হল এই যে বিদ্যাসাগর একাধারে প্রাচীন ঋষির প্রজ্ঞা, ইংরাজের কর্মশক্তি এবং বাঙালী মায়ের কোমল হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। অনেক বাঙালীর মধ্যেই প্রাচীন ঋষিদের মত প্রতিভা ও জ্ঞান ছিল, এবং মাতৃ-সুলভ কোমলতাও ছিল। হয়ত কিছু সংখ্যক বাঙালীর মধ্যে ইংরাজের কর্মশক্তিও ছিল। কিন্তু খুব অল্প সংখ্যক ব্যক্তির মধ্যেই এই গুণগুলির সমন্বয় ঘটেছিল বলা যেতে পারে। সেই মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের মধ্যে বিদ্যা-সাগর নিঃসন্দেহে একজন ছিলেন। মাইকেল তাঁকে "সমস্ত বাঙালীজাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম" বলেছিলেন। সেইজন্য অনেক 'বিশিষ্ট' বাঙালী বিস্ময় বোধ করেছেন যে কি করে বাংলাদেশের ভিজে স্যাঁতসেঁতে মাটিতে বিদ্যাসাগরের মত দৃঢ়চরিত্র পুরুষের জন্ম হয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রকৃতির এক মহান সৃষ্টি। তাঁর জন্য শুধু বাঙালী নয়, সমস্ত ভারতবাসীর চরিত্রে মহত্ত্ব আরোপিত হয়েছে।

মাইকেল ১৮৬২ সালের ১০ই জানুয়ারী তারিখের চিঠিতে রাজ-নারায়ণ বসুকে লিখেছিলেন যে বিদ্যাসাগর "আমাদের মধ্যে প্রধান মানুষ"। এ কথার মধ্যে একটা গভীর সত্য নিহিত আছে। সব দেশেই "মানুষ" ছিল অগণিত জনসাধারণের একটি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অংশ মাত্র। কিন্তু আধুনিক যুগের সুরু থেকে, অর্থাৎ নবজাগরণের নব চেতনা আসবার সুরু থেকে আপন বৈশিষ্ট্য নিয়ে সেই "মানুষ" হয়ে উঠল "একক বা ব্যক্তি মানুষ"। এই অর্থে মাইকেল তাঁকে "আমাদের মধ্যে প্রধান মানুষ" বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর আগে রামমোহনের মত কয়েকজন বৈশিষ্ট্য-পূর্ণ মানুষ জন্মেছিলেন বটে, কিন্তু তিনি নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারতের সেই অল্প কয়েকজন "মানুষের" মধ্যে "প্রধান" ছিলেন।

বিদ্যাসাগরের মহানুভবতা ও সমাজ সংস্কারের আগ্রহ ছিল অসাধা-রণ। তিনি যে ভাবে দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করেছিলেন তা উপলব্ধি করতে হলে বুঝতে হবে যে প্রকৃত দার্শনিক ও ঐতিহাসিক অর্থে

তিনি ছিলেন "মানবতাবাদী বুদ্ধিজীবী"। অতএব মানবতাবাদ কাকে বলা হয় তা প্রথমে বোঝা দরকার। রেনেসাঁস শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হচ্ছে পুনর্জন্ম, নবজন্ম বা নবীভবন। ইউরোপের ইতিহাসে একটি বিশেষ যুগকে রেনেসাঁস যুগ বলা হয় (পঞ্চদশ-ষষ্ঠদশ শতাব্দী), যখন শিল্প, সাহিত্য এবং অনেকাংশে দর্শন প্রাচীন সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে পুনর্জ্জীবিত হয়ে উঠেছিল। ইটালীর রেনেসাঁস সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ প্রখ্যাত পণ্ডিত সিমণ্ড্স্ বলেছেন: "মানুষ আবিষ্কার করল যে প্রাচীন গ্রীক ও রোমান এবং বাইবেল উল্লিখিত যুগের পুরাতন সংস্কৃতির মধ্যে এমন একটা নৈতিক ও বুদ্ধিগত আদর্শ বিদ্যমান ছিল যা থেকে বর্তমানের মানুষও লাভবান হতে পারে।"* প্রাচীন গ্রীস ও রোমের ভাবধারা সম্বন্ধে নতুন আগ্রহ সৃষ্টির ফলে রেনেসাঁসের যুগে মানুষের মননশীলতা প্রদীপ্ত হয়ে উঠেছিল কারণ এই সব প্রাচীন ভাবধারণা নতুন যুগের প্রয়োজন ও অর্থ প্রকাশের পক্ষে বিশেষ উপযোগী ছিল।

এ ছাড়া প্রাচীন গ্রীসের দার্শনিক চিন্তাধারার মধ্যে মানবতাবাদ নিহিত ছিল এবং আধুনিক যুগের প্রয়োজন ও মূল্যবোধ অনুসারে এই তত্ত্বটিকে অনেক বড় রূপ দেওয়া হয়েছিল। মানবতাবাদ মানুষকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। গ্রীক দার্শনিক প্রোটাগোরাস বলেছিলেন, "মানুষই হচ্ছে সব কিছু বিচারের মাপকাঠি" ('ম্যান ইজ দি মেজার অব অল থিংস')। রেনেসাঁস যুগের এই ছিল মূল তত্ত্ব। রামমোহন ও বিদ্যাসাগর আধুনিক ভারতের প্রকৃত মানবতাবাদী ব্যক্তি ছিলেন, তাঁরা উভয়েই বর্তমান ভারতের মানবকেন্দ্রিক মূল্যবোধ গড়ে তুলেছিলেন।

রামমোহন ও বিদ্যাসাগর উভয়েই তাঁদের সমাজ ও ধর্ম সম্পর্কিত ভাবধারাগুলিকে জনসাধারণের কাছে গ্রহণীয় করবার জন্য ভারতের স্বর্ণযুগের প্রাচীন সংস্কৃত-ঐতিহ্য থেকে নজীর দেখিয়েছিলেন। রামমোহন রায় তাঁর পৌত্তলিকতা বিরোধী একেশ্বরবাদ প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য প্রমাণ

*এ শর্ট স্টোরি অব রেনেসাঁস ইন ইটালী, লণ্ডন, ১৮৯৩, পৃঃ ৬

দেখিয়েছিলেন উপনিষদ থেকে এবং সতীদাহ বন্ধ করার স্বপক্ষে শাস্ত্রের বিধান সংগ্রহ করার চেষ্টা করেছিলেন। বিদ্যাসাগরও বিধবা বিবাহ প্রভৃতি সংস্কার সাধনের জন্য প্রাচীন সংহিতা ও শাস্ত্রের বিধান খুঁজেছিলেন। এর অর্থ এই নয় যে রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের শাস্ত্রের উপর অটুট বিশ্বাস ছিল অথবা বুদ্ধি ও যুক্তিবাদের উপর তাঁদের কোনও বিশ্বাস ছিল না। এর কারণ এই যে তাঁরা জানতেন যে তাঁদের সংস্কার কার্য সমাজে গ্রহণীয় করতে হলে এমন কোনও শাস্ত্রীয় বিধানের প্রয়োজন যার উপরে লোকের অটুট বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে। তাঁরা চেয়েছিলেন যাতে তাঁদের নতুন ধর্মনিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গী গুরুত্বপুর্ণ বলে প্রতীয়মান হয়, যাতে লোকে বুঝতে পারে যে তাঁদের প্রগতিশীল সামাজিক ভাবধারা অতীত যুগের ঐতিহ্যের মহিমামণ্ডিত, এবং যাতে তাঁদের সমাজ সংস্কারের কাজ শাস্ত্রের অনুমোদন ও বৈধতা লাভ করে। ইউরোপেও ঠিক এই ব্যাপারটি ঘটেছিল।

বিদ্যাসাগরের মানবতাবাদ ঠিক ইউরোপীয় রেনেসাঁসের অনুসরণেই অভিব্যক্ত হয়েছিল। এর বৈশিষ্ট্য ছিল প্রাচীন সংস্কৃত-ঐতিহ্যের পুনরুজ্জীবন, সঙ্গে সঙ্গে নতুন পাশ্চাত্য শিক্ষারও প্রসার। ইতালীয় রেনেসাঁস সম্বন্ধে সিমণ্ডস্ লিখেছেন: "একমাত্র পাণ্ডিত্যই মানুষের কাছে উদ্‌ঘাটিত করে দিয়েছিল মানব মনের ঐশ্বর্য, তার চিন্তাধারার মর্যাদা ও তার দূরপ্রসারী কল্পনার মূল্য এবং ধর্মের নিয়ম ও অন্ধ বিশ্বাসের উপরে মানুষ হিসাবে তার পৃথক সত্তার কথা।······এই রেনেসাঁস আসবার সঙ্গে সঙ্গে গ্রীক ও ল্যাটিন সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ লোকের সামনে উদ্‌ঘাটিত হয়ে পড়ল।······ কয়েক পুরুষ আগে পুণ্যভূমি প্যালেষ্টাইন থেকে আনীত স্মৃতিচিহ্নগুলিকে লোকে যে ভাবে পূজা করত সেইভাবে তারা হাতেলেখা পুঁথিগুলিকে শ্রদ্ধার সঙ্গে পূজা করতে লাগল।······হোমার, প্লেটো, এ্যারিষ্টটল ও ট্র্যাজিডি লেখকদের লেখার পাঠ নির্ণয় করার প্রয়োজন বোধ হল। ফ্লোরেন্স, ভেনিস, লিয়ঁ ও প্যারিস প্রভৃতি শহরে বহু মুদ্রাযন্ত্র স্থাপিত হল। আলডি, স্টেফানি, ও ফ্রবেনরা দিনরাত পরিশ্রম করতে লাগলেন।

অসংখ্য একনিষ্ঠ ও মেধাবী বিদ্বান ব্যক্তিদের নিযুক্ত করা হল। তাদের কাজ ছিল পুরানো পুঁথির পাঠ নির্ণয় করে বাক্যের প্রয়োগ, স্বর সংঘাত, যতিচিহ্ন প্রভৃতি শুদ্ধভাবে ছাপাবার জন্য পাঠানো। উদ্দেশ্য ছিল এইভাবে প্রাচীন সাহিত্যের অন্তর্নিহিত আনন্দ সমস্ত মানব সমাজের কাছে পেঁৗছে দেওয়া, যাতে তা মধ্যযুগীয় সন্ন্যাসীদের ঘৃণায় বা সময়ের প্রভাবে নষ্ট না হয়ে যায়।"

উনবিংশ শতাব্দীর অনেক বাঙালী পণ্ডিত ও বিদ্বান ব্যক্তির জীবনে এই মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। পণ্ডিতরা সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব সম্পদ লোকের সামনে তুলে ধরলেন। হাতেলেখা পুঁথি সংগ্রহ করা হতে লাগল। মানুষ যেভাবে প্রতিমার পূজা করে তার চেয়ে বেশী শ্রদ্ধার সঙ্গে সেগুলি পূজা করা হতে লাগল। ঠিক ইটালীর স্টেফানি ও ফ্রবেনদের মত কলকাতার ঠাকুর, মল্লিক, শীল, সিংহ, দেব এবং আরও অনেক বড় বড় পরিবার প্রাচীন সাহিত্য সাধনার পৃষ্ঠপোষকতা করতে লাগলেন এবং সেই উদ্দেশ্যে অসংখ্য সংস্কৃত পণ্ডিত নিযুক্ত করা হ'ল। সেই পণ্ডিতেরা অত্যন্ত একনিষ্ঠ এবং মননশীল ছিলেন। তাঁদের কাজ ছিল সম্পাদনা করা, ব্যাখ্যা করা ও আধুনিক ভাষায় অনুবাদ করা এবং এইভাবে প্রাচীন সাহিত্য-সম্পদকে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করা।

ইউরোপীয় মানবতাবাদী এবং উনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী মানবতা-বাদীদের মধ্যে একটা বিষয়ে পার্থক্য ছিল। সে হল দেশীয় ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে। ইউরোপের মানবতাবাদীরা তাঁদের প্রাচীন ল্যাটিন পাণ্ডিত্য সম্বন্ধে খুব গর্ব বোধ করতেন, কিন্তু আধুনিক জীবন্ত ভাষা ও সাহিত্যগুলিকে নীচু নজরে দেখতেন। রামমোহন ও বিদ্যাসাগরের মত বাঙালী মানবতাবাদীদের প্রাচীন বা সংস্কৃত বিদ্যা সম্বন্ধে এই ধরনের কোনও অহঙ্কার বোধ ছিল না। রামমোহন সর্বপ্রথম বেদান্ত এবং কয়েক-খানি উপনিষদ বাংলায় অনুবাদ করেন এবং তা মুদ্রিত করে জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। বিদ্যাসাগর বহু প্রাচীন গ্রন্থ সম্পাদনা করেন এবং এই

ধরনের অনেক গ্রন্থ বাংলায় অনুবাদ ও সঙ্কলন করেন। এগুলির বেশীর ভাগই তাঁর নিজের সংস্কৃত প্রেস থেকে ছাপিয়ে প্রকাশিত করেন। তাঁর সংগৃহীত যে সব সংস্কৃত পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত আছে সেগুলি খুবই মূল্যবান সন্দেহ নেই। বিদ্যাসাগর বাংলা সাহিত্য ও শিক্ষার বনিয়াদ রচনা করেছিলেন। তিনি বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রাথমিক বাংলা পাঠ্য পুস্তক রচনা করেছিলেন এবং সংস্কৃত ব্যাকরণকে সহজ করে বাংলা ভাষায় 'উপক্রমণিকা' ও 'ব্যাকরণ কৌমুদী' রচনা করেছিলেন। এইভাবে তিনি রক্ষণশীল পুরোহিত শ্রেণী ও টোলের পণ্ডিতদের আধিপত্য ভেঙ্গে দিয়েছিলেন।

আমরা জানি রামমোহন প্রধানতঃ ধর্ম সংস্কারের দিকে মনোযোগ দিয়েছিলেন। আমাদের ধর্মকে তিনি যাজকশ্রেণীর প্রভাব ও বাহ্যিক আচার অনুষ্ঠান থেকে মুক্ত করে আত্মচিন্তার উপরে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ব্রহ্মকে উপলব্ধি করতে হবে নিজের মনের মধ্যে, বাহ্যিক কোনও মূর্ত্তি বা প্রতিমা পূজার ভিতর দিয়ে নয়। তাঁর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ধর্মকে আত্মগত করা, বস্তুগত করা নয়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্ম সমাজে ভক্তেরা আসতেন বৈদিক স্তোত্র, ব্রহ্মসঙ্গীত, পাঠ প্রভৃতি শুনবার জন্য এবং ব্রহ্ম চিন্তার উদ্দেশ্যে। কিন্তু রামমোহনের এই আত্মগত ধর্মমত প্রচারের জন্য ব্রাহ্মসমাজের মত একটি বাহ্যিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন ছিল।

ধর্ম সম্বন্ধে বিদ্যাসাগরের মতামত তাঁর মানবতাবাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিল। বিদ্যাসাগর ব্রাহ্মসমাজ ও তার দ্বারা পরিচালিত সমাজ সংস্কার আন্দোলন সম্বন্ধে বিশেষ আগ্রহশীল ছিলেন। তিনি শেষের দিকে তত্ত্ববোধিনী সভার সম্পাদক ছিলেন এবং সমাজ তহবিলে চাঁদা দিতেন। তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের নেতা। খ্যাতনামা ব্রাহ্মনেতা কেশবচন্দ্র সেন ও শিবনাথ শাস্ত্রীর সঙ্গে তাঁর গভীর অন্তরঙ্গতার কথা সবাই জানত। অন্তরে অন্তরে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতি তাঁর টান ছিল একথাও কারও অবিদিত ছিল না। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের

প্রতি তাঁর এই ভালবাসা, শ্রদ্ধা ও সহানুভূতি সত্ত্বেও তিনি ব্রাহ্মসমাজে যোগদান করেন নি বা একদিনের জন্যও সমাজের সাপ্তাহিক প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকেন নি।

ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গে মানসিক ঘনিষ্ঠতা থাকা সত্ত্বেও বিদ্যাসাগর সেই সমাজে যোগ দেন নি কেন? ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর মতামত কি ছিল? 'দি সিভিলাইজেশন অব দি রেনেসাঁ ইন ইটালী'* (ইটালীতে রেনেসাঁ সংস্কৃতি) গ্রন্থের লেখক জেকব বার্কহার্ড এ সম্বন্ধে লিখেছেন: "এই সব আধুনিক ব্যক্তিরা মধ্যযুগীয় ইউরোপীয়ানদের মতই ধর্মভাববিশিষ্ট ছিলেন। কিন্তু তাঁদের তেজস্বী ব্যক্তিত্বের দরুণ অন্য সব ব্যাপারের মত ধর্মের ব্যাপারেও তাঁরা ছিলেন আত্মগত।"

বিদ্যাসাগর ভারতবাসীর স্বাভাবিক ও সহজাত ধর্মভাব নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ার ফলে তিনি "ধর্মের ব্যাপারে সম্পূর্ণ আত্মগত ছিলেন।" রামমোহনের ধর্ম সম্বন্ধীয় আদর্শ বিদ্যাসাগরের জীবনে সত্যই জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। তিনি কখনও কোনও ধর্ম সম্বন্ধীয় বিতর্কের মধ্যে জড়িত হতেন না। কখনও তিনি কারও ধর্ম বিশ্বাসের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যভাবে কোনও কথা বলেন নি, তা সে যতই প্রাচীন বা প্রতিক্রিয়াশীল হোক না কেন। ধর্ম সম্বন্ধে অকারণ আলোচনা করা তাঁর কাছে অত্যন্ত বিরক্তিজনক বলে মনে হত। পূর্ব উল্লিখিত বাঙালী খৃষ্টান ধর্মযাজককে তিনি যে ভাবে তিরস্কার করেছিলেন তা থেকে এটা বোঝা যায়। শুধু চিঠির শীর্ষে তিনি ঈশ্বরের নাম লিখতেন—এ ছাড়া তাঁর ভগবদ্বিশ্বাসের আর কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু ঈশ্বর সম্বন্ধে তাঁর কি ধারণা এ কথা তাঁকে জিজ্ঞাসা করবার সাহস তাঁর কোনও বন্ধুবান্ধবের ছিল না। বস্তুতপক্ষে এ বিষয়ে তিনি এমন একটা কঠোর নীরবতা অবলম্বন করতেন যে লোকে তাঁকে 'নাস্তিক' বলে মনে করত।

---

*ষষ্ঠখণ্ড, পৃঃ ৩০৩

চিঠিতে তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাসের ঐ সামান্য পরিচয়টুকু বাদ দিলে তাঁকে নিশ্চিতভাবে নাস্তিক বলে মনে করা যেত।

বিদ্যাসাগরের 'অন্তরতম সত্তা' কতকগুলি উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া বৈশিষ্ট্যসমন্বিত ছিল। তাঁর সেই সত্তা ছিল মূলতঃ তেজস্বী, কর্তৃত্বব্যঞ্জক ও পুরুষোচিত। বিদ্যাসাগরের পিতামহ রামজয় তর্কভূষণ এই সব বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কথার উল্লেখ করে বলা যায়—দরিদ্র রামজয় তাঁর পৌত্রের জন্য এই গুণগুলি ছাড়া আর কোনও পার্থিব উত্তরাধিকার রেখে যেতে পারেন নি।

বিদ্যাসাগরের 'সামাজিক ব্যক্তিসত্তা' গড়ে উঠেছিল কয়েকটি জিনিষের উপলব্ধি ও সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে। সেগুলি হল তখনকার সামাজিক ও ঐতিহাসিক অবস্থা, যুগের চিন্তাধারা সম্বন্ধে তাঁর তীক্ষ্ণ অনুভূতি ও সমাজ সম্বন্ধে তাঁর অভিজ্ঞতা। তাঁর সামাজিক ব্যক্তিত্ব ছিল চমৎকার, আকর্ষক। সে ব্যক্তিত্ব মানিয়ে নিত, গ্রহণ করত, সাড়া দিত এবং তার অন্তরে ছিল একটি তেজস্বী পুরুষোচিত সত্তা। তাঁর জীবনের অনেক ঘটনা থেকে দেখা যায় যে অনেক সময়ই তাঁর আসল সত্তা প্রবল হয়ে উঠত এবং সমাজের সংস্পর্শে গড়ে ওঠা ব্যক্তিসত্তা পিছিয়ে পড়ত। এইটাই ছিল তাঁর অবসর জীবনের বিচ্ছিন্নতা ও ক্রমবর্ধমান হতাশার কারণ। কিন্তু এ কথাও মনে রাখা দরকার যে উনবিংশ শতাব্দীর যুগাবস্থায় তাঁর অন্তর্নিহিত তেজস্বী ও পুরুষোচিত সত্তার পূর্ণ প্রকাশের প্রয়োজন ছিল, তা না হলে তাঁর 'সামাজিক সত্তার' পূর্ণ বিকাশ ও তার উদ্দেশ্য সাধন হত না। সে যুগ ছিল মহাপুরুষ ও মহান সাধনার যুগ এবং বিদ্যাসাগর ছিলেন একজন মহাপুরুষ—তিনি বিরাট কাজ করে গেছেন।

১৮৯১ সালের ২৯শে জুলাই বিদ্যাসাগরের মৃত্যু ঘটে। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল ৭০ বছর কয়েক মাস। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে শেষ দশক পর্যন্ত এই দীর্ঘকাল তিনি বেঁচে ছিলেন।

কলেজ স্কোয়ারে একটি মর্মর মূর্তি ছাড়া কলকাতা মহানগরীতে বিদ্যাসাগরের আর কোনও স্মৃতিচিহ্ন নেই। বোধহয় তাতে কোনও ক্ষতি নেই। লুই মমফোর্ডের ভাষায়, "এই স্মৃতিচিহ্নগুলি যে—নিঃশ্বাস শেষ হয়ে গেছে তার ব্যর্থ প্রতিধ্বনি মাত্র, এইসব মর্মর স্মৃতিচিহ্ন আমাদের কর্মব্যস্ত পথের ধারে যেন বিদ্রূপের ভঙ্গীতে দাঁড়িয়ে থাকে, যেন জীবিত মানুষের কাজকর্মকে সীমায়িত করে দেয়······অথবা আমাদের নতুন বিশ্বাস ও প্রয়োজনের পক্ষে সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক বলে মনে হয়।"*

যদি বিদ্যাসাগরের মর্মরমূর্তি কলকাতার কর্মচঞ্চল পথের ধারে বিসদৃশভাবে দাঁড়িয়ে থেকে জীবিত মানুষের কর্মব্যস্ততাকে অবরুদ্ধ করে দেয়, তবে তার চেয়ে গভীর পরিতাপের বিষয় আর কিছু হতে পারে না। যদি আমরা পুরুষানুক্রমে তাঁর বিশ্বাস, তাঁর বাসনা, তাঁর ভাবধারা নতুন করে গ্রহণ করে যাই, যদি প্রগতিশীল ভারতের প্রত্যেক অধিবাসী নতুন করে চিন্তা করে এবং নতুন ইচ্ছাশক্তি নিয়ে সেগুলিকে কার্যকর করে, তবেই তিনি চিরদিন আমাদের স্মৃতির মধ্যে বেঁচে থাকবেন।